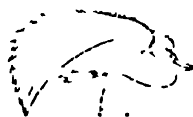
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম. এ., ডি. লিট.
উপাচার্য, বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা



সারস্বত লাইব্রেরী
ান সরণী : : কলিকাতা ৬

Price Rs 8.00

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬২

দাম আট টাকা।

মুদ্রাকর
সারস্বত প্রেস
বিভাস ভট্টাচার্য
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

ভূমিকা

বর্তমান সময়ে শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করিবার গুরুভার যাঁহাদের হস্তে নিহিত আছে, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ এই একটি বিষয়ে ঐক্যমত দেখা যায় যে আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি সাধনের প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দান অপরিহার্য। একথা অতি সত্য যে শিক্ষকের পক্ষে যেমন নিজের মাতৃভাষায় উপদেশ দেওয়া সহজ ও স্বাভাবিক, ছাত্রের পক্ষেও সেই উপদেশ গ্রহণ করা তুল্য রূপে সহজ ও সুগম।

আজ হইতে অনেক বৎসর পূর্বে যখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলাম এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পড়াইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলাম, তখনই এ বিষয়ে উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব অনুভব করিয়াছিলাম। তাহার ফলেই ইংরেজিতে A Concise History of Classical Sanskrit Literature নামে একখানি গ্রন্থ লিখি। পরপর তাহার দুইটি সংস্করণ দুইটি প্রকাশন সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় অপর একটি সংস্থার দ্বারা উহার তৃতীয় সংস্করণ এখন যন্ত্রস্থ। পুস্তকটি হিন্দী ভাষাতেও অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। বড়ই সুখের বিষয় যে বাঙলা ভাষাতেও তাহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইল। কিন্তু এই প্রকাশনের একটি বৈশিষ্ট্য আছে, বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং এই পরিকল্পনায় গ্রন্থখানি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

গ্রন্থখানিকে রূপায়িত করিবার জন্য যাহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল, কেবল ভাষার দিক দিয়া নহে, বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও সে নিজের মৌলিকতার দাবী করিতে পারে। পাঠার্থিগণের যতদূর সম্ভব উপযোগী করিবার জন্য কল্যাণভাজন শ্রীমান অশোক ভট্টাচার্যের, ও সেই সঙ্গে

শ্রীমান অমিতাভ ভট্টাচার্যের, এই প্রয়াস কেবল যে ছাত্রগণের সমাদর লাভ করিবে তাহা নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অনেক জিজ্ঞাসু মনের সমাদর লাভেও সমর্থ হইবে। আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত ইহা বলিতে পারি যে যোগ্যপাত্রে অর্পিত বিদ্যা গুরুকে প্রসন্ন করে এবং গুরু প্রসন্ন হইলে শিষ্যও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে—বৈদিক ঋষিগণের এই অনুভূতি বর্তমান ক্ষেত্রে আর একবার প্রমাণিত হইল।

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

সূচীপত্র

প্রাক্-কথন

ক. বৈদিক সাহিত্য

সাধারণ পরিচয়

বেদ কথাটি বিদ্ ধাতু সঞ্জাত; বেদ সেই কারণে সাধারণার্থে 'জ্ঞান'-এর সমার্থক। কিন্তু বেদ বলিতে আমরা বিশেষভাবে একটি সুনির্দিষ্ট প্রাচীন সাহিত্যকে বুঝি এবং এই সাহিত্য বৈদিক সাহিত্য রূপে পরিচিত। বৈদিক সাহিত্য ভারতীয় আর্য সভ্যতার উৎস স্বরূপ। ভারতীয়দের ধর্মকর্ম, রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার উপর এই সুপ্রাচীন সাহিত্যের সামগ্রিক প্রভাব সর্বব্যাপী। বিশেষত, ভারতীয় দর্শনের বিকাশে বৈদিক সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম।

ভারতীয় আর্যদের মতে বেদ মনুষ্য রচিত নহে, উহা অপৌরুষেয়। বেদ ভগবানের নিশ্বসিত এবং চিরন্তন ও শাশ্বত। হিন্দুর নিকট বেদের অভিব্যক্তি মানবজীবনে আংশিক; কারণ ঋষিগণ বৈদিক সূক্তগুলির আংশিক দ্রষ্টা মাত্র, সামগ্রিক নহে। তুলনা স্বরূপ বলা যাইতে পারে মাধ্যাকর্ষণ যে-রূপ চিরকালই বিদ্যমান অথচ কোন্ একজন মনীষীর আবিষ্কারে আজ সর্বজন বিদিত, সেইরূপ সূক্তগুলি ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে, কৃত হয় নাই এবং তাঁহাদের মাধ্যমে জগতে বিদিত হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্য বলিতে নিম্নলিখিত চারিটি বিভিন্ন ধরনের অথচ পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত রচনার সমষ্টিকে বোঝায়ঃ

(ক) মন্ত্র বা সংহিতা—মন্ত্র, গান, স্তোত্র ইত্যাদির সংগ্রহ। সংহিতা চারিটি—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি 'ত্রয়ী' সংহিতা রূপে পরিচিত হইয়াছিল। চতুর্থটি পরবর্তীকালে 'সংহিতাব্যূহে' প্রবেশ করিয়াছে।

(খ) ব্রাহ্মণ—বৈদিক যাগযজ্ঞ সংক্রান্ত ক্রিয়া-প্রণালী, ক্রিয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও আখ্যান সমন্বিত গদ্যে লিখিত সুবিশাল সাহিত্য।

(গ) আরণ্যক—অরণ্যে রচিত বা পাঠ্য এক জাতীয় সাহিত্য। ইহা ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট বিশেষ। ভাষা, রীতি, এমন কি, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে উভয়ের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। কিন্তু আরণ্যক সাহিত্য বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা অপেক্ষা তাহাদের এবং বৈদিক 'মন্ত্র'সমূহের তাৎপর্য নির্ণয়ে অধিক মনোযোগী।

(ঘ) উপনিষৎ—আক্ষরিক অর্থে গুহ্যজ্ঞান। উপ-নি-সদ্ অর্থাৎ 'কাহারও সমীপে উপবেশন' এই অর্থেও কেহ কেহ উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষৎ আরণ্যকের পরিশিষ্ট এবং পরিপূরক রূপে বিবেচিত। স্বতন্ত্র উপনিষদেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উপনিষৎ মূলত দার্শনিক তত্ত্বের আধার স্বরূপ। এই সাহিত্য পদ্যে ও গদ্যে রচিত।

বেদের কাল

কোন্ যুগে ঋষিগণ বৈদিক সূক্তগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা আর্যদের নিকট বিদিত নহে। আর্য তথা হিন্দুগণ বেদের শাশ্বত পরিচয়ে বিশ্বাসী। অপরপক্ষে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বৈদিক সাহিত্যের রচনা কালকে চিহ্নিত করিতে প্রয়াসী। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে ম্যাক্স ম্যুলরই প্রথম ঐতিহাসিকভাবে বেদের কাল নির্ণয়ে অগ্রসর হন। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেই বেদ-সংহিতা ও ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল স্বীকার করিয়া, তিনি বেদ ও ব্রাহ্মণের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ১২০০—১০০০ অব্দের মধ্যে স্থাপন করেন। ম্যাক্স ম্যুলর নির্দিষ্ট কালই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক সাধারণ ভাবে গৃহীত হইয়াছে। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক ঋক্ বেদের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতক বলিয়া মনে করেন। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের এই কালনির্দেশ অবশ্য আজও সর্বজনগ্রাহ্য নহে। লোকমান্য গঙ্গাধর তিলক ও এইচ. ইয়াকবি স্বাধীন ভাবে বহু যুক্তির দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বেদ ম্যাক্স ম্যুলর নির্দিষ্ট কাল হইতে

বহু প্রাচীন। জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর অবস্থান, ভূতত্ত্ব ও নৈসর্গিকতত্ত্ব প্রভৃতির সহায়তায় তিলক প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে বেদ ও ব্রাহ্মণ ভাগ খৃঃ পূঃ ৪৫০০—২৫০০ অব্দের মধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে। ইয়াকবিও স্বাধীনভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচারে খৃঃ পূঃ ২৭০০-এর পূর্বে বৈদিক কাল নির্দেশ করেন। মাদ্রাজের কামেশ্বর আয়ারও কৃত্তিকাপুঞ্জের অবস্থান দ্বারা খৃঃ পূঃ ২৩০০—২০০০ কালকে ব্রাহ্মণযুগ বলিয়া নির্দেশ করেন।

বিভিন্ন মতবাদ পর্যালোচনার পর ভিন্‌তারনিৎস্‌ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বৈদিক সাহিত্যের সূচনার কাল খৃঃ পূঃ ২০০০ অথবা ২৫০০ অব্দের নিকটবর্তী কোনও সময়ে এবং তার সমাপ্তির কাল খৃঃ পূঃ ৭৫০ ও ৫০০ অব্দের মধ্যবর্তী কালে। এশিয়া মাইনরের বোখাজকোই নামক স্থানে খৃঃ পূঃ চতুর্দশ শতকের হিট্টাইট শাখাভুক্ত মিটানীয় রাজগণের বাণমুখ লিপিতে ক্ষোদিত লেখ হইতে জানা যায় যে মিটানির রাজগণ আর্যগণের বৈদিক দেবতাদের নাম—ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, নাসত্যৌ প্রভৃতি—ধারণ করিতেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে ... তাকে আর্যপূর্ব সভ্যতা রূপে গ্রহণ করিয়া ও অন্যান্য আলোচনার মাধ্যমে মর্টিমার হুইলার, স্টুয়ার্ট পিগট প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম প্রতিভূ ঋগ্‌বেদের কাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫০০-এ স্থাপন করেন।

মহাভারত ও পুরাণগুলির মতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসই প্রচলিত বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। পুরাণের মতানুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেই ব্যাস ঐ বেদ বিভাগ সম্পন্ন করেন। জনমেজয়ের যজ্ঞের সময় নব প্রচলিত শুক্লযজুর্বেদানুসারে যজ্ঞ নির্বাহের প্রস্তাব হয় এবং বৈশম্পায়নের মতাবলম্বীগণ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পূর্বে বেদ বিভাগ সম্পন্ন এবং জনমেজয়ের সময় শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রতীত হয় কুরুক্ষেত্রের কালে বৈদিক সাহিত্য প্রাচীনতা অর্জন করিলেও তাহার ধারা তখনও প্রাণবন্ত ছিল। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর খৃঃ পূঃ নবম শতকে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই হিসাবে বৈদিক সাহিত্যের কাল খৃঃ পূঃ ১৫০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের

মধ্যে স্থাপন করা অসমীচীন হইবে না বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদের কাল ধরা হয় খৃঃ পূঃ ১৫০০—১৪০০, ব্রাহ্মণের কাল খৃঃ পূঃ ৮০০—৭০০ এবং উপনিষদের কাল খৃঃ পূঃ ৭০০—৫০০ রূপে।

সংহিতা

বেদগুলির মধ্যে ঋগ্‌বেদই প্রাচীনতম। ঋগ্‌বেদ সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদের উপাদান বলিয়া বিবেচিত। প্রথমে ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই বেদত্রয়ই বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং সেই কারণে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ 'ত্রয়ী' নামে আখ্যাত।

প্রাচীনধারার মতানুসারে সংহিতা চারি প্রকার হইলেও, বৈদিক মন্ত্রগুলি তিন প্রকার বলিয়াই বেদকে 'ত্রয়ী' বলা হইয়া থাকে। এই তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার মন্ত্র হইল দেবতার আহ্বান, দ্বিতীয় প্রকার মন্ত্র দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতিদান ও তৃতীয় প্রকার মন্ত্র গান। মন্ত্রের এই তিন প্রকার প্রযুক্তিই পরিলক্ষিত হয়। এই অভিপ্রায়েই বেদকে ত্রয়ী বলা হয়। এই কারণেই পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এবং পরবর্তী যুগে জয়ন্তভট্টের 'ন্যায়মঞ্জরী'তে বেদের উল্লেখ প্রসঙ্গে অথর্ব্ববেদের মন্ত্র সর্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকালে অথর্ব্ববেদকে বেদসংজ্ঞাভুক্ত রূপে দেখা যায় না। উহা 'অথর্ব্বন্' বা 'অথর্ব্বাঙ্গিরস' নামে কথিত হইত। বৈদিক যজ্ঞ, অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ডে বা আর্যজীবনের নিত্য কর্তব্যের ভিতর অথর্ব্ববেদের কোনও স্থান ছিল না। ফলে অতি প্রাচীনকালে উহা বেদ রূপে স্বীকৃত হইত না। পরবর্তীকালে উহা বেদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। অবশ্য 'বেদব্যূহে' পরবর্তীকালে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াই যে ইহার সকল অংশ অর্বাচীন, তাহা নহে। ইহার অনেক অংশই ঋগ্‌বেদের ভাষার ন্যায় সুপ্রাচীন ভাষায় রচিত।

বৈদিক যজ্ঞে প্রধানত তিনজন বেদবিদের আবশ্যক হয়। 'হোতা' আবশ্যকীয় ঋক্‌গুলি উচ্চারণ করেন, 'অধ্বর্যু' যজুঃগুলির সাহায্যে নিদি

শাখাভেদের কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়। সামবেদ গেয় হওয়ায় উহার শাখা ভেদ বহুধা হওয়াই স্বাভাবিক। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে সামবেদের সহস্র বা বহু শাখার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

সত্যব্রত সামশ্রমী সামবেদের তেরটি শাখার নাম অবগত ছিলেন। বর্তমানে মাত্র দুইটি শাখার প্রচলন দেখা যায়। 'কৌথুমী' শাখা বঙ্গদেশ, কান্যকুব্জ, কাশী ও গুর্জরে প্রচলিত; 'রাণায়নী' শাখা দ্রাবিড়ে প্রচলিত। কৌথুমী শাখার সংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত—'আর্চিক' ও 'গান'। আর্চিক কথার অর্থ ঋক্ সংগ্রহ এবং আর্চিক অংশে ঋগ্‌গুলি প্রদত্ত হইয়াছে। 'গান' অংশে উহারা গীতরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। আর্চিকগুলি তিন খণ্ডে বিভক্ত— 'ছন্দঃ' আর্চিক, 'আরণ্যক' আর্চিক ও 'উত্তরা' আর্চিক। গানগুলিও সেই অনুসারে তিন খণ্ডে বিভক্ত—'গেয়'গান, 'অরণ্য'গান ও 'উহ্য'গান। সামবেদের কৌথুমী শাখার 'নৈগেয়' নামক একটি উপশাখার কথা জানা যায়।

৩. যজুঃ

পৃথক পৃথক যজ্ঞানুষ্ঠানে যে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রগুলির আবশ্যক হয় এবং যে বিধিনিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে হয় তাহাদের সমষ্টিই যজুর্বেদ সংহিতা। যজুর্বেদে যজ্ঞ সম্পাদনের বিধানগুলি অর্থাৎ কোন্ মন্ত্র কোন্ সময়ে অধ্বর্যু'কে উচ্চারণ করিতে হইবে তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। যজুর্বেদের ঐ সংগ্রহ প্রণালী ও তাহার বিধানগুলি ক্রম অনুযায়ী সন্নিবেশিত। যজুর্বেদের বৈশিষ্ট্য ইহা গদ্যময়। যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার কেবল এক-চতুর্থাংশ ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত আর অবশিষ্ট সকল অংশই 'যজুঃ' বা গদ্যময় প্রয়োগবিধির দ্বারা পরিপূর্ণ। এই যজুঃ সম্পূর্ণই নূতন; তাহা ঋগ্‌বেদে নাই। যজুর্বেদের গদ্যাংশ বৈদিক সূক্তের ভাষা অপেক্ষা নবীন, কিন্তু পরবর্তী যুগের সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা বহু প্রাচীন।

যজুর্বেদের বহু শাখার প্রচলন ছিল। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে যজুর্বেদের সাতাশটি শাখা। ইহার প্রধান দুই শাখা হইল কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্লযজুর্বেদ। কৃষ্ণযজুর্বেদ শুক্লযজুর্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন। কৃষ্ণযজুর্বেদে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাংশ মিশ্রিত হইয়া আছে, শুক্লযজুর্বেদে মন্ত্রভাগ হইতে ব্রাহ্মণাংশ পৃথকীকৃত

হইয়াছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের ছয়টি শাখা প্রসিদ্ধ। তাহাদের নাম চরকাধ্বর্য্যু বা চরক, কঠ, কপিষ্ঠল, মৈত্রায়ণীয় বা কলাপ, আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশী। শুক্লযজুর্বেদ বৈশম্পায়ন শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল।' শুক্ল-যজুর্বেদের পঞ্চদশটি শাখার নাম বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিনী শাখাই প্রধান। মহীধর প্রমুখ ভাষ্যকারেরা ঐ মাধ্যন্দিনী শাখার ভাষ্য রচনা করেন।

৪. অথর্ব্ব

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদই প্রথমে 'ত্রয়ী' নামে অভিহিত হয় এবং তৎকালে অথর্ব্ববেদ 'অথর্ব্বন্' বা 'অথর্ব্বাঙ্গিরস' নামে অভিহিত হইত। অথর্ব্বন্‌গুলিও পরবর্তীকালে বেদব্যূহে প্রবেশ করিয়া বেদাখ্যা লাভ করে। বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদিতে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের ন্যায় অথর্ব্বন্‌গুলির কোন ভূমিকা ছিল না। অন্য পক্ষে, অথর্ব্ববেদের কোনও ক্রিয়াকাণ্ডে কেবলমাত্র অথর্ব্ববেদেরই মন্ত্র প্রযুক্ত হইত, তাহাতে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের কোনও মন্ত্র ব্যবহৃত হইত না। বেদব্যাস ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের মধ্যে সাধারণ যাগযজ্ঞের মন্ত্রাদি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। শত্রু মারণাদি, হিংস্র জন্তু হইতে ত্রাণ, অভিসম্পাদ বা দুর্দৈব হইতে রক্ষা, প্রভৃতি ঐহিক ফলপ্রদ যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত মন্ত্রই 'অথর্ব্বন্' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। আঙ্গিরস অথর্ব্বা ঋষি ঐ সকল মন্ত্র সঙ্কলন করেন বলিয়া তাঁহার নামে ইহারা 'অথর্ব্বন্' নামে খ্যাত। শ্রৌতসূত্রগুলির সহিত অথর্ব্ববেদের কোনও সংশ্রব লক্ষ্য করা যায় না, কারণ অথর্ব্ববেদের ক্রিয়াগুলি 'শ্রৌত' বা বেদবিহিত যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে অথর্ব্বন্‌গুলির প্রয়োগ ছিল, সেই কারণে গৃহ্যসূত্রে অথর্ব্ববেদের অপর নাম 'ব্রহ্মবেদ' বলিয়া উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে যজ্ঞে ব্রহ্মার ভূমিকা স্মরণ করা যাইতে পারে।

অথর্ব্ববেদের অধিকাংশই পদ্য এবং সামান্য অংশ গদ্য। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল হইতে ইহার অনেকগুলি 'সূক্ত' গৃহীত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের দুইটি শাখা প্রচলিত আছেঃ ১। পৈপ্পলাদ শাখা ও ২। শৌনক শাখা। শৌনক শাখার উপর সায়ণাচার্য তাঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদের

পরিশিষ্টে পৈপ্পলাদ শাখার উল্লেখ আছে। অধুনা পূর্বভারতীয় পৈপ্পলাদ শাখার অথর্ব্ববেদের একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ

বেদের শাখাভেদের কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক বেদের প্রতিটি শাখারই একখানি করিয়া 'ব্রাহ্মণ' ছিল। ব্রাহ্মণভাগ সংহিতা হইতে পৃথক গ্রন্থ। বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়াপ্রণালী নির্দেশ, ক্রিয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও ব্যাখ্যাদান এবং আখ্যানাদি বর্ণনা হইল ব্রাহ্মণদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্থানে স্থানে আনুষঙ্গিক ব্যাকরণাদি ও অন্যান্য অবান্তর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শেষ অংশ 'আরণ্যক' নামে অভিহিত এবং আরণ্যকের শেষভাগ ইইল 'উপনিষৎ'। 'আরণ্যক'গুলি গার্হস্থ্য আশ্রমের অবসানে নিভৃতারণ্যে পঠিত হইত বলিয়া আরণ্যক নামে অভিহিত। 'উপনিষৎ' ভাগ পরমব্রহ্মের তত্ত্বান্বেষণে নিমগ্ন এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ডের পরিচায়ক।

যে হেতু ব্রাহ্মণ ব্যতীত যজ্ঞ প্রণালী নিরূপিত হইতে পারিত না, সেই কারণে প্রত্যেক বেদের প্রতিটি শাখাধ্যায়িগণেরই একটি করিয়া ব্রাহ্মণ ছিল। ঐ ব্রাহ্মণাবলম্বনেই ঐ শাখাবলম্বী আর্যগণের যাগযজ্ঞ নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু কালক্রমে একই বেদের কোনও কোনও শাখাবলম্বীরা অপর শাখার ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিয়াছেন, এমনও দেখা যায়। ব্রাহ্মণভাগে তিনটি বিষয় থাকে: (১) যজ্ঞপ্রণালী বা যজ্ঞবিধি, (২) অর্থবাদ বা ব্যাখ্যা ও (৩) উপনিষৎ বা ব্রহ্মতত্ত্ব।

সকল ব্রাহ্মণই একই কালে রচিত নহে। ব্রাহ্মণগুলি কালক্রমে রচিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে ঋগ্‌বেদের দুইখানি ব্রাহ্মণ, (১) ঐতরেয় এবং (২) সাঙ্খ্যায়ন বা কৌষীতকি; কৃষ্ণযজুর্বেদের (৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও শুক্লযজুর্বেদেব (৪) শতপথ ব্রাহ্মণ: সামবেদের (৫) তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ এবং (৬) তবলকার বা জৈমিনীয় বা ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ; এবং অথর্ব্ববেদের (৭) গোপথ ব্রাহ্মণ—এই সাতটি ব্রাহ্মণ সমধিক প্রসিদ্ধ।

বেদের দুইটি কাণ্ড আছে, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ব্রাহ্মণসমূহে বিপুল

কর্মকাণ্ডের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, অপর পক্ষে, উপনিষদ্‌সমূহে পাওয়া যায় জ্ঞানকাণ্ডের পরিচয়। আরণ্যকগুলি কর্ম ও জ্ঞান উভাশ্রয়ী এবং সেই কারণে যেন ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী সেতুস্বরূপ। ঋগ্‌বেদের আরণ্যক দুইটি—ঐতরেয় ও সাঙ্খ্যায়ন। কৃষ্ণযজুর্বেদের হইল তৈত্তিরীয় আরণ্যক ; শুক্লযজু-বেদের বৃহদারণ্যক। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলির কোনও আরণ্যক পাওয়া যায় না এবং বেদের সকল শাখার ব্রাহ্মণেরই যে আরণ্যকাংশ ছিল, এরূপ বোধ হয় না।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের সূক্তগুলিতে বৈদিক ঋষিগণের যে দার্শনিক চিন্তাধারার স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়, আরণ্যকে এবং কালক্রমে উপনিষদ্‌সমূহে সেই দার্শনিক চিন্তাধারারই সুপরিস্ফুট ও বিস্তারিত পরিচয় লাভ করা যায়। পরিদৃশ্যমান বিশ্বের অন্তরালে ও প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের প্রতিভূ স্বরূপ দেবতাগণের আশ্রয় রূপে যে এক বিশ্বব্যাপী 'মহতোমহীয়ান্' পরমব্রহ্ম আছেন তাঁহার স্বরূপ উদ্ঘাটনই উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য। আধ্যাত্মিক মননশীলতায় উপনিষদ্‌গুলি বিশ্বজনীন সাহিত্যে সমুচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে।

উপনিষদ্‌গুলিতে পরমব্রহ্মতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। কর্মকাণ্ড ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের সুখসমৃদ্ধিতে ব্যাপৃত কিন্তু উপনিষদ্‌গুলিতে পরম-ব্রহ্মের স্বরূপ ও ভববন্ধন হইতে মুক্তি প্রভৃতিই চিন্তিত হইয়াছে। কেন আসিয়াছি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কেন জীবনস্রোতে সুখ ও দুঃখের অধীন হইয়াছি, প্রকৃত সুখ কি—এই সকল গভীর চিন্তাতেই উপনিষদ্‌গুলি পরিপূর্ণ।

দুই শতের অধিক উপনিষদের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই তুলনামূলক ভাবে আধুনিক কালের রচনা। কতকগুলিতে পরবর্তী কালের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতের অবতারণাও করা হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দীর শঙ্করাচার্য বারখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং ঐ বারখানি উপনিষদকেই তিনি প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুত্ববোধে ইহার সহিত মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ্‌টিও যুক্ত করা যাইতেছে। বেদ অনুসারে এই তেরটি প্রধান উপনিষৎ হইল : ঋগ্‌বেদ—১।

ঐতরেয় ও ২। কৌষীতকি ; সামবেদ—৩। ছান্দোগ্য ও ৪। কেন ; যজুর্বেদ—(ক) কৃষ্ণযজুর্বেদ—৫। তৈত্তিরীয়, ৬। কঠ, ৭। মৈত্রায়ণীয় ও ৮। শ্বেতাশ্বতর। (খ)—শুক্লযজুর্বেদ—৯। বৃহদারণ্যক ও ১০। ঈশা এবং অথর্ব্ববেদের ১১। প্রশ্ন, ১২। মণ্ডুক ও ১৩। মাণ্ডূক্য। রচনাকাল অনুসারে প্রধান প্রধান উপনিষদ্‌-গুলিকে চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষীতকি। এইগুলির ভাষার সহিত প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলির ভাষার সাদৃশ্য আছে। এইগুলি গদ্যে রচিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে—কেন। ইহার কতকাংশ পদ্য ও কতকাংশ গদ্য। আরও পরবর্তী ঈশা, শ্বেতাশ্বতর, মণ্ডুক ও মহানারায়ণ উপনিষৎ পদ্যে রচিত। এই উপনিষদ্‌গুলিতে কোন নূতন তত্ত্বের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় নাই। তৃতীয় পর্যায়—প্রশ্ন, মৈত্রায়ণীয় ও মাণ্ডূক্য উপনিষদ্‌গুলি গদ্যে রচিত। কিন্তু ইহাদের ভাষা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রভৃতির ন্যায় প্রাচীন নহে। চতুর্থ পর্যায়ে উপরে উল্লিখিত উপনিষদ্‌গুলি ভিন্ন অথর্ব্ববেদের অন্যান্য অর্বাচীন উপনিষদ্‌গুলি লিখিত হইয়াছিল।

খ. বেদাঙ্গ

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এইগুলি ষড়ঙ্গ। বেদাধ্যয়নের সহায়তাকারী বলিয়া এবং এই ছয়টি বিভাগে জ্ঞান না থাকিলে বেদের অর্থবোধ হয় না এবং বৈদিক ক্রিয়াদি সুচারু রূপে সম্পাদন করা যায় না বলিয়া এই গুলিকে বেদাঙ্গ বলা হয়। এই ছয়টি অঙ্গ শ্রুতি বলিয়া স্বীকৃত নয়, এইগুলি মনুষ্যরচিত বলিয়া বিদিত। এই অঙ্গগুলি সূত্রাকারে নিবদ্ধ এবং সূত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হইল যে সে-গুলি স্বল্পাক্ষর, অসংদিগ্ধ, বিশ্বতোমুখ এবং গদ্যে রচিত। পূর্ববর্তী যুগে ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে বিপুল চর্চা ও বিচারের পর ঋষিগণ যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীতি হইয়াছিলেন তাহার মর্ম সংক্ষেপে বলাই সূত্রের মূল উদ্দেশ্য।

১. শিক্ষা

শিক্ষা নামক বেদাঙ্গে বেদের নির্ভুল উচ্চারণ পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে স্বর, ব্যঞ্জন, উদাত্তাদিভেদ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শিক্ষার উল্লেখ থাকিলেও, যে কয়খানি শিক্ষা দৃষ্ট হয় তাহার অধিকাংশই বৈদিক যুগের পরে রচিত। ঐ সকল শিক্ষাগুলির মধ্যে পাণিনীয় শিক্ষাই সুপ্রসিদ্ধ। শিক্ষার বিষয়গুলি বিভিন্ন বেদসংশ্লিষ্ট 'প্রাতিশাখ্যে' নিবদ্ধ হওয়াতেই সম্ভবত বৈদিক যুগের শিক্ষাগুলি লোপ পাইয়াছে।

২. কল্প

ব্রাহ্মণভাগে বেদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ ও ব্যাখ্যা আছে। কালক্রমে যজ্ঞপ্রণালী ও ব্রাহ্মণভাগ এতই জটিল ও বিস্তীর্ণ হইয়াছিল যে উহার সুসংবদ্ধ সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ ব্যতীত যজ্ঞপ্রণালী শিক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ঐ সকল যজ্ঞপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়াই 'কল্পসূত্রে' বিবৃত হইয়াছে। প্রধান প্রধান প্রতিটি ব্রাহ্মণেরই 'কল্পসূত্র' দৃষ্ট হয়। কল্পসূত্রগুলি তিন খণ্ডে বিভক্ত ঃ

১। 'শ্রৌতসূত্র', ২। 'গৃহ্যসূত্র' ও ৩। 'ধর্মসূত্র'। শ্রৌতসূত্রগুলি ব্রাহ্মণভাগের যজ্ঞপ্রণালীর সারমর্ম এবং ব্রাহ্মণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষাৎ শ্রুতি-বিহিত প্রাচীন যজ্ঞাদির প্রণালী এই বিভাগে বিবৃত বলিয়াই ইহাকে 'শ্রৌতসূত্র' বলে। ইহাতে সাতটি হবির্যজ্ঞ, যথা (১) অগ্ন্যাধান, (২) অগ্নিহোত্র, (৩) দর্শপূর্ণমাস, (৪) আগ্রহয়ণ (৫) চাতুর্মাস্য, (৬) নিরূঢ় ও (৭) সৌত্রামনী এবং সাতটি সোমযজ্ঞ, যথা (১) অগ্নিষ্টোম (২) অত্যগ্নি-ষ্টোম (৩) উক্‌থ (৪) ষোড়শী (৫) বাজপেয় (৬) অতিরাত্র ও (৭) আপ্তোর্যাম,—এই চৌদ্দটি শ্রৌতযজ্ঞের বিধান আছে।

ব্রহ্মচর্য সমাপ্তির পর গৃহীর জীবনে অবশ্য কর্তব্য যজ্ঞগুলির প্রণালী যাহাতে নিবদ্ধ পাওয়া যায়, তাহাকে 'গৃহ্যসূত্র' বলে। গৃহ্যসূত্রগুলি কোন মূল ব্রাহ্মণভাগে নাই। বিভিন্ন বেদের শাখাধ্যায়িগণের ভিতর প্রচলিত নিয়মানুসারেই ঐগুলি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনে অবশ্য কর্তব্য অনুষ্ঠান, যথা অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, গর্ভাধান, গার্হস্থ্য সংস্কার, পঞ্চমহাযজ্ঞ, গৃহনির্মাণ, বাস্তুশোধন, পশুপালন, কৃষি ইত্যাদি নির্দিষ্ট হইয়াছে। 'গৃহ্যসূত্রে' সাতটি প্রধান বা পাকযজ্ঞ, পাঁচটি মহাযজ্ঞ এবং পনেরটি সংস্কার নির্দিষ্ট আছে। পিতৃশ্রাদ্ধ ইত্যাদি হইল পাকযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ইত্যাদি মহাযজ্ঞ এবং গর্ভাধান, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি হইল সংস্কার।

যে অংশে পারমার্থিক, রাজনৈতিক ও বর্ণাশ্রমধর্মের নিয়ম, সামাজিক রীতি ও ব্যবহারশাস্ত্র বা আইন নিবদ্ধ আছে তাহাকে 'ধর্মসূত্র' বলে। ধর্ম-সূত্রগুলিই পরবর্তী স্মৃতিগুলির মূলভিত্তি। ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্য দেশাচার, লোকাচার ইত্যাদির আলোচনা 'ধর্মসূত্রে'র অঙ্গ। 'গৃহ্যসূত্রে'র কোন কোন যজ্ঞ 'ধর্মসূত্রে'ও উল্লিখিত হইয়াছে।

৩. ব্যাকরণ

অতি প্রাচীন কালেই শব্দশাস্ত্রের সূক্ষ্মচর্চা সূচিত হইয়াছিল। কোনও কোনও প্রাচীন ব্রাহ্মণে ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিচার পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বেদাঙ্গ অন্তর্গত প্রাচীন ব্যাকরণ আজ আর দৃষ্ট হয় না। তবে পাণিনীর

গ্রন্থে বহু প্রাচীন বৈয়াকরণের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের ব্যাকরণ লুপ্ত হইয়াছে এবং সম্ভবত পাণিনীর সূত্রগুলি সর্বতোমুখী ও সর্বদেশদর্শী হওয়ায় তাহারই প্রভাবে অন্যান্য প্রাচীন ব্যাকরণগুলি ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়াছে। পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে লৌকিক ও বৈদিক উভয় ব্যাকরণই আছে। সেই কারণে পাণিনীর রচনাকে বেদাঙ্গ আখ্যা দেওয়া যায় না।

৪. নিরুক্ত

নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গে আছে বৈদিক শব্দের বিশ্লেষণ ও তাহার অর্থ। দুরূহ বৈদিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ প্রদর্শনই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্যে। প্রাচীন নিরুক্তকারগণের গ্রন্থাবলী আজ বিলুপ্ত। কেবল মাত্র যাস্কাচার্যের নিরুক্তই বর্তমান কালে বিদ্যমান আছে। প্রাচীনতম বৈদিক শব্দকোষ হিসাবে পরিচিত 'নিঘন্টু' গ্রন্থের ভাষ্য হইল যাস্কের নিরুক্ত। যাস্ক পাণিনীর পূর্ববর্তী এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল খৃঃ পূঃ ৭০০—৫০০ অব্দের মধ্যে। সুতরাং 'নিঘন্টু'র রচনা তাহারও পূর্ববর্তী মনে করা হয়।

যাস্কের নিরুক্তে বহু পূর্বাচার্যের মত উল্লিখিত ও কোনও কোনও স্থানে খণ্ডিত হইয়াছে। যাস্ক অন্যান্য আচার্যগণের মধ্যে গার্গ্য, গালব, শাকটায়ন, ঔর্ণবাভ, শাকপূণি, কৌৎস প্রমুখের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যাস্কাচার্যের কালেই বেদের বহু স্থল এরূপ দুর্বোধ্য হইয়াছিল যে কোনও কোনও আচার্য ঐ সকল সূত্রের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা বৃথাশ্রম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ঐ কথা যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ঋগ্‌বেদের অধিকাংশ দুরূহ শব্দেরই টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৈদিক শব্দগুলির মূলজ ধাতুগত অর্থগ্রহণ করিয়া তাহারই সাহায্যে যাস্কাচার্য বেদ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বৈদিক যুগের নিকটবর্তী বলিয়া পূর্বসূরীদের মত জ্ঞাত ছিলেন এবং সেই কারণে তিনি বেদের ব্যাখ্যা রচনায় পরবর্তী আচার্য সায়ণ অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সায়ণাচার্য সকল স্থানে যাস্কাচার্যের মত গ্রহণ করেন নাই।

ভূমিকা

ক. প্রতীচ্যে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস

ইয়োরোপীয়গণ, বিশেষতঃ ধর্মপ্রচারক এবং পরিব্রাজকগণ, ভারতীয় ভ ষাসমূহের পরিচিতি লাভ করেন সপ্তদশ শতাব্দীতে। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে আব্রাহাম রোজার (Abraham Roger) ভর্তৃহরির কাব্যের পর্তুগীজ অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে জেসুইট যাজক জোহান আর্ণস্ট হাঙ্ক্‌স্লেডন (Johann Ernst Hanxleden) ভারত আগমন করেন এবং সংস্কৃতভাষায় জ্ঞানার্জনের পর ইয়োরোপীয় ভাষায় প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। পুস্তকটি অবশ্য প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু দুইটি সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা ফ্রা পাওলিনো দ্য সেন্ট বার্থোলোমিস (Fra Paolino de St Bartholomes) উহার উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে 'বিবাদার্ণবসেতু' শীর্ষক গ্রন্থ ইংরাজীতে সংকলিত হয় এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে *A Code of Gentoo Law* নামে ইহা প্রকাশিত হয়। নয় বৎসর পরে চার্লর্স উইলকিনস (Charles Wilkins) ভগবদ্গীতা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। হিতোপদেশ এবং মহাভারতের শকুন্তলা উপাখ্যানের অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে ইয়োরোপীয়গণের অনুসন্ধিৎসার মূলে অবশ্য স্যার উইলিয়াম জোন্সের (Sir William Jones) অবদানই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কালিদাস বিরচিত শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। কালিদাসের অমর নাটকের ইংরাজী অনুবাদের পরই ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে জর্জ ফর্স্টারের (Georg Forster) জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহা হার্ডর এবং গ্যোয়টের ন্যায় মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জোন্সের উদ্যমেই ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের মূল পাঠ প্রকাশিত হয়। তাঁহার তৃতীয় রচনা প্রাচীন ভারতীয় দণ্ডনীতি সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'মনুস্মৃতি'র

অনুবাদ। জোন্সের আরব্ধ কার্যের অনুসরণে হেনরি টমাস কোলব্রুক (Henry Thomas Colebrook) প্রাচীনপন্থী ভারতীয় পণ্ডিতগণের সংস্কৃত গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া *A Digest of Hindu Law or Contract and Successions* প্রকাশ করেন। অমরকোষ, অষ্টাধ্যায়ী, হিতোপদেশ এবং কিরাতার্জুনীয় সমেত আরও কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদনাও তিনিই করিয়াছিলেন। আর একজন ইংলণ্ডবাসী আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন (Alexander Hamilton) ভারতবর্ষেই সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পথে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আদেশে অন্যান্য ইংরেজগণের সঙ্গে তিনিও প্যারিসে কারাবরণ করেন। কারাবাসের সময়ে হ্যামিলটন এমন একদল ইয়োরোপীয় ছাত্র গঠন করেন যাঁহারা আন্তরিক আগ্রহে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন। ইহাকেই পাশ্চাত্যে 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আবিষ্কার' রূপে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। হ্যামিলটনের বিশিষ্টতম ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন মহান জার্মান পণ্ডিত ও কবি এবং *On the Language and Wisdom of the Indians* শীর্ষক যুগান্তকারী গ্রন্থের রচয়িতা ফ্রিড্‌রিখ্‌ শ্লেগেল্ (Friedrich Schlegel)। উক্ত গ্রন্থটিই প্রথম সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় তুলনামূলক এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রবর্তন করে। রামায়ণ, ভগবদ্গীতা, মনুস্মৃতি এবং আরও কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের অংশবিশেষে জার্মান অনুবাদও ইহাতে সন্নিবেশিত। ফ্রিড্‌রিখ্‌ শ্লেগেলের ভ্রাতা এবং প্রথম সংস্কৃতজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক এ. এল. সেৎসির (A. L. Chezy) শিষ্য অগাস্ট ভিলহেল্‌ম ফন্ শ্লেগেলের (August Wilhelm von Schlegel) অবদান কেবলমাত্র তুলনামূলক ভাষাচর্চার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সম্পাদনা এবং অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃতভাষা অনুশীলনের প্রসারেও তাঁহার দান ছিল। শ্লেগেলের শিষ্য খ্রিস্টিয়ান ল্যাসেন (Christian Lassen) ভারতীয়-সংস্কৃ. বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রবর্ত ছিলেন ফ্রান্‌ৎস্ বপ (Franz Bopp)—অধ্যাপক সেৎসির ছাত্র এবং অগাস্ট ভিলহেল্‌মের সমসাময়িক। *Conjugations-system* গ্রন্থে রামায়ণ এব মহাভারতের অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে

তাঁহার মহতী সেবার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহ জার্মানিতে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন উল্লেখযোগ্যরূপে প্রসারিত করিয়াছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে বপের গবেষণার ব্যাপকতম রূপদান করেন ভিলহেল্‌ম ফন্ হামবোল্ট (Wilhelm von Humboldt)। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার আগ্রহ ছিল আজীবন। আর একজন বিশিষ্ট জার্মান পণ্ডিত হইলেন ফ্রিড্‌রিখ রুকার্ট (Friedrich Ruckert)। ভারতীয় কাব্যে তাঁহার অপরিসীম আগ্রহ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উপনিষদের ল্যাটিন অনুবাদ জার্মান দার্শনিকগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং শেলিং (Scheling) কান্ট (Kant), শীলার (Schiller) ও শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) ইহার মধ্যে সর্বোত্তম মানবিক জ্ঞানের বিকাশ আবিষ্কার করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বৈদিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত গবেষণার কার্য প্রথম গ্রহণ করিয়াছিলেন ফ্রিড্‌রিখ্ রোজেন (Friedrich Rosen) ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে। এবং উত্তরকালে বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ইউজিন বার্ণফ-এর কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্র সেই আরব্ধ গবেষণা চালাইয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন রুডল্‌ফ রোথ (Rudolph Roth) এবং এফ. ম্যাক্স ম্যুলর (F. Max Muller) যিনি ১৮৪৯ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সায়ণের টীকাসমেত ঋগ্বেদের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। রোথের একজন বিশিষ্টতম শিষ্য ছিলেন এইচ. গ্রাসমান (H. Grassmann)। ঋগ্বেদের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ তিনিই প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই সময়েই হোরেস হেম্যান উইলসন (Horace Hayman Wilson)—যিনি কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন—সায়ণের টীকানুসরণে ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়া ইহার প্রাচীনপন্থী ব্যাখ্যা পণ্ডিত সমাজে উপস্থাপিত করেন। অনুরূপ গবেষণা করিয়াছিলেন আলফ্রেড লুডভিগ (Alfred Ludwig), যাঁহাকে *Vedic Studies*-এর যুগ্ম গ্রন্থকার আর. পিশেল (R.Pischel) এবং কে. এফ. গেল্ডনারের (K. F. Geldner) পূর্বসূরী বলিয়া গণ্য করা হয়। বৈদিক সাহিত্য গবেষণাক্ষেত্রে থিয়োডোর ওফ্রেখ্‌ট (Theodor Aufrecht)-এর নামও যুক্ত।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে *St Petersburg Dictionary* প্রকাশ পাশ্চাত্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রগতিশীল চর্চার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই

অভিধান সংকলন করিয়াছিলেন ওটো ব্যোটলিংক (Otto Bohtlingk) ও রুডলফ রোথ, এবং St Petersburg-স্থিত Academy of Fine Arts and Sciences ইহার প্রকাশক। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আলব্রেখ্‌ট ভেবার (Albrecht Weber)-এর *The History of Indian Literature* আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। ১৮৯১, ১৮৯৬ এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে থিয়োডোর ওফ্রেখ্‌ট কর্তৃক প্রকাশিত *Catalogus Catalogorum* সংস্কৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের একটি ব্যাপকতম তালিকা এবং উক্ত ধরনের গ্রন্থরাজির মধ্যে একটি বিস্ময়কর অবদান। আর্থার অ্যান্টনি ম্যাকডোনেল (Arthur Anthony Macdonell) রচিত *Vedic Grammar* ও *Vedic Mythology* এবং ম্যাকডোনেল ও আর্থার ব্যারিডেল কিথ সম্পাদিত *Vedic Index* ইয়োরোপে সংস্কৃতচর্চার প্রসারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। মরিস ব্লুমফিল্ড (Maurice Bloomfield) বিরচিত *Vedic Concordance* আরও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ যাহা পাশ্চাত্য বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যচর্চাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। উইলিয়ম ডুইট হুইটনির (William Dwight Whitney) *Sanskrit Grammar*ও অপর একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড কাউয়েল (Edward Cowell) 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' এবং আরও অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। বারাণসী রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ আর্থার ভেনিসও (Arthur Venis) সংস্কৃতচর্চার প্রসারের জন্য অনেক কিছু করিয়া গিয়াছেন। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতে বসবাস করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃতশাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জে. এফ. ফ্লীট (J. F. Fleet), ভিনসেন্ট এ. স্মিথ (Vincent A. Smith), স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম (Sir Alexander Cunningham), স্যার জন এইচ. মার্শাল (Sir John H. Marshall), স্যার এম. এ. স্টাইন (Sir M. A. Stein), স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন (Sir George Grierson) এবং জে. ফারগুসনের (J. Fergusson) নাম উল্লেখযোগ্য।

পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদগণের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃতচর্চার ক্ষেত্রে অমূল্য

অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জর্জ ব্যুহ্‌লার (George Buhler), জে. মূর (J. Muir), ফ্রাঙ্ক কিলহর্ণ (Frank Kielhorn), ই. রোয়ের (E. Roer), এইচ. ল্যুডার্স (H. Luders), হেরমান জাকোবি (Herman Jacobi), ই. সেনার্ত (E. Senart), সিলভঁা লেভী (Sylvain Levi), এডওয়ার্ড ওয়াশবার্ণ হপকিন্স (Edward Washburn Hopkins), ইয়ুগেন হুল্‌ট্‌জশ্‌ (Eugen Hultzsch), আর্থার কোক বার্নেল (Arthur Coke Burnell), মোনিয়ার এম. উইলিয়ামস্‌ (Monier M. Williams), থিয়োডোর গোল্ডস্ট্যুকার (Theodor Goldstucker), রিচার্ড গার্বে (Richard Garbe), পল ডয়সেন (Paul Deussen) জুলিয়াস ইগেলিং (Julius Eggeling), জর্জ থিবো (George Thibaut), য়ুলিয়াস য়োলি (Julius Jolly), মরিস ভিন্‌তারনিৎস্‌ (Maurice Winternitz), এফ. ডব্লু. টমাস (F. W. Thomas), এল. ডি. বার্নেট (L. D. Barnett), টি. স্‌চেরবাৎস্কি (T. Tscherbatskey), স্টেন কোনো (Sten Konow), ভালে পুসঁা (Vallee Poussin), ওটো স্ট্রস্‌ (Otto Strauss), সি. আর. ল্যানম্যান (C. R. Lanman) এবং জিসেপ্পে তুচ্চির (Giuseppe Tucci) নাম সকল সংস্কৃতানুরাগীর নিকটই সুবিদিত ।

খ. ভারতীয় লিপির উদ্ভব

ভূমিকা

স্মরণাতীত কাল হইতেই সংস্কৃত সাহিত্যের শিক্ষার্থীগণ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়সমূহ মুখস্থ করিতেন। পুরুষানুক্রমিক ভাবে এই মৌখিক হস্তান্তরণের পদ্ধতিই প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যকে সংরক্ষিত করিয়াছে। এই জন্যই পণ্ডিতগণ মনে করেন যে ভারতীয় সভ্যতাব আদি যুগে সম্ভবত লিপির প্রচলন ছিল না এবং প্রাচীন ভারতীয় বর্ণ-মালার পরবর্তী গঠন সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় নহে।

বৌদ্ধ ও সূত্র বচনাদি

সংস্কৃত সাহিত্যে লিপির সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় বশিষ্ঠের 'ধর্মসূত্রে'। ডঃ বুহ্‌লারের মতে ইহার রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী। কোন কোন পণ্ডিত অবশ্য ইহাকে আরও পরবর্তীযুগের, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে করেন। সেখানে আমরা বৈদিকযুগে লিপির ব্যাপক প্রচলনের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাই এবং ষোড়শ অধ্যায়েব দশম, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে আইনতঃ গ্রাহ্য প্রমাণ হিসাবে লিখিত দলিলের উল্লেখ আছে। অধিকন্তু পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে 'লিপিকর' এবং 'লিবিকর' এই দুইটি সমাসপদ অন্তর্ভুক্ত দেখি (৩. ২. ২১)। ইহাদের অর্থ লিপিকার। পাণিনির তারিখ লইয়া অবশ্য মতভেদ আছে। অধ্যাপক গোল্ডস্ট্যুকার তাঁহাকে খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করেন। পক্ষান্তরে অধিকাংশ পণ্ডিতবর্গের মতে তিনি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উপরোক্ত প্রমাণ ব্যতীতও, 'অক্ষর,' 'কাণ্ড,' 'পটল,' 'গ্রন্থ,' প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত শব্দসমূহ কেহ কেহ লিপির প্রচলনের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই শব্দগুলির তাৎপর্য লইয়া মতভেদ আছে।

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য

উপরোক্ত প্রমাণসমূহ কিন্তু প্রকৃত ভারতীয় লিপির কাল নির্ধারণে আমাদের সাহায্য করে না। কারণ যে গ্রন্থসমূহে প্রমাণগুলির উল্লেখ আছে তাহাদের কোনটিকেই লেখমালার প্রচলনের পূর্ববর্তীযুগের বলিয়া নিঃসন্দেহে মনে করা যায় না। সেইরূপ, মহাকাব্য, পুরাণ বা কাব্যে উল্লিখিত প্রমাণসমূহের মূল্য অল্পই কিংবা আদৌ কোন মূল্য নাই। ইহাদের মধ্যে মহাকাব্যদ্বয় সন্দেহাতীতরূপে প্রাচীনতম। কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত সমস্ত শব্দই যে বহু প্রাচীন তাহা বলা যায় না। একটি কথা অবশ্য অনস্বীকার্য। মহাকাব্যদ্বয়ে 'লিখ', 'লেখ', 'লেখক', লেখন', প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু 'লিপি' কথাটি নাই। ইহা অনেকের মতে একটি বিদেশী শব্দ মাত্র। ইহাতে মনে হয় যে মহাকাব্যের যুগে ভারতবর্ষে লেখার প্রচলন ছিল।

ভারতীয় সভ্যতা

আরও দুইটি তথ্যও একই ইঙ্গিত বহন করে। একথা বলা হইয়া থাকে যে আর্যগণ উন্নত সভ্যতার সহিত পরিচিত ছিলেন—বাণিজ্য এবং আর্থিক লেনদেনের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল এবং আর্যগণ ব্যাকরণ, ধ্বনিবিজ্ঞান ও অভিধান রচনায় সূক্ষ্ম গবেষণা চালাইয়া গিয়াছিলেন। এই তথ্যগুলি কি প্রাচীন ভারতীয়গণের মধ্যে লিপিজ্ঞানের পরিচয় বহন করে না? অবশ্য আমাদের প্রমাণের উল্লেখ দেখাইতে হইবে। তদ্ব্যতীত কিছুই মানিয়া লওয়া যায় না। সুতরাং আমরা বৌদ্ধ রচনাবলীর কথায় আসিতে পারি।

বৌদ্ধ রচনাবলী

সিংহলী ত্রিপিটকে এমন অনেকগুলি অংশ আছে যাহা লিপিজ্ঞানের এবং যে যুগে বৌদ্ধ অনুশাসনটি রচিত হইয়াছিল সে যুগে লিপির ব্যাপক প্রচলনের সাক্ষ্য বহন করে। 'ভিখখু পাচিত্তিয়' (২.২) এবং 'ভিখখুনী পাচিত্তিয়'তে (৪৯.২) 'লেখ' এবং 'লেখক' কথা ইটির উল্লেখ আছে এবং 'ভিখখু-পাচিত্তিয়'তে লেখবিদ্যার প্রভূত প্রশংসা করা হইয়াছে। জাতকমালায় বর্ণ

সমূহ অনবরতই উল্লিখিত। জাতকসমূহে কতকগুলি ধর্মসংক্রান্ত নিষেধ আছে ; এবং 'অক্ষরিকা' বলিয়া একটি ক্রীড়ার উল্লেখ আছে যাহাতে কোন বৌদ্ধসন্ন্যাসী অংশগ্রহণ করিতে পারিতেন না। এই ক্রীড়াটি খুব সম্ভবতঃ বর্ণমালার অনুমাণ সংক্রান্ত। 'বিনয়ে' উক্ত নিয়মানুসারে যে অপরাধীর নাম রাজদ্বারে লিখিত আছে তাহাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিসাবে গ্রহণ করা হইত না। উপরোক্ত রচনাতেই লিখনকে একটি লাভজনক পেশা হিসাবে বলা হইয়াছে। জাতক নং ১২৫ এবং মহাবগ্‌গ (১. ৪৯) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে ; সেখানে শিক্ষাপদ্ধতি ছিল বর্তমান ভারতের ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষণ পদ্ধতির মতোই। এই সকল নজির প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে লেখবিদ্যার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

পিপবাওয়া পাত্রলিপি

প্রাচীনতম লিখিত দলিল হইল পিপবাওয়ায় প্রাপ্ত পাত্রলিপি। কর্ণেল ক্লাক্সটন পেপ্পে ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। লেখটি ব্রাহ্মী হরফে লিখিত। ইহার ভাষা কিন্তু বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষাসমূহের নমুনা মানিয়া চলে নাই। কতকগুলি বিভক্ত্যন্তপদ 'মাগধী'র ন্যায়। কোন সমাস ব্যঞ্জনধ্বনি ইহাতে ব্যবহার করা হয় নাই। দুইটি এ-কার ভিন্ন অন্য কোন দীর্ঘস্বরও ইহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। লেখটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে যে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বুদ্ধদেবের। আবার কাহারো মতে স্মৃতিচিহ্নসমূহ শাক্যদের, যাহারা কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুত্র বিরুলক কর্তৃক নির্দয়ভাবে নিহত হইয়াছিল। যাহা হউক লেখটির তারিখ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমপাদ।

সোহ্‌গোরা তাম্রলিপি

প্রাচীনতার দিক হইতে ইহার পরেই সোহ্‌গৌরা তাম্রলিপির উল্লেখ করিতে হয়। ডঃ স্মিথ মনে করেন ইহা অশোকের রাজত্বকালের অর্ধশতাব্দী পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। ডঃ স্মিথের মতে ইহাতে ব্যবহৃত হরফসমূহ মৌর্যযুগের ব্রাহ্মীলিপি এবং ডঃ ব্যুহ্‌লার বলিয়াছিলেন যে স্মিথের এই মন্তব্য

অখণ্ডনীয় কারণ অশোকানুশাসনে সোহ্‌গৌরা লিপিতে ব্যবহৃত সমস্ত হরফই খুঁজিয়া বাহির করা যায়। লেখটির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে কেহই নিঃসন্দেহ নন। ডঃ স্মিথ বলিয়াছেন যে তিনি ইহার কোন অর্থই খুঁজিয়া পান নাই। লেখটির মূল্য এই যে ইহা প্রমাণ করে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রাজকার্যে লিপির ব্যবহার ছিল এবং সাধারণ লোকেদেরও লিপিজ্ঞান ছিল।

অশোক, নহপান ও রুদ্রদামনের লেখসমূহ

অশোকের অনুশাসনসমূহ ভারতের সর্বত্র পাওয়া গিয়াছে এবং সেগুলি দুইটি ভিন্ন হরফে লিখিত—ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। সাহ্‌বাজগরহি এবং মানসেরাতে প্রাপ্ত লেখ খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত। বাকিগুলি ব্রাহ্মী হরফে নিবদ্ধ। প্রাচীনতম ভারতীয় লেখসমূহের ভাষা সংস্কৃত নহে, কথ্যভাষা যাহা 'প্রাকৃত' বলিয়া পরিচিত। অশোকানুশাসনসমূহে ইহার আঞ্চলিক রূপগুলি পাওয়া যায়। পূর্বাঞ্চলে প্রাপ্ত লেখগুলি অপেক্ষা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রাপ্ত লেখসমূহে 'পৈশাচী' রীতির লক্ষণ অধিক প্রকট। উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত লেখমালার ভাষাই প্রাকৃত। সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ প্রাচীনতম লেখ হইল নাসিকের ৯নং গুহার নহপানের লিপি। ৪১ শকাব্দ বা ১১৯ খৃষ্টাব্দে ইহা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে প্রাচীনতম সংস্কৃত লেখ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে খৃষ্টীয় ১৫০ অব্দে লিখিত রুদ্রদামনের জুনাগড় লেখই হইল আদিতম সংস্কৃত লেখ। লেখমালার ক্ষেত্রে প্রাকৃতের স্থলে ক্রমশ সংস্কৃত অনুপ্রবেশ করিতে আরম্ভ করে এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে লেখমালায় প্রাকৃতভাষার ব্যবহার লোপ পায়।

খরোষ্ঠী

ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী লিপির ইতিহাস সম্বন্ধে ডঃ ব্যুহ্‌লার মনে করেন যে শেষোক্তটি পারস্য সাম্রাজ্যের লিপিকারগণ কর্তৃক ব্যবহৃত অরমীয় বা ফিনিসীয় লিপি হইতে উদ্ভূত। প্রায় খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অ্যাকিমেনীয় বা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এবং ভারতবর্ষের

ঐ অঞ্চলেই খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত লেখ এবং মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডঃ ব্যুহ্‌লার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে কয়েকটি ধার করা বর্ণ হইতেই সংস্কৃত ভাষার সম্পূর্ণ বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতগণ খরোষ্ঠী কথাটির একটি অর্থ পর্যন্ত বাহির করিয়াছেন। মনে করা হয় যে গর্দভের ওষ্ঠের আকার সদৃশ হরফ হইতেই খরোষ্ঠী নামটি উদ্ভূত হইয়াছে। অধ্যাপক লেভী মনে করেন যে শব্দটির উদ্ভব ইহার আবিষ্কর্তা খরোষ্ঠের নাম হইতে। খরোষ্ঠ মধ্য এশিয়ার অধিবাসী ছিলেন।

ব্রাহ্মী : দক্ষিণ ও উত্তর সেমেটিক উদ্ভব

ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আছে। ডঃ টেলর এবং অন্যান্যদের মতে একটি দক্ষিণাঞ্চলীয় আরব উপজাতিগণের নিকট হইতে ব্রাহ্মী লিপি অধিগত হইয়াছিল। এই মতবাদ অবশ্য কখনোই জনপ্রিয় হয় নাই। ডঃ ভেবার কর্তৃক প্রচলিত এবং ডঃ ব্যুহ্‌লার কর্তৃক উদাহৃত মতবাদই সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ডঃ ভেবারই প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে কতকগুলি প্রাচীন ভারতীয় লিপি কিছু আসিরীয় লিপি এবং আসিরিয়ায় প্রাপ্ত খৃঃ পূঃ নবম দশম শতকের লেখে ব্যবহৃত কোন কোন হরফের সমতুল্য। ঐ যুগের উত্তর সেমেটিক বর্ণমালার তেইশটির এক তৃতীয়াংশই অনুরূপ ভারতীয় বর্ণমালার প্রাচীনতম আকৃতির সদৃশ। দ্বিতীয় তৃতীয়াংশও অনেকটা একইরূপ এবং বাকি তৃতীয়াংশ ভারতীয় বর্ণমালার সহিত তুলনীয় বলিয়া মনে হয় না। ডঃ ভেবারের মতবাদের সুযোগ লইয়া ডঃ ব্যুহ্‌লার প্রমাণ করেন যে খৃঃ পূঃ অষ্টম এবং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় এবং ব্যাবিলনীয় বণিকদের দীর্ঘ সম্পর্কের ফলে ভারতীয় বণিকগণ আসিরীয়দের লিপি পদ্ধতি ভারতবর্ষে আনয়নের সুযোগ গ্রহণ করে। এই ভারতীয়গণের অধিকাংশই ছিলেন দ্রাবিড়। পরবর্তীকালে উক্ত লিপিপদ্ধতিই ভারতীয়দের প্রয়োজন অনুসারে প্রসার লাভ করে। প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে ইহা ব্রাহ্মী লিপি বলিয়া পরিচিত হয়। বলা হয় যে পূর্বে ইহা ডান দিক হইতে বামদিকে লেখা হইত। কারণ এরানে প্রাপ্ত একটি মুদ্রায় উৎকীর্ণ লেখ অনুরূপ ভাবে লিখিত। কিন্তু যেহেতু ব্রাহ্মণগণ ডান দিককে অধিকতর

প্রশস্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সেইহেতু তাঁহারা ইহা বাম হইতে ডান দিকে লিখিতে আরম্ভ করেন।

প্রাক্-সেমেটিক উদ্ভব

অধ্যাপক রিস্ ডেভিড্সের মতে ভারতীয় লিপির উদ্ভব উত্তর বা দক্ষিণ সেমেটিক হরফ হইতে নহে, বরং ইউফ্রেটিস উপত্যকায় প্রচলিত প্রাক্-সেমেটিক বর্ণমালা হইতে। কিন্তু কল্পিত প্রাক্-সেমেটিক বর্ণমালা এখনও আবিষ্কৃত না হওয়ায় এই মতবাদ গ্রাহ্য হয় না।

চিত্রলিপি

স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ভারতীয় চিত্রলিপি হইতে প্রতিটি হরফ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত ভারতে কোনও চিত্রলিপি আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাঁহার মতবাদও অগ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় খননকার্যের ফলে এখন ভারতীয় চিত্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং স্যার এ. কানিংহাম প্রবর্তিত মতবাদ আরেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

উপসংহার

সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় লিপি সংক্রান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান মৌর্য যুগের খুব বেশীদিন পূর্বের নহে। কিন্তু মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলমোহর সমূহের পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভবপর না হইলেও তাহারা প্রমাণ করে যে খৃষ্টের জন্মেরও অন্ততপক্ষে দুই হাজার বৎসর পূর্বে একধরনের লিপির প্রচলন ছিল। এই সীলমোহরগুলির পাঠোদ্ধারের এবং প্রাচীন জগতে প্রচলিত অন্যান্য লিপি হইতে ইহাদের উদ্ভব বা তাহাদের সহিত সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। একটি মতে, সিন্ধু-সভ্যতার লেখমালা কয়েকটি চিহ্নের সমষ্টি মাত্র এবং প্রত্যেকটি চিহ্নই একটি ভাবলেখ মাত্র। Hrozny হিট্টাইট লিপির সহিত সিন্ধুসভ্যতার লিপির সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে ডিরিঞ্জার নিঃসন্দেহ যে এমন

পিই ছিল না যাহা হইতে সিন্ধুসভ্যতার লিপির উদ্ভব প্রমাণ করা যায়। তাঁহার মতে সিন্ধুসভ্যতার লিপি এমন লিপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল যাহাকে বার্ণলিপি এবং প্রাচীন এলামাইট লিপির জনক বলিয়া মনে হয়। হাণ্টার এবং ল্যাংডন মহেঞ্জোদারো লিপিকে ব্রাহ্মীর পূর্বপ্রচলিত আকার বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অজানা এবং নিছক সম্ভাব্য ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত অনুমান হইতে কোন সুনির্দিষ্ট ফল আশা করা যায় না, বিশেষতঃ যখন সিন্ধুসভ্যতার লিপিচিহ্নসমূহের শব্দগত মূল্য এখনও অনাবিষ্কৃত। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিত্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় কিংবদন্তী অনুসারে লিপির আবিষ্কর্তা হইলেন ব্রহ্মা। একটি চৈনিক সূত্রানুসারে মনে হয় যে ভারতীয় ঐতিহ্যে যে বিশিষ্ট লিপির কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল ব্রাহ্মী। প্রাচীন ভারতীয়গণ মনে করিতেন যে তাঁহাদের লেখপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল জাতীয়, উদ্ভব ছিল এই ভারতবর্ষেই এবং প্রাচীনতা ছিল সুদূর। কিন্তু অশোকের অনুশাসনে, পিপ্‌রাওয়া পাত্রলিপিতে বা এরানের মুদ্রায় ব্যবহৃত লিপিকে যদি ব্রাহ্মী বলিয়া ধরা হয়, সিন্ধুসভ্যতার যুগে ব্যবহৃত লিপিকে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মী নামে আখ্যাত করা যায় না, কারণ দুইটির মধ্যে কোন সাদৃশ্যই এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই।

অশোকানুশাসনে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী লিপির উন্নত রূপ এবং খৃঃ পূঃ নবম এবং অষ্টম শতাব্দীতে ব্যবহৃত উত্তর সেমেটিক লিপি হইতে ইহার উদ্ভবের উপর ভিত্তি করিয়া ব্যুহ্‌লার ব্রাহ্মীলিপির প্রচলনের কাল প্রায় খৃঃ পূঃ ৮০০ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার যুক্তি অনুসারে এই তারিখকে ব্রাহ্মীলিপির প্রচলনের প্রথম যুগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে যাহা পরবর্তীকালে বহু পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং পরিবর্জনের মধ্য দিয়া অশোকানুশাসনে বা দুই একটি পূর্ববর্তী লেখে উদাহৃত লিপির রূপ ধারণ করে। কিন্তু সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে কোনরূপেই ভারতে লিপির প্রথম প্রচলনের কাল বলিয়া চিহ্নিত করা যায় না। কিংবা লিপির ব্যবহার ব্যতীতই, বা কোন লেখচিহ্নের সাহায্য ব্যতিরেকে নিছক স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে তাহাদের সাহিত্যের প্রয়োগবিধি এবং জটিলতা—ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ,

আর্থিক লেনদেন, সংখ্যা গণনা ইত্যাদি, কী উপায়ে এই উচ্চাঙ্গরূপ ধারণ করিয়াছিল, ব্যুহ্‌লারের মতবাদ তাহার ব্যাখ্যা করে নাই। ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বৈদিক আর্যগণের সভ্যতা ও কৃষ্টির সহিত সংযুক্ত লিপির কোন উদাহরণ অথবা কোন ইঙ্গিত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ব্রাহ্মীলিপির যে রূপ আমাদের নিকট পরিচিত, তাহার প্রচলনের পূর্বে ভারতে লিপির ক্রম-বিবর্তন বা পূর্বে ব্যবহৃত লিপির সহিত তাহার নৈকট্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন যুক্তিগ্রাহ্য অনুমান তৈরী করা সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মীর পূর্বে ব্যবহৃত লিপির অস্তিত্ব অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

ব্রাহ্মীর বৈদেশিক উৎপত্তির কথা, যদিও অনেকে বলিয়া থাকেন, এখন পর্যন্ত সুনিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে, অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিতই মনে করেন যে ভারতে লিপির উদ্ভব এতদ্দেশীয়। কিন্তু যত দিন সিন্ধুসভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার না হইতেছে বা ভারতীয় লিপির ইতিহাসে সিন্ধুসভ্যতা এবং মৌর্যযুগের মধ্যবর্তী দীর্ঘ ব্যবধানের উপর আলোক নিক্ষেপকারী কোন নূতন উপাদান আবিষ্কৃত না হইতেছে বা বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক ব্যবহৃত সম্ভাব্য লিপির উপর নূতন আলোকপাত না হইতেছে, ততদিন কোন সুনির্দিষ্ট উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব নহে। ভারতীয়দের প্রতিভার জন্যই ব্রাহ্মী হইতে আঞ্চলিক লিপিগুলির অসাধারণ ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে অশোকের সাম্রাজ্যের সর্বত্র তাঁহার অনুশাসনে ব্যবহৃত লিপিতে আঞ্চলিক পরিবর্তনগুলি লক্ষণীয়। পরবর্তী শতকসমূহে এই পরিবর্তনগুলি নূতন শক্তি সঞ্চয় করে। অসংখ্য আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক লিপির উদ্ভব হয় এবং তাহারা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। বৈজ্ঞানিক সত্যতার ভিত্তিতে এই আঞ্চলিক লিপিগুলির উৎপত্তি ব্রাহ্মী লিপি হইতে বাহির করা যায়। দুইটি প্রাচীন জৈনসূত্র 'সমবায়াঙ্গ সূত্র' এবং 'পন্নবাণ সূত্র'তে ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, দামিলি (দ্রাবিড়ীয়) এবং জবনালিয় সমেত আঠারোটি বিভিন্ন লিপির একটি তালিকা আছে। জবনালিয় লিপিকে পাণিনি-উদ্ধৃত যবনানী (গ্রীক লিপি) কথাটির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 'ললিতবিস্তরে' চৌষট্টি লিপির উল্লেখ আছে। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, বৈদেশিক লিপিসমূহ যথা চীনলিপি, হূণলিপি এবং

আঞ্চলিক লিপি যথা অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় লিপি এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ভারতীয় হরফে লিখিত লেখমালা এবং অন্যান্য মূল্যবান নিদর্শন এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতীতে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে সমস্ত দেশের সহিত ভারতের কার্যকর সম্পর্ক ছিল সে সকল দেশের জাতীয় লিপিমালা ভারতীয় লিপির ভিত্তিতেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী

Banerji, R. D. : *The Origin of the Bengali Script*

Buhler, G. : *Indian Paleography*
The Origin of Brāhmī Alphabet
The Origin of the Kharoṣṭhī Alphabet
(IA. Vol. XXIV)
Indian Studies, III

Cunningham, A. : *The Coins of Ancient India*

Cust, R. N. : *On the Origin of Indian Alphabet*
(JRAS, Vol. XVI, New Series)

Diringer, D. ; *The Alphabet*

Hunter, G. R. : *The Script of Mohenjo-Daro, etc.*

Le'vi, S. : *Indian Writing* (IA, Vol. XXXIII)
Kharoṣṭrī Writing (IA, Vol, XXXV)
Kharoṣṭra and the Kharoṣṭrī Writing

Mitra, P. : *New Light from Pre-historic India*
(IA, Vol. XLVIII)

Ojha, G. H. ; *Bhāratiya Prācina Lipimālā*

Pandey, R. B. : *Indian Paleography*, Part I

Shamasastry, R. *A Theory of the Origin of the Devanagari Alphabet* (IA, vol. XXXV)

Sivamurti, C. : *Indian Epigraphy and South Indian Scripts*

Taylor, I. : *The Alphabet*

Thomas, E. : *Princep's Essays*, Vol. II

গ. বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃত—তাহাদের সম্পর্ক

ভূমিকা

ভারতীয় ঐতিহ্যে সংস্কৃত দেবভাষা। গত চারি সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহা ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা। সাহিত্যসম্পদ, শব্দের চমৎকারিত্ব এবং বাগর্থের অপরূপ নমনীয়তার দিক হইতে বিচার করিলে পৃথিবীর সাহিত্যে সংস্কৃতভাষা একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

বৈদিক ও লৌকিক (ক্লাসিক্যাল) : বিষয়বস্তু ও চেতনাগত পার্থক্য

সংস্কৃত ভাষাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়, বৈদিক এবং লৌকিক। ভারতীয় আর্যগণের ধর্মীয় সাহিত্যের সম্পূর্ণই বৈদিক সংস্কৃতে লিখিত। বৈদিক ভাষার মধ্যে আবার কতগুলি স্তর সুপরিস্ফুট এবং একটি স্তর হইতে অপরটিতে উত্তরণের পথে ক্রমশঃ আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়া বৈদিক সংস্কৃত লৌকিক সংস্কৃতের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়। কিন্তু বৈদিক গীতিকাব্য হইতে লৌকিক সংস্কৃতের গীতিকাব্যে প্রবেশের পর আমরা যেন এক নূতন জগতে প্রবেশ করি। কেবল ব্যাকরণ, শব্দ, ছন্দ এবং রীতিই নহে, বিষয়-বস্তু এবং মননের দিক হইতে একটি পরিষ্কার প্রভেদ লক্ষণীয়। লৌকিক সংস্কৃতের যুগ এইরূপে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা বিশিষ্ট। বৈদিক সাহিত্য সম্পূর্ণরূপেই ধর্মীয়। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের একটি 'নিষিদ্ধ' দিকও আছে, যাহা কোন অংশেই ধর্মীয় দিক হইতে নিকৃষ্ট নহে। মহাকাব্য যুগের ধর্ম বৈদিক যুগের ধর্ম হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের উপাসনা বৈদিক যুগের প্রকৃতি-পূজার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এই মহাকাব্যের যুগেই আমরা প্রথম বিষ্ণুর অবতারসমূহের উল্লেখ পাই। বিষ্ণুই এই যুগে প্রধানতম দেবতা বলিয়া পূজিত। বৈদিক সাহিত্যে অনুল্লিখিত বিভিন্ন দেবদেবী

এই সময় আবির্ভূত হইয়াছেন। বৈদিক দেবতাগণ হয় বিস্মৃত অথবা নিকৃষ্টতর অবস্থায় পর্যবসিত হইয়াছেন। ইন্দ্রই একমাত্র দেবতা যিনি স্বর্গের অধিপতিরূপে এখনও উচ্চাসন বজায় রাখিয়াছেন। পূর্ববর্তী পর্যায়ে বৈদিক সাহিত্য বলিষ্ঠ আশাবাদ-যুক্ত। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে একটি বিষাদের সুর আছে। ইহার কারণ খুব সম্ভবতঃ কর্মবাদ এবং আত্মার দেহান্তরবাদের প্রভাব। বৈদিক সাহিত্যের অনাড়ম্বর সারল্য লৌকিক সংস্কৃতে প্রকটরূপে অনুপস্থিত। লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত এবং বিস্ময়কর বিষয়বস্তুর বর্ণনা অতিরঞ্জিত। যেমন কোন রাজার বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে তিনি স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন কিংবা কোন ঋষি তাঁহার প্রচণ্ড আত্মিক শক্তির দ্বারা হয়ত একটি নূতন জগতের সৃষ্টি করিলেন। রাজ্যে গোষ্ঠী সংগঠনের গুরুত্ব মহাকাব্যের যুগে অনেকাংশে খর্ব হইয়াছিল। এই যুগে বহু নৃপশাসিত রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল।

গঠনরীতির পার্থক্য : ক. স্বরপ্রক্রিয়া

গঠনরীতির দিক হইতেও লৌকিক সংস্কৃতের সহিত বৈদিক সংস্কৃতের বিস্তর ব্যবধান। চতুর্বেদ এবং ব্রাহ্মণসমূহে স্বরপ্রক্রিয়া (উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত) লক্ষণীয়। স্বরপ্রক্রিয়া বিভিন্ন শব্দের অর্থোদ্ধারে আমাদের সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি স্বরপ্রক্রিয়ায় 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দের অর্থ হইবে 'শত্রুরূপে ইন্দ্র', কিন্তু একটি ভিন্ন স্বরপ্রক্রিয়ায় ঐ একই শব্দের অর্থ দাঁড়াইবে 'ইন্দ্রের শত্রু'। লৌকিক সংস্কৃতে স্বরপ্রক্রিয়ার কোন ভূমিকাই নাই।

খ. ব্যাকরণ

ধ্বনিতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃতের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু ব্যাকরণগতরূপে তাহারা পরস্পর পৃথক। সাধারণভাবে নূতন পদগঠন বা প্রত্যয়ের পরিবর্তনের ফলে এই ব্যাকরণগত পরিবর্তন ঘটে নাই। ইহার জন্য দায়ী কতকগুলি পদের অবলুপ্তি।[১] ভাব

১. বৈদিক ভাষায় এমন কতকগুলি ব্যাকরণগত পদ দেখা যায়, লৌকিক ভাষায় যাহা

(mood) গত বিচারে লৌকিক এবং বৈদিক সংস্কৃতের মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি। বৈদিক সংস্কৃতে বর্তমান কাল বুঝাইতে নির্দেশক (বিধিলিঙ) ব্যতীত অভিপ্রায়, সম্ভাবক এবং অনুজ্ঞার ব্যবহার লক্ষণীয়। বিরল প্রয়োগ হইলেও এই তিনটি ভাবই সম্পন্ন কালের (Perfect) অন্তর্ভুক্ত। তাহারা সামান্য কালেও (লুন) ব্যবহৃত। কিন্তু ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইতে কোন ভাবের ব্যবহার নাই। লৌকিক সংস্কৃতে বর্তমানকালে লিঙ্ এবং লোটের ব্যবহার আছে। কিন্তু লেট লৌকিক সংস্কৃতে অবলুপ্ত।[২] বৈদিক ভাষায় অন্ততঃ পনেরোটি তুমর্থক প্রত্যয়ের প্রচলন ছিল।[৩] তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র একটি (তুম) লৌকিক সংস্কৃতে পাওয়া যায়। উপসর্গের ব্যবহারেও বৈদিক সংস্কৃত ও লৌকিক সংস্কৃতের মধ্যে পার্থক্য আছে। লৌকিক সংস্কৃতে উপসর্গগুলি ক্রিয়াপদের আগে সংযুক্ত হয়। কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতে ইহার ব্যবহার অবাধ ছিল। ক্রিয়া পদের আগে বা পরে এমনকি ক্রিয়াপদ হইতে বিচ্ছিন্ন রূপেও ইহা ব্যবহৃত হইত।[৪] দুইটির অধিক পদের সমাস লৌকিক সংস্কৃতে প্রচুর। কিন্তু বেদে এবং ব্রাহ্মণে ইহা এক প্রকার বিরল।

গ. শব্দভাণ্ডার

পদগঠনের দিক হইতে উপরোক্ত পরিবর্তনগুলির মূলে ছিল বৈয়াকরণগণের প্রচেষ্টা। ভাষার ক্রমবিকাশে তাঁহাদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। শব্দাবলীরও প্রচুর পরিবর্তন সাধিত হইল। প্রত্যয়নির্ণয়, শব্দগঠন ও শব্দচয়নের মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার বিস্তার লাভ করিল। বৈদিক ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এমন বহু পুরাতন শব্দ লৌকিক সংস্কৃতে প্রচলিত হইল, তেমনি নূতন শব্দও গঠিত হইল।

বিলুপ্ত হইয়াছে। এইভাবে শব্দরূপে কতকগুলি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে :

ক) অকারান্ত শব্দের প্রথমা এবং দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে 'অ''কা'রের ব্যবহার, যথা 'নরা',

(খ) অকারান্ত শব্দের প্রথমার বহুবচনে—আসঃ, যথা দেবাসঃ, (গ) অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে—'এভিঃ', যথা দেবেভিঃ।

২. অদ্য জীবানা, শতম্ জীবাতি শরদঃ।

৩. অষ্টাধ্যায়ী ৩, ৪, ৯।

৪. আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো।

ঘ. ছন্দ

ছন্দের ব্যবহারেও বৈদিক এবং লৌকিক সংস্কৃতের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। বেদের সাতটি প্রধান ছন্দ (গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ এবং জগতী) ব্যতীতও লৌকিক সংস্কৃতে অসংখ্য ছন্দের ব্যবহার বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী

Ghate, V. S. : *Lectures on the Ṛgveda.*

Kielhorn, F. : *A Grammar of Sanskrit Language*

Macdonell, A A. : *A History of Sanskrit Literature*
A Vedic Grammar
Vedic Mythology

Weber, A. : *The History of Indian Literature*

Whitney. W. D. : *A Sanskrit Grammar*

Williams, M. : *A Practical Grammar of the Sanskrit Language*

Winternitz. M. : *A History of Indian Literature.* Vol. I

ঘ. প্রাকৃত

প্রাচীনতা

প্রাকৃতভাষার সূচনাকাল বহু প্রাচীন। যে যুগে বৈদিক মন্ত্রসমূহ রচিত হইয়াছিল সে যুগেও একটি লৌকিক ভাষার অস্তিত্ব ছিল। সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা হইতে ইহা পৃথক ছিল। বৈদিক মন্ত্রসমূহেও কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলি ধ্বনিগত বিচারে প্রাকৃত শব্দ বলিয়াই মনে হয়। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধ এবং মহাবীর তাঁহাদের ধর্মীয় মতবাদ লৌকিক ভাষায় প্রচারিত করেন যাহাতে ইহা সর্বজনবোধ্য হয়। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ এবং ৪০০ অব্দের মধ্যে সংগৃহীত বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের ভাষা ছিল মাগধী। সিংহল, ব্রহ্ম এবং শ্যামদেশে অধুনা বর্তমান বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ একটি বিশেষ লৌকিক ভাষায় লিখিত। ইহাই পালি ভাষা বলিয়া আখ্যাত। পালি ভাষার উৎপত্তি এবং ইহা কোথায় প্রচলিত ছিল, পণ্ডিতগণের মধ্যে তাহা লইয়া মতভেদ আছে। পালি ভাষার সহিত একমাত্র যে প্রত্নলেখটির ভাষায় নৈকট্য আছে, সেটি হইল নন্দরাজের তিনশত বৎসব পরবর্তী খারবেলের হাথিগুম্ফা গুহা লিপি।

প্র কৃতেব সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ

পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে সংস্কৃ॰ একটি কথ্য ভাষা। কিন্তু ইহা ছিল সংস্কৃতিবান নাগরিকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষের লৌকিক উপভাষাটি সাধারণভাবে প্রাকৃত বলিয়া পরিচিত ছিল। সংস্কৃত নাটকে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মুখে যে ভাষা পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে সাধারণ মানুষ প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিলেও সংস্কৃত বুঝিত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে সংস্কৃ৽ এবং প্রাকৃত হইল একই ভাষার দুইটি শাখা মাত্র। প্রাকৃতের যে প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া যায় তাহাতে

এমন অংশবিশেষ আছে যাহা ধ্বনিতত্ত্বের সাধারণ নিয়মাবলীর প্রয়োগেই অনায়াসে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা যায়।

ইয়োরোপীয় অভিমত

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে প্রাকৃত হইল ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাসে মধ্য ভারতীয় যুগ। প্রাকৃত ভাষাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়—(১) প্রাচীন প্রাকৃত বা পালি, (২) মধ্যযুগীয় প্রাকৃত ও (৩) পরবর্তীযুগের প্রাকৃত বা অপভ্রংশ। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে প্রাকৃত যদি সংস্কৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইত তাহা হইলে ইহা সাংস্কৃত ভাষা বলিয়া আখ্যাত হইত। অধিকন্তু প্রাকৃতে অনেক শব্দ এবং পদ পাওয়া যায় লৌকিক সংস্কৃতে যাহার সন্ধান মেলে না। অবশ্য সংস্কৃত বলিতে যদি বেদ এবং প্রাচীন ভারতীয় যুগের সমস্ত উপভাষা বুঝানো হয় তাহা হইলে প্রাকৃত সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত বলিতে সাধারণতঃ পাণিনি-পতঞ্জলির ভাষাকেই বুঝানো হয়।

ভারতীয় মতবাদ

ভারতীয় বৈয়াকরণগণ অবশ্য বলেন যে প্রাকৃত কথাটির উৎপত্তি হইল প্রকৃতি শব্দ হইতে। ইহার অর্থ হইল ‘মূল আকার’ অর্থাৎ সংস্কৃত। অধিকন্তু প্রাকৃতে তিন শ্রেণীর শব্দ আছে। যথা: (১) তৎসম—গঠন এবং অর্থের দিক দিয়া সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে যে সকল শব্দের কোন প্রভেদ নাই, যেমন দেব, কমল; (২) তদ্ভব—ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মের প্রয়োগের দ্বারা যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন যেমন অজ্জউত্ত <আর্যপুত্র, পরিচুম্বিঅ <পরিচুম্ব্য; এবং (৩) দেশী—যে সকল শব্দ দেশজ এবং যাহাদের ইতিহাস ঠিকমত পাওয়া যায় না। যথা—ছোল্লান্তি, চঙ্গ। প্রাকৃত শব্দাবলীর সযত্ন অনুসন্ধানে মনে হয় যে বেশীর ভাগ শব্দই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অপর দুইটি শ্রেণীর অন্তর্গত শব্দ সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অল্প। প্রকৃতিপ্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বেশীর ভাগই অপধ্বনির ফলস্বরূপ।

সাহিত্যিক প্রাকৃতের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অধিকতর উল্লেখযোগ্য ঃ মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী এবং মাগধী নাটকে ব্যবহৃত, ও অর্ধ-মাগধী, জৈন মহারাষ্ট্রী এবং জৈন শৌরসেনী জৈনধর্মগ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত প্রাকৃত। সর্বশেষটি হইল অপভ্রংশ।

গ্রন্থপঞ্জী

Bhandarkar, R. G. : *Wilson Philological Lectures* (*Lecture* III)
Cowell, E. B. : *A Short Introduction to Prakrit*
Vararuci : *Prākṛtaprakāśa*
Woolner, A. C. : *An Introduction to Prākrit*

৬. সংস্কৃত কি কথ্যভাষা ছিল ?

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে একদল মনে করেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল প্রসার সত্ত্বেও সংস্কৃত কখনোই কথ্য ভাষা ছিল না। সংস্কৃত ছিল পরিপূর্ণ ভাবে সাহিত্যে ব্যবহৃত একটি অলঙ্কৃত ভাষা। যে ভাষায় প্রাচীন যুগেও সাধারণ লোকেরা কথা বলিত তাহা ছিল প্রাকৃত।

কিন্তু এমন প্রমাণ আছে যাহাতে মনে হয় যে সংস্কৃত সর্বতোভাবে ছিল একটি জীবন্ত ভাষা এবং সমাজের একটি বৃহৎ অংশ এই ভাষায় কথা বলিত। যাস্ক এবং পাণিনির ন্যায় শব্দশাস্ত্রবিদ্ এবং বৈয়াকরণগণ বৈদিক ভাষা হইতে পৃথক রূপে সংস্কৃতকে 'ভাষা' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[১] এবং ইহা বলা খুব সম্ভবত অসংগত হইবে না যে উপরোক্ত বিশেষণটি একটি জীবন্ত কথ্যভাষা রূপে লৌকিক সংস্কৃতের বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। অধিকন্তু পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এরূপ অনেক সূত্র আছে যেগুলি কোন একটি কথ্যভাষার প্রসঙ্গে উল্লিখিত না হইলে অর্থহীন হইয়া পড়ে।[২] যাস্ক, পাণিনি, এমনকি কাত্যায়ন পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের ভাষার বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করিয়াছেন।[৩] কাত্যায়ন আঞ্চলিক পার্থক্যগুলিও লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন এবং পতঞ্জলি বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত শব্দগুলি সংগৃহীত করিয়াছেন।[৪] পতঞ্জলি পুনরায় বলিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষার শব্দসমূহ সাধারণ জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি একটি উপাখ্যানেরও বর্ণনা দিয়াছেন যেখানে একজন বৈয়াকরণ জনৈক সূতের সহিত কথোপকথনরত। তাহাদের মধ্যে সমগ্র আলোচনাটিই সেখানে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে।[৫]

১. নিরুক্ত ১, ৪, ৫ এবং ৭; ২, ২, ৬ এবং ৭; অষ্টাধ্যায়ী ৩, ২, ১০৮ ইত্যাদি।

২. অষ্টাধ্যায়ী ৮, ৪, ৪৮ ইত্যাদি। গণসূত্র, ১৮, ২০, ২৯।

৩. নিরুক্ত ২, ২, ৮; অষ্টাধ্যায়ী ৪, ১, ১৫৭ এবং ১৬০।

৪. দ্রঃ মহাভাষ্যের পম্পসাহ্নিকে উল্লিখিত বার্ত্তিক, সর্বে দেশান্তরে।

৫. মহাভাষ্য অষ্টাধ্যায়ী ২, ৪, ৫৬।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ছিল একটি জীবন্ত কথ্য ভাষা। কিন্তু যে প্রশ্নটি এখনও আলোচনা সাপেক্ষ তাহা হইল সংস্কৃত কি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মাতৃভাষা ছিল অথবা সমাজের একটি বা একাধিক বিশেষ শ্রেণীর লোকের কথ্য ভাষা ছিল। পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে পাণিনির যুগে যে ভাষা কথিত হইত তাহা সে যুগের শিষ্ট ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শুনিয়া আয়ত্ত করা যাইত।[৬] শিষ্ট ব্রাহ্মণেরা কোন বিশেষ শিক্ষা ব্যতীতই শুদ্ধ সংস্কৃত বলিতে পারিত। রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড হইতেও মনে হয় দ্বিজ বর্ণের লোকেরা যে ভাষায় কথা বলিত তাহা ছিল সংস্কৃত।[৭] বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' বলা হইয়াছে যে রুচিবান নাগরিকগণ প্রদেশ বিশেষের মাতৃভাষা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই কথা বলিবে।[৮] ইহার অর্থ সংস্কৃত সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কথ্য ভাষা ছিল না। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (খৃঃ সপ্তম শতাব্দী) উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে ভাষায় সরকারী বিতর্ক চলিত তাহা ছিল সংস্কৃত এবং কোন প্রাদেশিক উপভাষা নহে। পঞ্চতন্ত্রেও উল্লেখ আছে যে শাসক শ্রেণীর বালকদের শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। কিন্তু কোন প্রাদেশিক ভাষা নহে।

ইহা হইতে আমরা এই উপসংহারে আসিতে পারি যে সংস্কৃত ছিল শিক্ষিত মানুষের কথ্য ভাষা। তবে ইহা একটি বৃহত্তর শ্রেণীর নিকটও বোধগম্য ছিল। আমাদের এই সিদ্ধান্ত নাটক-সাহিত্যে প্রাপ্ত প্রমাণাদিতেও সমর্থন লাভ করে। নাটকে আমরা দেখি ব্রাহ্মণ, রাজা এবং মন্ত্রিগণ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে কিন্তু স্ত্রীলোক এবং সাধারণ লোকের ভাষা হইল প্রাকৃত। সন্ন্যাসী এবং গণিকাগণ অবশ্য কখনো কখনো সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করে। অশিক্ষিত ব্রাহ্মণগণের মুখে লৌকিক উপভাষা শোনা যায়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃতভাষী এবং প্রাকৃতভাষী পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে ঘনঘন সংলাপ বিদ্যমান এবং ইহা হইতে মনে হয় যে প্রকৃতপক্ষে যাহারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিত না তাহারাও সংস্কৃত বুঝিত। এই উক্তির সমর্থনে আরও

৬. মহাভাষ্যর অষ্টাধ্যায়ী ৬, ৩, ১০৯।

৭. রামায়ণ ৫, ৩০, ১৮।

৮. কামসূত্র ৪, ২০।

বলা যাইতে পারে যে সাধারণ লোকেরা দেবালয়ে বা রাজপ্রাসাদে মহাকাব্য পাঠ শুনিতে সমবেত হইত। আবৃত্তির সারমর্ম বুঝিতে না পারিলে তাহারা নিশ্চয়ই ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিত না।

গ্রন্থপঞ্জী

Bhandarkar, R. G. — *Wilson Philological Lectures* (*Lecture VII*)

Keith, A. B.; — *A History of Sanskrit Literature*

Macdonell, A. A. — *A History of Sanskrit Literature*

Pathak, K. B. — *The Age of Pāṇini and Sanskrit as a Spoken Language* (ABORI. VolXI)

Rapson, E. J. — JRAS, 1904

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহাকাব্যদ্বয়

ক. রামায়ণ

উপাখ্যান

ভারতীয় কিংবদন্তীতে রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকিই হইলেন আদিকবি। জনৈক নিষাদের তীরে একটি পুরুষ ক্রৌঞ্চ নিহত হইলে স্ত্রী ক্রৌঞ্চটি করুণ ভাবে বিলাপ করিতেছিল। তাহাতে বাল্মীকি গভীর ভাবে বিচলিত হন। বাল্মীকির অনুভূতিসমূহ ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে।১ এবং ব্রহ্মার নিকট হইতে যিনি সংবাদ আনিয়াছিলেন সেই স্বর্গের ঋষি নারদের আদেশে তিনি অমর রাম-মহাকাব্য রচনা করেন। ইহার বিষয়বস্তু হইল অযোধ্যার রাজা দশরথের কর্তব্যপরায়ণ এবং ধার্মিক পুত্র যুবরাজ রামের উপাখ্যান। বিমাতা কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে রাম চৌদ্দ বৎসরের জন্য নিজরাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। কৈকেয়ী নিজপুত্র ভরতের জন্য সিংহাসন হস্তগত করিয়াছিলেন। এইরূপে রাম এবং তাঁহার পতিপ্রাণা পত্নী সীতা তৃতীয় যুবরাজ লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করেন। সেখানে নির্বাসিত যুবরাজের অভিজ্ঞতা, লঙ্কার রাজা রাবণ কর্তৃক সীতাপহরণ, অন্যতম বানরপ্রধান হনমান কর্তৃক রামকে সাহায্যদান, রাবণ এবং তাহার দলের ধ্বংস সাধন, সতীত্ব প্রমাণের জন্য সীতার অগ্নিপরীক্ষা এবং এইরূপ আরও অনেক ঘটনা এই কাব্যে উজ্জ্বলরূপে বর্ণিত।

উদ্ভব ও উপাখ্যান

রামায়ণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিলেই আমরা জানিতে পারি যে এই মহাকাব্যের গল্পকথা পেশাদার চারণগণ আবৃত্তি করিত। মৌখিক

১. রামায়ণ ১, ২, ১৫।

পরম্পরায় বাল্মীকির নিকট হইতে যমজ ভ্রাতৃদ্বয় কুশ ও লব এই গল্পটি গ্রহণ করে। এবং তাহারা রামের রাজকীয় সভায় ইহা গীতসহযোগে পাঠ করে। উপরোক্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে ইক্ষাকুবংশের বীরগণের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী অযোধ্যার সূতদের একটি গল্পগাথা রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এই গাথাগুলি সংগ্রহ করিয়াই বাল্মীকি একটি পরিপূর্ণ মহাকাব্যের রূপদান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে মহাকাব্য এবং পুরাণের গল্পসমূহ একই প্রাচীন উপাদান হইতে সংগৃহীত, এবং বেদে সেগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ সংবাদ-মন্ত্রসমূহ উপাখ্যান এবং কিছু নাটকীয় উপাদানে সমৃদ্ধ গাথা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মন্ত্রগুলিই মহাকাব্য এবং নাটকসমূহের উৎস বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। আরও মনে করা হয় যে মহাকাব্যদ্বয়ের উৎপত্তি হইল 'গাথা নারাশাংসী' বলিয়া পরিচিত বীরগণের 'প্রশংসা গীতি' হইতে।

চরিত্র

রামায়ণ মূলতঃ একটি কাব্যিক সৃষ্টি। পরবর্তীযুগের চিন্তা এবং কাব্যকে ইহা প্রভাবিত করিয়াছিল। ফলে নূতন উপাদান মূল রচনার সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। বর্তমান আকারে এই কাব্যে সাতটি কাণ্ড এবং প্রায় ২৪,০০০ শ্লোক আছে। কিন্তু অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই মহাকাব্য তিনটি সংস্করণে (recension) সংরক্ষিত—পশ্চিম ভারতীয়, বাংলা এবং বোম্বাই। কৌতূহলের বিষয়, প্রত্যেকটি সংস্করণের সমগ্র শ্লোকরাজির প্রায় এক তৃতীয়াংশ অপর দুইটিতে পাওয়া যায় না। তিনটির মধ্যে বোম্বাই সংস্করণে রামায়ণের প্রাচীনতম আকারটি সংরক্ষিত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহাতে আমরা এমন কতকগুলি প্রাচীন শব্দ পাই যেগুলি বাংলা বা পশ্চিম ভারতীয় সংস্করণে পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ইয়াকোবির মতে রাম-মহাকাব্য প্রথমে কোশল দেশে রচিত হইয়াছিল। ইহার উপাদান ছিল চারণকবিগণ কর্তৃক গীত গাথাকাব্য। পরবর্তী-কালে নিশ্চয়ই আবৃত্তিগত প্রথা লইয়া সূতদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়

এবং এই মতভেদই তিনটি বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করে। কিন্তু একথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে এই প্রভেদ সত্ত্বেও মূল রচনা এবং প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি খুঁজিয়া বাহির করা যায়। ইয়াকোবি ঠিকই বলিয়াছেন: সংযুক্ত ক্ষুদ্র উপাসনালয় এবং মিনার সত্ত্বেও যেমন আমাদের অনেক প্রাচীন গীর্জায় প্রত্যেক নূতন প্রজন্ম মূল সৌধটি অবিকৃত রাখিয়া নূতন কিছু সংযোজন করিয়াছে, এবং কিছু পুরাতন সংশোধিত করিয়াছে, তেমনি চারণকবিদের বহু প্রজন্ম রামায়ণকে গঠন করিয়াছে। কিন্তু যে প্রাচীনতম উপাদানটিকে ঘিরিয়া এতখানি গড়িয়া উঠিয়াছে, গবেষকের সন্ধানী দৃষ্টিতে তাহা চিনিয়া লওয়া দুষ্কর নহে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না হইলেও মূল অবয়বটিতো বটেই।১

প্রক্ষিপ্ত অংশ

আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে সমগ্র রামায়ণ, বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যায়, একটি বিশেষ যুগের রচনা নহে। বলা হইয়া থাকে যে রামায়ণের সাতটি কাণ্ডের মধ্যে শেষটি এবং প্রথমটির কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত। প্রথমতঃ মূল রামায়ণে এমন অনেক অংশ আছে যাহাতে প্রথমকাণ্ডে বর্ণিত ঘটনাবলীর কোন উল্লেখ নাই, অথবা প্রথমকাণ্ডে যে ঘটনার কথা বলা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করে। দ্বিতীয়ত, প্রথমকাণ্ডের প্রথম এবং তৃতীয় সর্গে আমরা দুইটি সূচীপত্র পাই। ইহাদের মধ্যে প্রথম সূচীপত্রে প্রথম এবং সপ্তম কাণ্ডের কোন উল্লেখ নাই। তৃতীয়ত, প্রথমকাণ্ডে ব্যবহৃত রচনাশৈলী এবং ভাষা মূল পাঁচটি (২-৬) কাণ্ডের ভাষা এবং গঠনশৈলীর সহিত তুলনীয় নহে। চতুর্থত, প্রথম এবং সপ্তমকাণ্ডে ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রায়শই ব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু অপর পাঁচটি কাণ্ডে ধারাবাহিকতার অব্যাহত রূপই প্রমাণ করে যে ঐ দুইটি কাণ্ডের রচয়িতা কোন পরবর্তীযুগের কবি যাহার যোগ্যতা এবং প্রতিভা মূল রামায়ণের কবির তুলনায় স্বল্পতর ছিল। সর্বশেষে, প্রথম এবং সপ্তম কাণ্ডে নায়কের যে চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে অপর কাণ্ডসমূহে বর্ণিত চরিত্র হইতে তাহা পৃথক।

১. *Das Rāmāyaṇa* পৃঃ ৬০।

ঐ দুই কাণ্ডে রাম একজন পার্থিব বীর নহেন, সমগ্র জাতির পূজ্য একটি অপার্থিব চরিত্র। অপর কাণ্ডগুলিতে কিন্তু তিনি একজন পার্থিব বীর।

ভারতীয় জীবনধারা ও সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

রামায়ণ একটি অত্যধিক জনপ্রিয় মহাকাব্য। সমগ্র ভারতীয়গণের নিকট ইহা একটি ঐশ্বর্য বিশেষ। ইহা বলা নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হইবে না যে সহস্রবৎসর ধরিয়া একটি জাতির কাব্য এবং চিন্তাধারায় রামায়ণের প্রভাব অন্য যে কোন কাব্য হইতে অনেক বেশী। বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রত্যেকেই রামায়ণের চরিত্রগুলি এবং উপাখ্যানের সহিত পরিচিত। ভারতীয়দের দৃষ্টিতে রাম হইলেন একজন আদর্শ রাজা, সমগ্র কল্পনীয় গুণের আধার বিশেষ এবং সীতা রমণীর মহত্তম ধর্ম দাম্পত্যপ্রেম এবং বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি। প্রচলিত গল্প এবং প্রবাদসমূহ এই মহাকাব্যের সহিত ভারতীয়গণের পরিচয় অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত করে। জনতার সম্মুখে ধর্মীয় আলোচনার সময় বিভিন্ন ধর্মের প্রচারকগণ রামায়ণ হইতে উপাখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়া থাকেন। রামায়ণের ধাঁচে যিনি বুদ্ধচরিত রচনা করিয়াছিলেন সেই অশ্বঘোষ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তীকালের ভট্টি এবং ভবভূতির কাল পর্যন্ত তাঁহাদের এবং তাঁহাদের কাব্যিক সৃষ্টির উপর রামায়ণের প্রভাবের বিস্তার দেখিয়া আমরা বিস্ময় বোধ করি। এমনকি বিভিন্ন প্রদেশের লোকসাহিত্য এবং কথাসাহিত্যও রামায়ণের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত। ইহা বলা ভুল হইবে না যে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় জীবন এবং সাহিত্য মহাকাব্যের দ্বারা প্রভাবিত। রামরাজ্যের ভাবটির উৎপত্তি হইল রামায়ণ হইতে।

প্রাচীনত্ব

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বাল্মীকির মূল রচনা পরবর্তীযুগের চারণকবিদের বিভিন্ন উপাদান সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং সমগ্র রচনাটির একটি নির্দিষ্ট কাল নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কঠিন। ডঃ ভিনতারনিৎস্ বলেন যে অর্ধদৈবী জাতীয়

বীরের মধ্য দিয়া সাধারণ মানুষ হইতে রামের সর্বজনীন দেবতায় উত্তরণ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য যে কেবল রামোপাখ্যানই নহে বাল্মীকির রামায়ণই মহাভারতে পরিজ্ঞাত। বনপর্বে রামোপাখ্যানটি সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত। অপর পক্ষে রামায়ণের কবি বা কবিগণ কোথাও ভারতোপাখ্যানের উল্লেখ করেন নাই। এই তথ্যগুলি হইতে অধ্যাপক ইয়াকোবি প্রমুখ পণ্ডিতগণ আদিতে একটি রাম-মহাকাব্যের অস্তিত্ব অনুমান করেন।[২] ইহা অবশ্য এখনও একটি বিতর্কিত প্রশ্ন যে মহাভারতের মূল কাহিনী হইতেও তাহা প্রাচীনতর কি না। কারণ বনপর্বের যে অংশবিশেষে রামায়ণের উল্লেখ আছে, ভারত-মহাকাব্যের মূল কাহিনীতে তাহা অনুপস্থিত। ডঃ ভিনতারনিৎস্ মনে করেন যে "যদি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে মহাভারত বর্তমান আকার পরিগ্রহ করিয়া থাকে, রামায়ণ অন্ততপক্ষে এক বা দুই শতাব্দী পূর্বে ইহার পূর্ণরূপ লাভ করিয়াছিল।"

বৌদ্ধধর্মের সহিত সম্বন্ধ

জাতক সাহিত্য পাঠ করিলে, কতকগুলি জাতকের গল্প আমাদের রামায়ণের উপাখ্যান স্মরণ করাইয়া দেয়, যদিও তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিল খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। উদাহরণস্বরূপ দশরথজাতকে রামায়ণের কাহিনীটি ভিন্নরূপে বিবৃত। রাম এবং সীতা সেখানে ভ্রাতা-ভগ্নী। কিন্তু ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে জাতকমালায় রাক্ষস এবং প্রাণীজগতের বহু গল্পই আছে। কিন্তু রাবণ, হনুমান বা বা"রদের নামোল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে খৃষ্টীয় চতুর্থ বা তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে বৌদ্ধ ত্রিপিটক যখন রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, মহাক ব্যরূপে রামায়ণের আবির্ভাব তখনও ঘটে নাই, যদিও রামকাহিনী লইয়া গাথা প্রচলিত ছিল। রামায়ণে বৌদ্ধধর্মের কোন উল্লেখ নাই। একমাত্র যে অংশে বুদ্ধের উল্লেখ আছে

২. ইয়াকোবি, শ্লেগেল্, এম. উইলিয়মস্, শ্লাবি প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন যে রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন ; কারণ রামায়ণে সতীদাহের উল্লেখ নাই কিন্তু মহাভারতে আছে।

তাহাও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।৩ ডঃ ভেবার অবশ্য মনে করেন যে যুবরাজ রামের বৌদ্ধ কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করিয়া রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। তিনি মনে করেন যে রামায়ণের নায়ক মূলত একজন ঋষি এবং কেবলমাত্র একজন বীর যোদ্ধা নহেন এবং রামের মধ্যে বৌদ্ধদের মানসিক সমতার আদর্শকেই গৌরবান্বিত করা হইয়াছে। ডঃ ভিনতারনিৎস্ও রামের চারিত্রিক ধীরতাকে বৌদ্ধধর্মেরও প্রভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে ডঃ ভেবার তাঁহার চিন্তায় একটি তথ্য উপেক্ষা করিয়াছেন। তাহা হইল যে বাল্মীকির ন্যায় কবি আপন উত্তরাধিকার হইতে নিশ্চয়ই অনুপ্রেরণা লাভ করিতে পারিতেন। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত রামায়ণের উপর বৌদ্ধধর্মের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই।

গ্রীক প্রভাব

নিশ্চিত যে রামায়ণের উপর কোন গ্রীক প্রভাব নাই। মূল রামায়ণ গ্রীকগণের সহিত পরিচিতির কোন প্রমাণই বহন করে না। ডঃ ভেবার অবশ্য বলিযাছেন যে হেলেন এবং ট্রয়ের যুদ্ধের গ্রীক কাহিনীর ভিত্তিতে বামায়ণ রচিত। কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তু পাঠ করিলে দেখা যায় যে রামায়ণের মাত্র দুইটি অংশে 'যবন' কথাটি আছে এবং সে দুইটি অংশই প্রক্ষিপ্ত।

রূপকধর্মী ব্যাখ্যা

অধ্যাপক ল্যাসেনই প্রথম রামায়ণের একটি রূপক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে এই মহাকাব্যে আর্যদের প্রথম দক্ষিণ ভারত বিজয় অভিযানের কথাই বলা হইয়াছে। ডঃ ভেবারের মতে দক্ষিণ ভারতে এবং সিংহলে আর্যসভ্যতার বিস্তার বর্ণনাই ইহার উদ্দেশ্য।

৩. ভেবারের *Rāmāyaṇa* প্রসঙ্গে ল্যাসেন (IA, Vol. III)

পৌরাণিক ব্যাখ্যা

অধ্যাপক ইয়াকোবি ইহার একটি পৌরাণিক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে ঋগ্বেদে সীতা হলরেখা রূপে আবির্ভূতা এবং কৃষির দেবীরূপে পূজিতা। কতকগুলি গৃহ্যসূত্রে সীতা হইলেন কর্ষণক্ষেত্রের কন্যা এবং পর্জন্য বা ইন্দ্রের পত্নী। রামায়ণেও সীতাকে জনকের কর্ষণক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত বলা হইয়াছে। রামকে ইন্দ্রের সহিত এবং হনুমানকে দৈত্যদের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্রের অনুচর মরুতের সহিত অভিন্ন রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। আমরা কেবল এক্ষেত্রে একথাই বলিতে পারি যে প্রথম শ্রেণীর কাব্যশিল্পকে রূপক বা পুরাণ রূপে কল্পনা করিবার কোন যুক্তি নাই।

গ্রন্থপঞ্জী

Davids, R.	*Buddhist India*
Hopkins, E. W	*The Great Epics of India*
Jacobi, H	*Das Rāmāyaṇa*
Macdonell, A. A.	*A History of Sanskrit Literature*
Smith, V. A.	*Oxford History of India*
Weber, A.	*On the Rāmāyaṇa* (IA, Vol. III) *The History of Indian Literature*
Williams, W.	*Indian Wisdom*
Winternitz, M.	*A History of Indian Literature*, Vol I

খ. মহাভারত

সাধারণ রূপ ও উপাখ্যান

ডঃ ভিনতারনিৎস্ মহাভারতকে একটি সামগ্রিক সাহিত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রামায়ণের ন্যায় মহাভারত একটি পরিপূর্ণ কাব্য নহে। মহাভারতের মূল ঘটনা হইল কৌরব অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র এবং পাণ্ডব অর্থাৎ পাণ্ডুর পঞ্চপুত্রের মধ্যে অষ্টাদশ দিনব্যাপী মহাযুদ্ধ। কবি যুদ্ধারম্ভের পূর্বের সমস্ত ঘটনাই বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত নরপতিই এই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে জড়িত ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই দুই দলে যোগদান করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ফলে কৌরবগণ সদলে সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং পাণ্ডবদের দলনায়ক যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সার্বভৌম সম্রাট হইয়াছিলেন কিন্তু কালক্রমে নূতন বিষয়বস্তু, মানবজীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মনৈতিক কাহিনীসমূহ এবং অন্যান্য বীরগাথার অংশবিশেষ অথবা বিখ্যাত নৃপতিবর্গের উল্লেখকারী কিংবদন্তীসমূহ পূর্বোক্ত মূলকাহিনীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। এই সংযোজন সম্ভবতঃ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিতে থাকে—খৃষ্টীয় সম্বতের প্রথম দিকে যতদিন না মহাভারত ইহার বর্তমান আকার ধারণ করে। বর্তমান আকারে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা হইল শতসহস্র। এই জন্যই মহাভারকে কেবলমাত্র একটি বীরাত্মক কাব্য বলিয়াই নহে 'সমগ্র প্রাচীন চারণকাব্যের একটি ভাণ্ডার' হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। বর্তমান আকারে এই মহাকাব্য অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত।[১] হরিবংশ নামে ইহার একটি প্রক্ষিপ্ত অংশও আছে।

১. 'পর্ব' নামে অভিহিত এই অষ্টাদশ খণ্ড নিম্নরূপ: আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌসল্য, মহাপ্রস্থানিক, ও স্বর্গারোহণিক।

অষ্টাদশ পর্বে এই বিভাগ বিশুদ্ধ পরম্পরাগত কিনা তাহা নিশ্চিত রূপে জানা

গীতা

বিখ্যাত 'ভগবদ্গীতা' ভীষ্মপর্বের একটি অধ্যায়। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। গীতা শ্লোকে হিন্দুদর্শনের মতবাদগুলির সরলীকরণ মাত্র। সাংসারিক জীবন হইতে যাঁহারা বিদায় লইয়াছেন তাঁহাদের অপেক্ষা সামাজিক ব্যক্তিদের জন্যই এই গ্রন্থ রচিত। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে হিন্দুদর্শনের প্রকৃষ্টতম ফল এবং ইহা পৃথিবীব্যাপী সমগ্র দার্শনিকগণের নিকটই সমাদর লাভ করিয়াছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু হইল বিষণ্ণ অর্জুনকে শান্ত করিবার জন্য কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তিবাদের ভিত্তিতে উপস্থাপিত কৃষ্ণের উপদেশাবলী।

গীতার রচনাকাল

অল্‌বেরুনী কর্তৃক ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর হইতে অতীতের বহু শতাব্দী ধরিয়া গীতা বহুল পঠন এবং সমাদর লাভ করিয়াছে। ভিনতার-নিৎসের মতে গীতা ভাগবতদের ধর্মশাস্ত্র। ভাগবতেরা বৈষ্ণবদেরই একটি শাখা এবং খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই তাহারা গান্ধার অঞ্চলের গ্রীকগণের মধ্যে অনুষঙ্গ লাভ করিয়াছিল। তেলাঙ্, ভাণ্ডারকর প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে গীতা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তীকালের রচনা নহে। ইহার ভাষা, রীতি এবং ছন্দ প্রমাণ করে যে গীতা মহাভারতের প্রাচীনতম অংশগুলির একটি।

গীতার উপর খৃষ্টীয় প্রভাব

গীতার উপর খৃষ্টীয় প্রভাবের একটি অবাস্তব মতবাদ আছে। এই মতবাদ এফ. লোরিনসার কর্তৃক উত্থাপিত। মনে করা হয় যে গীতার রচয়িতা কেবলমাত্র নিউ টেস্টামেন্টের ব্যাখ্যা জানিতেন এবং একাধিকবার ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই নহে, উপরন্তু খৃষ্টীয় মতবাদসমূহও তাঁহার রচনায় স্থান পাইয়াছে। এই ধারণা অগ্রাহ্য করিবার কারণ এই যে খৃষ্টকালের পূর্বেও

যায় না, কারণ অল্‌বেরুনীর রচনাদি হইতে অনুমিত বিভাগ অপেক্ষা এখানে বিভাগের ধরন কিছুটা পৃথক।

ভারতীয় সাহিত্যে ভক্তিবাদের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং খৃষ্টের জন্মের অন্ততপক্ষে দুই শত বৎসরপূর্বে গীতা রচিত হইয়াছিল।

হরিবংশ

হরিবংশকে মহাভারতের সম্পূরক বা 'খিল' বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিতান্তই বাহ্যিক। একমাত্র সম্বন্ধ এই যে উভয়েরই বক্তা হইলেন বৈশম্পায়ন। ১৬,৩৭৪ শ্লোকে নিবদ্ধ হরিবংশ কোন একজন কবির রচনা বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে ইহা কতকগুলি গ্রন্থের বিশৃঙ্খল সমন্বয় মাত্র। ইহা তিনটি পর্বে বিভক্ত। যথা হরিবংশ, ইহাতে হরির বংশবৃত্তান্ত উল্লিখিত; সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণকাহিনী লইয়া রচিত বিষ্ণুপর্ব এবং পৌরাণিক উদ্ধৃতির একটি অসংবদ্ধ সংকলন ভবিষ্যপর্ব।

রচনাকাব

বিবিধ উপাদান সত্ত্বেও মহাভারতকে ভারতীয়গণ একটি সঙ্গতিপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা বলিয়া মনে করেন। রচয়িতা হইলেন ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বা ব্যাস। কাহিনীটি হইল যে ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রচনাটি তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়নকে জ্ঞাপন করেন এবং বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ কালে সম্পূর্ণ কাব্যটি আবৃত্তি করেন। সেই ঘটনাকালে ইহা ঋষি লোমহর্ষণের পুত্র সূত উগ্রশ্রবা কর্তৃক শ্রুত হয়। নিমিষারণ্যে দ্বাদশবর্ষান্তিক যজ্ঞকালে মুনিগণের সভায় সূত উগ্রশ্রবা যে কাহিণী বর্ণনা করেন তাহাই হইল বর্তমান মহাভারত। সুতরাং উগ্রশ্রবা সংক্ষিপ্ত কাহিনীটির বর্ণনাকার। কিন্তু মূল কাব্যে বৈশম্পায়নই হইলেন বক্তা। বৈশম্পায়ন বর্ণিত আখ্যানের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির মুখ মারফৎ বিভিন্ন কাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে কাহিনীর মধ্যে উপকাহিনীর এই সন্নিবেশ ভারতীয় সাহিত্যে একটি অতি সাধারণ পরিকল্পনা। উপরোক্ত তথ্যগুলির সযত্ন অনুধাবন একটি ক্ষুদ্র কাব্য হইতে বর্তমান পরিসরে মহাভারতের ক্রমবিকাশের ইঙ্গিতই বহন করে এবং মহাভারত যে কোন বিশেষ কবির রচনা বা কোন একজন বিশেষ সংকলকের কার্য নহে সেই কথারই সত্যতা প্রমাণিত করে। ডঃ

ভিনতারনিৎস্ মনে করেন যে 'কাব্যগুণহীন ব্রহ্মবিদ্ এবং টীকাকার ও অপটু লিপিকরগণ বিভিন্ন শতাব্দীর অন্তর্গত পরস্পরবিরোধী ভিন্নধর্মী অংশগুলিকে একত্রীভূত করিতে সফল হইয়াছেন।' মহাভারত যে ভারতীয় জনগণের আত্মার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে আমাদের সাহায্য করিয়াছে তাহার মূলে শুধু তাহার সামগ্রিক কাব্যধর্মিতাই নাই, আছে তাহার সাহিত্যধর্মিতা।

মহাকাব্যের তিন স্তর

এতদিন পরে মূল মহাভারত হইতে ইহার প্রক্ষিপ্তাংশ খুঁজিয়া বাহির করা খুবই কঠিন। যাহা হউক, মহাভারতের প্রথম পর্বে একটি তথ্য আছে যে মহাকাব্য একসময়ে ২৪,০০০ শ্লোকে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু অপর একটি প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই যে ইহার ৮,৮০০ শ্লোক ছিল। এই তথ্যগুলি একথাই প্রমাণ করিতে সাহায্য করে যে বর্তমান আকার গ্রহণের পূর্বে মহাকাব্য ক্রমসম্প্রসারণের তিনটি প্রধান স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে।

কাল

মহাভারতের কাল এক কথায় বলা অসম্ভব। মহাভারতের কাল নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের মহাকাব্যের প্রত্যেকটি অংশের কাল নির্ণয় করিতে হইবে। বৈদিক সাহিত্যে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণে অবশ্য কুরুক্ষেত্রকে একটি তীর্থ হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। দেবতা ও মানুষ সেখানে যাজ্ঞিক আনন্দোৎসব পালন করিতেন। জনমেজয় এবং ভরতের নামও আমরা ব্রাহ্মণগুলিতে পাই। তেমনি অথর্ববেদে কুরু জনপদের রাজা হিসাবে পরীক্ষিতের উল্লেখ আছে। যজুর্বেদে কুরু ও পাঞ্চালদিগের নামের উল্লেখ প্রায়ই পাই। কঠসংহিতায় বিচিত্রবীর্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা আছে, যে যুদ্ধ কৌরবদের পক্ষে সর্বনাশা ছিল। কিন্তু পাণ্ডবদের নাম সেখানে নাই। অশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে শিক্ষক এবং গ্রন্থের একটি তালিকায় ভারত এবং মহাভারতের নাম আছে। পাণিনি যুধিষ্ঠির, ভীম এবং বিদুর শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয় এবং মহাভারত

সমাসের স্বরসঙ্গতি নির্ণয় করিয়াছেন। 'পতঞ্জলিই অবশ্য প্রথম কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ত্রিপিটকে যদিও মহাভারতের উল্লেখ নাই, জাতকমালার মধ্যে কিন্তু ইহার সামান্য পরিচয় আছে।

সাহিত্যিক এবং লেখমালার প্রমাণ

অধিকন্তু সাহিত্যিক এবং লেখমালার সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে খৃষ্টীয় ৫০০ অব্দেই মহাভারত কেবলমাত্র একটি মহাকাব্যই নহে, একটি পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সামগ্রিকভাবে বর্তমান মহাভারত হইতে উহা বস্তুতই পৃথক ছিল। কুমারিলভট্ট মহাভারত হইতে অংশবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে একটি স্মৃতিগ্রন্থরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। সুবন্ধু এবং বাণ উভয়েই মহাভারতকে একটি মহান কথাশিল্প হিসাবে দেখিয়াছেন[১] এবং বাণ মহাভারতের আবৃত্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন।[২] ইহা অবশ্যই সর্বজনগ্রাহ্য যে যদিও বৈদিক সাহিত্যের যুগে মহাকাব্য হিসাবে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল না, তথাপি মহাভারতের অন্তর্গত কাহিনী, কিংবদন্তী এবং কাব্যসমূহের কাল বৈদিকযুগ। সমসাময়িক 'ধর্মীয় কাব্য' হইতেও মহাভারত মুনিঋষিদের বহু নীতিকাহিনী এবং উপাখ্যান গ্রহণ করিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মহাকাব্যরূপে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল না। মহাকাব্যরূপে মহাভারতের বর্তমান সংকলনের রূপান্তর ঘটিয়াছে খুব সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহাভারত ইহার বর্তমান আকার, উপাদান এবং শৈলী লাভ করিয়াছে—যদিও পরবর্তী কয়েক শতকেও ইহার পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন ঘটিয়াছে।

দুই মহাকাব্যের কোনটি প্রাচীনতর ?

বিশুদ্ধ ভারতীয় মতে মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণই প্রাচীনতর রচনা।

১. বাসবদত্তা পৃঃ ৩৭ ও হর্ষচরিত পৃঃ ২।
২. কাদম্বরী পৃঃ ১০৪।

ভারতীয়গণ মনে করেন বিষ্ণুর দুই অবতার রাম ও কৃষ্ণের মধ্যে প্রথম জনই পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ অবশ্য এই বিশ্বাসে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন না। কারণ তাঁহারা মনে করেন যে রামায়ণের প্রাচীনতম মূল অংশের নায়ক অবতাররূপে নহে, সাধারণ বীর রূপেই আবির্ভূত।[১] অধ্যাপক ইয়াকোবিও মনে করেন যে দুইটি মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণই প্রাচীনতর এবং তাঁহার এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হইল একটি অনুমান যে রামায়ণের প্রভাবই মহাভারতকে একটি কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছে।[২]

নিম্নলিখিত তথ্যগুলিও প্রমাণ করে যে মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণই প্রাচীনতর। মহাভারতের বনপর্বে রামোপাখ্যানের উল্লেখ আছে। কিন্তু রামায়ণের মধ্যে কোথায়ও মহাভারতের কোন উপাখ্যানের উল্লেখ নাই। অধিকন্তু মহাভারতে সহমরণের উল্লেখ আছে। মাদ্রীর সতীদাহই তাহার প্রমাণ। কিন্তু রামায়ণে ইহার সমধর্মী প্রমাণের অভাব। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। বৈদিকযুগে এধরনের প্রথা এদেশে প্রবর্তিত হয় নাই। অধিকন্তু মহাভারতে পাটলিপুত্রকে একটি মহানগর রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। মেগাস্থিনিসের মতে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কালাশোক এই নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইল যে এই গুরুত্বপূর্ণ নগরীর উল্লেখ রামায়ণে নাই, যদিও অনেক অল্পখ্যাত নগর উল্লিখিত হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার পাটলিপুত্রের নিকটবর্তী। আরও, রামায়ণের যুগে আর্যগণ যতখানি এলাকা দখল করিয়াছেন তাহার পরিসর মহাভারতের যুগের আর্যাধিকৃত এলাকা হইতে সঙ্কীর্ণতর। কিন্তু ভিনতারনিৎস্ এই মতের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ইহার সমালোচনা করিতে যাইয়া তিনি

১. মূল কাণ্ডগুলিতে কয়েকটি পংক্তি আছে, যেমন ৪র্থ কাণ্ডে, যেখানে সীতা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন, সেখানে রামের বর্ণনা দৈব পুরুষ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সমালোচকেরা কোনরূপ ইতঃস্তত না করিয়াই এরূপ পংক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলেন।

২. হপকিনসের মতে শিল্পকর্ম রূপে রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তী (Cambridge History, I, p. 251)।

বলিয়াছেন যে মহাভারত ইহার বর্তমান আকারেও প্রাচীন কাব্যের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু বাল্মীকির কাব্যে এমন বিশেষত্ব আছে যাহাতে তাঁহাকে প্রায় সভাকাব্যের যুগের সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই ভিনতারনিৎস্ মনে করেন যে রামায়ণ হইল একটি অলংকৃত কাব্য মাত্র এবং ইহা এমনই একটি নিদর্শন পরবর্তীকালে যাহা ভারতীয় কবিকুলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। অলংকৃত কাব্য বলিতে ভিনতারনিৎস্ সেই ধরনের কাব্যিক রচনাই বুঝাইয়াছেন যেখানে বিষয়বস্তু অপেক্ষা রচনাশৈলীর উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয় এবং যেখানে অলংকারের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ দেখা যায়। রামায়ণই প্রথম রচনা যেখানে অলংকৃত কাব্যের উপরোক্ত বিশেষত্বগুলি চোখে পড়ে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু মহাভারতে বিরল এবং সেই হেতুই মহাভারত প্রাচীনতর রচনা বলিয়া মনে হয়। পুনরায় বলা হইয়াছে যে একটি চরিত্রকে পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে মহাভারতে 'ভীষ্ম বলিলেন', 'সঞ্জয় বলিলেন' প্রভৃতি যে সকল ভাষা ব্যবহৃত তাহা প্রাচীন চারণ কাব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।[১] কিন্তু রামায়ণে উদ্ধৃতিসমূহ শ্লোকে নিবদ্ধ এবং সেই হেতুই ইহার প্রকাশশৈলী পরিশীলিত। অধ্যাপক ইয়াকোবির মতবাদের বিরুদ্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে দুইটি মহাকাব্য পাঠ করিলেই পাঠক নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবেন যে মহাভারত একটি যুদ্ধ-বিবাদের যুগকে বর্ণিত করিয়াছে। পক্ষান্তরে রামায়ণ একটি সভ্যতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

Bhandarkar, R. G. : *On the Mahābhārata* (IA, Vol. I)

Goldstucker, T. : *The Mahābhārata*

Hopkins, E. W. : *The Great Epics of India*

Macdonell, A. A. : *A History of Sanskrit Literature*

১. মহাভারতে গদ্য ও কবিতার যে মিশ্রণ আমরা দেখি তাহাই উহার প্রাচীনতা প্রমাণ করে। অধ্যাপক ওলডেনবার্গের এই মত ডঃ ভিনতারনিৎস্ গ্রহণ করেন না।

Telang, K. T.	SBE. Vol. VIII
Vaidya, C. V.	*Mahābhārata, a critical study*
Weber, A.	*The History of Indian Literature*
Williams, M.	*Indian Wisdom*
Winternitz, M.	*A History of Indian Literature*, Vol. I

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুরাণ

ভূ'

ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম যে সময় একটি প্রচণ্ড প্রতিশক্তি রূপে বিকাশলাভ করিতেছিল সে যুগেই পৌরাণিক সাহিত্যের উদ্ভব লক্ষণীয়। হিন্দু সংস্কৃতির সনাতন নিদর্শন সমূহের সংরক্ষণের জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের মহান অনুরাগীগণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে যুগের বিশিষ্টতম ব্যক্তি ও সংকলক ব্যাস যুগের চাহিদা মিটাইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে বৌদ্ধধর্ম এবং পৌরাণিক সাহিত্যের পটভূমিতে আছে সমগ্র বৈদিক সংস্কৃতি।

এক সময় ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে আঠারটি পুরাণের কোনটিই খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচনা নহে। কিন্তু নেপালে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে লিখিত স্কন্দপুরাণের পাণ্ডুলিপির আবিষ্কারে সে ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। উপরন্তু হর্ষচরিতে বাণভট্ট বলিয়াছেন যে তিনি একদা 'বায়ুপুরাণ' পাঠসভায় উপস্থিত ছিলেন। কুমারিল (খৃঃ ৭৫০) পুরাণসমূহকে ব্যবহারের উৎস বলিয়া মনে করিয়াছেন। শংকর (খৃঃ নবম শতাব্দী) এবং রামানুজ (খৃঃ একাদশ শতাব্দী) পুরাণসমূহকে বৈদিক সাহিত্যাশ্রয়ী বলিয়া ধর্মগ্রন্থ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রখ্যাত পর্যটক অল্‌বেরুনীও (খৃঃ ১০৩০) অষ্টাদশ পুরাণের একটি তালিকা দিয়াছেন।

পুরাণ কথাটির অর্থ হইল পুরাতন কাহিনী। অথর্ববেদে (১১, ৭, ২৪), ব্রাহ্মণে (শতপথ এবং গোপথ), উপনিষদে (বৃহদারণ্যক ২, ৪, ১০) এবং বৌদ্ধসাহিত্যে শব্দটি ইতিহাস প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে এই সকল স্থলে পুরাণ কথাটির উল্লেখে আমরা যে পৌরাণিক রচনাবলীর কথা জানি তাহা বুঝায় না। কিন্তু গৌতম এবং আপস্তম্বের ধর্মসূত্রে [ইহাদের রচনাকাল যতদূর মনে হয় খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দী] যে সকল উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় যে সেই প্রাচীন যুগেও পুরাণসমূহের সমধর্মী রচনাবলীর অস্তিত্ব ছিল। মহাভারত এবং পৌরাণিক সাহিত্যের নিকট সম্পর্কও শেষোক্তটির প্রাচীনত্বের পক্ষে একটি যুক্তি। মহাভারতও নিজেকে পুরাণ রূপেই উল্লেখ করিয়াছে। এবং পুরাণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি মহাভারতে বিদ্যমান। ইহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব নহে যে পৌরাণিক সাহিত্যের কিছু অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ বর্তমান সম্পাদিত মহাভারত অপেক্ষাও প্রাচীনতর। ললিতবিস্তর কেবল আপনাকে পুরাণ বলিয়াই উল্লেখ করে নাই, পৌরাণিক সাহিত্যের সহিত তাহার সাদৃশ্য প্রচুর। হরিবংশে বায়ুপুরাণের আক্ষরিক উদ্ধৃতি রহিয়াছে। সমস্ত পুরাণ-গুলিতে উল্লিখিত বংশ বৃত্তান্ত পাঠে দেখা যায় যে অন্ধ্রভৃত্য এবং গুপ্তবংশের রাজন্যবর্গের তালিকাতেই তাহা শেষ হইয়াছে এবং হর্ষ প্রভৃতি পরবর্তীযুগের নরপতিদের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে গুপ্তবংশের সম্রাটগণের রাজত্বকালেই পুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল। অপরপক্ষে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত বৌদ্ধধর্মের মহাযানী গ্রন্থসমূহের সহিত পৌরাণিক সাহিত্যের লক্ষণীয় সাদৃশ্যে মনে হয় যে পুরাণগুলি খৃষ্টকালের প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' এবং 'মহাবস্তু' গ্রন্থেও পুরাণের বৈশিষ্ট্য সমূহের উল্লেখ আছে। ডঃ ভিনতারনিৎস্ অবশ্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে প্রাচীনতর পুরাণগুলি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু নির্দেশ করা যাইতে পারে যে অনেকগুলি পুরাণে উল্লিখিত শিব এবং বিষ্ণুর উপাসনা প্রাক্‌বৌদ্ধযুগে না হইলেও খৃষ্টপূর্ব যুগেই প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক সাহিত্য কোন অর্থেই 'আধুনিক' নহে।

একটি মূল পুরাণের অস্তিত্ব ছিল কি ?

কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু এবং অন্যান্য কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পুরাণে একটি মূল 'পুরাণ-সংহিতা'র কথা বলা হইয়াছে। ব্যাস ইহা সংকলন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্য সূত লোমহর্ষণকে প্রদান করিয়াছিলেন। একটি মূল পুরাণের অস্তিত্বের মতবাদ এ. এম. টি. জ্যাকসন্‌, এ. ব্লান এবং এফ. ই. পারজিটারের ন্যায় পণ্ডিতগণ সমর্থন করিয়াছেন। ইহা সেই প্রাচীনতম বৈদিক যুগকেই সূচিত করে যখন পর্যন্ত বৈদিক ভারতীয়গণ ছিলেন অবিভক্ত। ফলস্বরূপ পৌরাণিক উত্তরাধিকার ছিল অভিন্ন। কালাতিক্রমে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। বৈদিক ভারতীয়গণ আর অবিভক্ত থাকিতে পারিলেন না। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে তাঁহাদের বিভাগ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে চলাচলের ফলে শাস্ত্রীয় এবং সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আচারগত ঐক্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় নাই। এই জন্যই কালক্রমে সেই পৌরাণিক উত্তরাধিকারকে ঢালিয়া সাজাইবার প্রয়োজনে শেষপর্যন্ত বিভিন্ন পুরাণ রচিত হইয়াছিল। যুগের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানধারণা, জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা এমনকি পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসিয়াছিল এবং ইহাতেই ব্যাখ্যাত হয় পৌরাণিক সংহিতা যুগে যুগে কেন পুনর্রচিত হইয়াছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে পুরাণগুলির কোন স্থায়ী বৈশিষ্ট্য নাই।

বৈশিষ্ট্য

তথ্যের একান্ত অভাবের ফলে প্রাচীন পৌরাণিক রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা একেবারেই অন্ধকারে আছি। তাহাদের কোনটিই অবশ্য মূল আকারে আমাদের হাতে আসে নাই বলিয়া মনে করা হয়। বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধানকার অমরসিংহ পুরাণ কথাটির একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন যাহা অধুনা বর্তমান কতকগুলি পৌরাণিক গ্রন্থে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। অমরসিংহের মতে প্রত্যেকটি পুরাণেরই পাঁচটি আলোচ্য বিষয়ঃ (১) সর্গ—সৃষ্টি; (২) প্রতিসর্গ—পর্যাবৃত্ত, প্রলয় এবং জগতের পুনরারম্ভ; (৩) বংশ—দেবতা এবং ঋষিগণের

বংশবৃত্তান্ত ; (৪) মন্বন্তর—কালের মনুযুগসমূহ, অর্থাৎ, মহান যুগসমূহ যাহাদের প্রত্যেকটিতেই শাসকরূপে একজন মনু (মানব জাতির আদিতম পুরুষ) বর্তমান ; (৫) বংশানুচরিত—সূর্য এবং চন্দ্র হইতে যে সকল বংশের উৎপত্তি তাহাদের ইতিহাস। কিন্তু এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যই সমস্ত পুরাণে উপস্থিত নহে, এবং যদিও কতকগুলি পুরাণে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আংশিক ভাবে উপস্থিত, তথাপি তাহাদের আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ, এমন অনেক অধ্যায় আছে যাহাদের বিষয়বস্তু হইল চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের কর্তব্যাবলী, ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচারানুষ্ঠান, কোন বিশেষ উৎসব বা পর্ব, কখনো কখনো বা সাংখ্য এবং যোগদর্শন। কিন্তু সকল পুরাণের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল তাহাদের সাম্প্রদায়িক চরিত্র। কারণ সমস্ত পুরাণই কোন না কোন বিশেষ দেবতার পূজাপদ্ধতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, এবং তাঁহাকেই গ্রন্থ বিশেষে প্রধানতম দেবতারূপে দেখানো হইয়াছে। যেমন একটি পুরাণ বিষ্ণুর উদ্দেশে বচিত, আবাব একটি হয়ত শিবেব উদ্দেশে রচিত।

মূল।

ইতিহাস এব' ধর্মেব দিক হইতে বিচার করিলে পুরাণগুলির গুরুত্ব অসাধারণ। প্রাচীন ভারতেব রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে পুরাণ-সমূহের বংশাবলীবৃত্তান্ত বহুলভাবে সাহায্য করে। তথাপি পণ্ডিতগণের কাজ হইল পুরাণসমূহে ক্ষায়িত ভারতীয় ইতিহাসের উৎস সংগ্রহ করা। ডঃ স্মিথ বলেন যে মৌর্যবংশ সম্পর্কে বিষ্ণুপুরাণ অমূল্য তথ্য প্রদান করে। অন্ধ্রবংশ সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণই হইল সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং বায়ুপুরাণ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের একটি বিশদ বিবরণ দান করে। পুরাণগুলির উদ্দেশ্য ছিল বেদেব অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং উচ্চ দার্শনিক শিক্ষাসমূহকে ঐতিহাসিক ঘটনা এবং কাহিনীর মাধ্যমে জনপ্রিয় করিয়া তোলা। সেইহেতু হিন্দুধর্মকে আমরা পুরাণের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত আকারে পাই। সুতরাং ধর্মতত্ত্বের ছাত্র ইহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। পুরাণগুলির সাহিত্যিক মূল্যও কম নহে। তাহাদের মধ্যে

এমন অনেক অংশবিশেষ আছে যাহা রচনাকারগণের উচ্চ শিল্প প্রতিভার পরিচয় দেয়।

নাম ও সংখ্যা

বর্তমানে আমরা যেরূপে পাই, তাহাতে পুরাণ বা মহাপুরাণগুলির সংখ্যা হইল আঠার এবং কতকগুলি উপপুরাণও আছে যাহাদের সংখ্যাও হইল আঠার। আঠারটি মহাপুরাণ হইল ঃ

(১) ব্রহ্ম, (২) পদ্ম, (৩) বিষ্ণু, (৪) শিব, (৫) ভাগবত, (৬) নারদীয়, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) অগ্নি, (৯) ভবিষ্য বা ভবিষ্যৎ, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত, (১১) লিঙ্গ, (১১) বরাহ, (১৩) স্কন্দ, (১৪) বামন, (১৫) কূর্ম, (১৬) মৎস্য, (১৭) গরুড় এবং (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

পুরাণের শ্রেণীবিভাগ

উপরোক্ত অষ্টাদশ পুরাণ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি পার্থিবগুণের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ। সাধারণভাবে যে পুরাণগুলি বিষ্ণুকে মহিমান্বিত করিয়াছে সেগুলিকে বলা হয় সাত্ত্বিক, যেগুলি ব্রহ্মাকে মহিমান্বিত করিয়াছে সেগুলিকে বলা হয় রাজস এবং যেগুলি শিবের মহিমাকীর্তন করিয়াছে সেগুলি তামস বলিয়া খ্যাত। এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ পুরাণগুলি হইল ঃ

(ক) সাত্ত্বিক পুরাণ ঃ বিষ্ণু, ভাগবত, নারদীয়, গরুড়, পদ্ম এবং বরাহ।

(খ) রাজস পুরাণ ঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য এবং বামন।

(গ) তামস পুরাণ ঃ শিব, লিঙ্গ, স্কন্দ, অগ্নি, মৎস্য এবং কূর্ম।

ভাগবত পুরাণ

পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে ভাগবত পুরাণই প্রশ্নাতীতভাবে সর্বাপেক্ষা খ্যাত। ভারতীয় ভাষায় অসংখ্য অনুবাদ ব্যতীতও, ইহার অসংখ্য পাণ্ডুলিপি এবং বহু টীকাই রচনাটির জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির সোচ্চার সাক্ষ্য বহন করে। বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগীগণ ইহাকে 'পঞ্চম বেদ' বলিয়া মনে

করেন। ইহার শিল্পগত উৎকর্ষ বিপুলভাবে প্রশংসিত এবং ভারতীয়গণ মনে করেন যে এই পুরাণে দক্ষতাই একজনের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

এই পুরাণটি একটি সুসম্বদ্ধ রচনার সাক্ষ্য বহন করে। ইহা ১৮,০০০ শ্লোকে নিবদ্ধ এবং দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। দশম স্কন্ধের বিষয়বস্তু হইল গোপিনীদের সঙ্গে অনুপম প্রেমদৃশ্য সহ ভগবান কৃষ্ণের বিভিন্ন কীর্তিকলাপের বিবরণ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাধা নামটি, যাহা বিশেষ করিয়া বাংলার বৈষ্ণবগণের নিকট এতখানি জনপ্রিয়, ভাগবত পুরাণে সেই নামটি পাওয়া যায় না।

পারজিটারের মতে পুরাণটি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর কোন এক সময়ে রচিত হইয়াছিল।

দেবীমাহাত্ম্য

সাধারণ্যে 'চণ্ডী' বা 'সপ্তশতী' বলিয়া খ্যাত দেবীমাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অধ্যায়। ডঃ ভিনতারনিৎসের মতে ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পরে নহে। ত্রয়োদশ অধ্যায় এবং সপ্তদশ মন্ত্রে রচিত এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হইল আদ্যাশক্তির গৌরবগান, যিনি জগৎকে কলুষতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য যুগে যুগে সমস্ত চরাচর প্রাণীর মধ্যে আবির্ভূত হন এবং অতীতে যিনি মধুকৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ ও অন্যান্য দৈত্যদিগকে নিহত করিয়াছিলেন। হিন্দুদের বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই গ্রন্থটি পাঠ করা হয়।

উপপুরাণসমূহের নাম এবং সংখ্যা

বিভিন্ন মুনিগণ যে অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলি হইল: (১) সনৎকুমার, (২) নরসিংহ, (৩) বায়ু, (৪) শিবধর্ম, (৫) আশ্চর্য, (৬) নারদ, (৭) নন্দিকেশ্বরদ্বয়, (৮) উশনস্, (৯) কপিল, (১০) বরুণ, (১১) শাম্ব, (১২) কালিকা, (১৩) মহেশ্বর, (১৪) কল্কি, (১৫) দেবী, (১৬) পরাশর, (১৭) মরীচি, (১৮) ভাস্কর বা সূর্য।[১]

[১] রঘুনন্দন প্রদত্ত উপরোক্ত উপপুরাণসমূহের তালিকা শব্দকল্পদ্রুম হইতে গৃহীত। হেমাদ্রি একটি ভিন্ন তালিকা দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

Bhandarkar, R. G. *A Peep into the Early History of India* (JRAS. Vol. XX, 1900)

Pargiter, F. E. : ERE., Vol. X, 1918

Rapson, E. J. *Cambridge History*, Vol. 1

Wilson, H. H. : *Essays on Sanskrit Literature*

Winternitz, M. : *A History of Indian Literature*, Vol. 1

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তন্ত্র

অর্থ, বিষয়বস্তু এবং শ্রেণীবিভাগ

'আগম', 'তন্ত্র' এবং 'সংহিতা'র অন্তর্গত রচনাবলী বুঝাইতে তন্ত্র কথাটি পারিভাষিক সংজ্ঞা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তন্ত্র বলিতে সেই সব ধর্মতত্ত্বসংক্রান্ত গ্রন্থ বুঝায় যাহাদের আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের আচরণগত নিয়মাবলী, পূজাপদ্ধতি এবং তাহাদের অধিবিদ্যা ও অতীন্দ্রিয়বাদমূলক দৃষ্টিভঙ্গী। একটি সম্পূর্ণ তন্ত্র চারটি খণ্ডে বিভক্ত, আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল (১) জ্ঞান, (২) যোগ, (৩) ক্রিয়া এবং (৪) চর্যা। যদিও আগম, তন্ত্র এবং সংহিতার মধ্যে সীমানা নির্দেশক কোন রেখা অঙ্কন করা সম্ভবপর নহে, তথাপি সাধারণত আগম[১] বলিতে বুঝায় শৈবদের ধর্মগ্রন্থ, তন্ত্র শাক্তদেব ধর্মীয় গ্রন্থ এবং সংহিতা বলিতে বৈষ্ণবদের ধর্মীয় সাহিত্য বুঝান হইয়া থাকে। শাক্ততন্ত্রগুলি প্রধানত অদ্বৈতবাদী, পক্ষান্তরে বৈষ্ণবতন্ত্রসমূহ সাধারণভাবে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থক। শৈবতন্ত্রগুলি অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তিনটি শাখায় বিভক্ত। বর্ণিত আছে যে শিবের পরামর্শানুসারে ঋষি দুর্বাসা শৈবতন্ত্রগুলি তিনটি শাখায় বিভক্ত করেন এবং তাঁহার তিন মানসপুত্র ত্র্যম্বক, অমর্দক এবং শ্রীনাথকে যে আগমগুলি শিখাইয়াছিলেন, সেই সকল আগমের প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে ত্র্যম্বকই দ্বৈতবাদ প্রচার করেন। পরবর্তীকালে কঠোর নিয়মাবলী হেতু বৈদিক আচারানুসারে যজ্ঞের অনুষ্ঠান যখন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল, তখন

---

১. আগম ও নিগমের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। প্রথমোক্তটিতে দেবী পার্বতী শিষ্যার ন্যায় প্রশ্ন করেন আর শিব গুরুর ন্যায় তাহার উত্তর দেন ; শেষোক্তটির ক্ষেত্রে ঘটে ইহার বিপরীত।

তন্ত্রসমূহই বেদের স্থানাপন্ন হইয়া উঠিল। তন্ত্রসমূহ সহজতর এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প জটিল পদ্ধতির ব্যবস্থা নির্দেশ করে যাহা কেবল উচ্চ-শ্রেণীর নিকটই নহে, শূদ্র এবং নারীজাতি—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে যাহাদের কোন অধিকার ছিল না—তাহাদের পক্ষেও যথাযোগ্য হইল। সুতরাং এই ধারণা যুক্তিসঙ্গত নহে যে তান্ত্রিক সাহিত্য বৈদিক সাহিত্যের বিপরীতধর্মী। কথাটি আরও পরিষ্কার হয় যখন দেখি গোঁড়া বৈদিক পণ্ডিতগণ তন্ত্র বিষয়ে মূল রচনা এবং টীকা সম্পাদিত করিয়াছেন।

বৈশিষ্ট্য

বেদের প্রমাণ স্বীকার বা খণ্ডনের বিচারে তন্ত্রগুলিকে বৈদিক এবং অবৈদিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব তন্ত্রগুলিকে বলা হয় বৈদিক। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ এবং জৈন তন্ত্রসমূহকে ধরা হয় অবৈদিক। কতকগুলি তন্ত্র বেদের নিন্দায় সোচ্চার। বিষয়বস্তুর বিচারে তন্ত্রগুলির সহিত পুরাণের সাদৃশ্য খুঁজিয়া বাহির করা যায়।

প্রাচীনত্ব

তন্ত্রসমূহের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিগুলির কাল খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে। তৎপূর্বে না হইলেও খৃষ্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে তান্ত্রিক সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল। মহাভারতে আমরা তন্ত্রের কোন উল্লেখ পাই না। চৈনিক পরিব্রাজকগণও ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত যে খৃষ্টীয় সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে তান্ত্রিক মতবাদ বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবেশ করে। দুর্গাপূজার অস্তিত্ব বৈদিক যুগেও খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

স্থান

আগম সাহিত্যের জন্মস্থান মনে হয় কাশ্মীর এবং তান্ত্রিক সাহিত্যের জন্ম বাংলা দেশে। সুবিদিত যে সংহিতা সাহিত্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে—বাংলাদেশে, দক্ষিণ ভারতে এবং শ্যামদেশে উৎপত্তি লাভ করে।

আগম রচনাবলী

আগম সাহিত্যের গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল এইগুলি ঃ

মালিনীবিজয়, স্বচ্ছন্দ, বিজ্ঞানভৈরব, উচ্ছুষ্মভৈরব, আনন্দভৈরব, মৃগেন্দ্র, মতঙ্গ, নেত্র, নৈশ্বাস, স্বায়ম্ভুব এবং রুদ্রযামল। .

প্রত্যভিজ্ঞা রচনাবলী

আগম সাহিত্যের সহিত নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে প্রত্যভিজ্ঞা সাহিত্যের, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে যাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। প্রত্যভিজ্ঞা শাখা অদ্বৈতবাদী শৈবতন্ত্রসমূহের ভিত্তিতে গঠিত। এই গোষ্ঠীর উপদেষ্টাগণের একটি বিবরণ সোমানন্দনাথ রচিত 'শিবদৃষ্টি'র শেষ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। সোমানন্দনাথ হইলেন অভিনবগুপ্তের প্রপিতামহোপাধ্যায় এবং অদ্বৈত শৈব শাখার প্রতিষ্ঠাতা ত্র্যম্বকের ঊনবিংশতম বংশধর। সোমানন্দনাথ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক (খৃঃ ৮৫০-৯০০)। তাঁহার পুত্র এবং শিষ্য উৎপল (খৃঃ ৯০০ -৯৫০) 'প্রত্যভিজ্ঞাকারিকা' রচনা করিয়াছিলেন। এই গোষ্ঠীর কনিষ্ঠতম লেখক হইলেন অভিনবগুপ্ত (খৃঃ ৯৯৩-১০১৫)। তাঁহার বৃহত্তম গ্রন্থ 'তন্ত্রালোক'। অভিনবগুপ্ত প্রচুর লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ হইল মালিনীবিজয়োত্তরবার্তিকা, প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্ষিণী, তন্ত্রালোক, তন্ত্রসার এবং পরমার্থসার। এই শাখার আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অভিনব-গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়'।

সংহিতা রচনাবলী

সংহিতা সাহিত্যের রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কাশ্মীরে রচিত 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'। সংস্কৃত সাহিত্যের এই শাখার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঈশ্বরসংহিতা, পৌষ্করসংহিতা, পরমসংহিতা, সাত্ত্বসংহিতা, বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা এবং জ্ঞানামৃতসারসংহিতা।

তন্ত্র রচনাবলী

তন্ত্র সাহিত্যের রচনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—

মহানির্বাণ, কুলার্ণব, কুলচূড়ামণি, প্রপঞ্চসার (দার্শনিক শংকরকে ইহার রচয়িতা বলিয়া ধরা হয়), তন্ত্ররাজ, কালীবিলাস, জ্ঞানার্ণব, শারদাতিলক, (ভাস্করের) বরিবস্যারহস্য, (কৃষ্ণানন্দ প্রণীত) তন্ত্রসার এবং প্রাণতোষিণী।

গ্রন্থপঞ্জী

Avalon, A. *Tantrik Texts*

Chatterji, J. C. *Kashmir Shaivism*

Winterniz, M. *A History of Indian Literature*, Vol. I

Pandey, K. C *Abhinavagupta : An Historical and Philosophical Study.*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহাকাব্যোত্তর যুগের কাব্য

রামায়ণ এবং মহাভারত এই দুই মহাকাব্য নিঃসন্দেহে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের প্রতিভূ। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের উৎস অনুসন্ধান করা অথবা নারাশংসী এবং দানস্তুতিতে, সংবাদমন্ত্রে, বৈদিক দেবদেবীগণের চমৎকার বর্ণনায় কিংবা ব্রাহ্মণসমূহের উপকথা এবং নীতিবাক্যে ইহার প্রতিরূপ আবিষ্কার করা অকার্যকর। কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা মহাকাব্য বা কাব্যসমূহ মূলতঃ প্রাকৃতে রচিত এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইয়াছিল। তাঁহাদের এই ধারণার ভিত্তি হইল যে খৃষ্টপূর্ব যুগের সমস্ত লেখমালাই প্রাকৃতে রচিত। কিন্তু সেই যুগে প্রকৃত প্রাকৃত রচনাবলীর অস্তিত্বের সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সরবরাহ করা এই সকল পণ্ডিতগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। যদিও বা তর্কের খাতিরে সেই যুগে প্রাকৃত রচনার অস্তিত্বের কথা ধরা যায়, কোন এক আকারে সংস্কৃত সাহিত্যের সহাবস্থানও কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। উপরন্তু, যদি প্রাকৃত সাহিত্য পূর্ববর্তী হইয়াও থাকে, তথাপি সংস্কৃত সাহিত্য যে প্রাকৃত সাহিত্য হইতে উদ্ভূত ইহা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। রূপকথার ন্যায় জনপ্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের অস্তিত্ব প্রাকৃতে সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি অধিকতর অভিজাত সাহিত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার পক্ষে সর্বপ্রকার যুক্তি আছে। ইহার ভাষা সম্পূর্ণরূপে পাণিনির ভাষা না হইলেও, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি নিকট ছিল। ইহার প্রচলন ছিল চারণকাব্য ও তাহার পৃষ্ঠপোষক-বর্গের মধ্যে। এই সাহিত্যের দুইটি বিশিষ্টতম সৌধ হইল মহাকাব্যদ্বয়। দুইটি মহাকাব্যেরই এমন ভাষা এবং সাহিত্যগত বিশেষত্ব আছে যাহা মূল প্রাকৃত মহাকাব্যের অস্তিত্বের ধারণা পূর্বাহ্নেই বিদূরিত করে, এবং বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যের কতকগুলি দিক হইতে ইহাদের পরম্পরাকে অনুসন্ধান করা যায়।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে মহাকাব্যদ্বয় মূলে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিকতা একরূপ সুনিশ্চিত। কারণ মহাকাব্য হইতেই কাব্যসাহিত্যের সরাসরি বিকাশ ঘটিয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি রামায়ণই হইল প্রথম কাব্য, কারণ কাব্যশিল্পে বাল্মীকির দক্ষতা অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে যদিও রামায়ণ কাব্যশৈলীর ক্রমবিকাশের প্রমাণবহ, অপর মহাকাব্যটি কিন্তু পরবর্তীযুগের কবি এবং নাট্যকারগণের জন্য অফুরন্ত উপাদান সরবরাহ করা সত্ত্বেও রামায়ণের তুলনায় তেমন কোন সাক্ষ্য প্রদান করে না।

বিভিন্ন স্তরে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য রচনার স্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। অধুনালুপ্ত 'বাররুচ' কাব্যের উল্লেখ ব্যতীতও পতঞ্জলি কবির নিরঙ্কুশত্বের কথা বলিয়াছেন। কাব্য সাহিত্যের বিভিন্ন রীতি সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। যেমন, তিনি ভারত মহাকাব্যের কথা জানিতেন, পেশাদার আবৃত্তিকারগণের (গ্রন্থিক) উল্লেখ তিনি করিয়াছেন এবং বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা ও ভৈমরথী নামক তিনটি আখ্যায়িকার কথাও বলিয়াছেন। কংসবধ এবং বালিবধ নামে আরও দুইটি রচনার উল্লেখও আছে। এই দুইটি খুব সম্ভবতঃ নাটক। আরও কৌতূহলের বিষয় হইল যে মহাভাষ্যে কিছু উদ্ধৃতি আছে। উদ্ধৃতিগুলির অধিকাংশ ছন্দোবদ্ধ হইলেও বিচ্ছিন্ন। এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে শাস্ত্রসম্মত কাব্যরীতিতে প্রশস্তি, প্রেম বা নীতিকথামূলক বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। ছাগ ও ক্ষুর, কাক ও তাল প্রভৃতি প্রবাদ কথার পরোক্ষ উল্লেখ এমন উপাদানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যাহা পরবর্তীকালে জীবজন্তু বিষয়ক কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিল।

পতঞ্জলির সাক্ষ্য 'ছন্দসূত্র' রচয়িতা পিঙ্গলের দ্বারা সমর্থিত। ছন্দসূত্র মূলতঃ বেদাঙ্গ হইলেও প্রধানতঃ ইহা লৌকিক ছন্দঃ প্রকরণের ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহার গ্রন্থকার এবং পতঞ্জলিকে কখনো কখনো একই ব্যক্তি বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু তাঁহার রচনা প্রাচীনত্বের প্রমাণ দেয়। এই গ্রন্থে এমন অনেক ছন্দই বর্ণিত যেগুলি আমরা যে কাব্য সাহিত্যের কথা জানি তাহা হইতে গৃহীত নহে। এই ছন্দঃসমূহ হইতে এমন একটি যুগপরিবর্তন-

কালের অনুমান করা যায় যে সময় প্রেমমূলক গীতিকাব্যের রচয়িতাগণ কাব্যের উপর ছন্দের প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করিতেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে ছন্দের নামগুলি বাঞ্ছিতার বিশেষণরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে উপরোক্ত তথ্যগুলি সত্ত্বেও খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত কাব্যের গঠন বা বিকাশ সম্পর্কে আমাদের কোন নিশ্চিত ধারণা নাই, কারণ অদ্যাপি বর্তমান কোন কাব্যকেই ঐ সময়ের বলিয়া মনে হয় না। আস্থার সহিত আমরা বলিতে পারি উপরোক্ত তথ্যাবলী এই উপসংহারেরই পূর্বাভাস দেয় যে খৃষ্টকাল আরম্ভের সময়ে এবং সম্ভবতঃ তাহারও অনেক পূর্বে সংস্কৃত গীতিকাব্যের রচয়িতাগণের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লেখমালায় কাব্য

নবজাগরণের মত

ইয়োরোপে সংস্কৃত চর্চা আরম্ভের আদিপর্বে অধ্যাপক ম্যাক্স ম্যুলর 'সংস্কৃত সাহিত্যের নবজাগরণের' মত প্রচার করিয়াছিলেন এবং বেশ কিছুকাল ধরিয়া ইহা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। গভীর পাণ্ডিত্যের সহিত উপস্থাপিত তাঁহার মতবাদ এই তথ্যই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল যে যখন ভারতবর্ষ অনবরত বৈদেশিক আক্রমণের শিকার হইতেছিল, তখন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এক অন্ধকার যুগের মধ্য দিয়া চলিতেছিল। এই সংস্কৃতির প্রাচীনতম পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল ভারতীয় ইতিহাসের একটি সোনালী পৃষ্ঠা রূপে স্বীকৃত গুপ্তদের রাজত্বকালে। সর্বপ্রকার অভিনবত্ব সত্ত্বেও ব্যুহ্‌লার, কীলহর্ন এবং ফ্লীটের সাহিত্য এবং লেখমালা সংক্রান্ত গবেষণার ফলে এই মতবাদ সাধারণভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ব্যুহ্‌লার কর্তৃক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীর লেখ-মালার সাক্ষ্যপ্রমাণাদির বিস্তৃত পরীক্ষানিরীক্ষা এই শতকসমূহে সংস্কৃত গদ্য এবং পদ্য সাহিত্যের যথেষ্ট সম্প্রসারণই প্রমাণ করে নাই, উপরন্তু অধিকাংশ প্রশস্তি রচয়িতাই যে কাব্যশিল্পের কোন বিশেষ মতবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাহাও প্রমাণ করিয়াছে। ম্যাক্স ম্যুলর শক অভিযানের ফলে সাহিত্যিক সক্রিয়তার অবনতির ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ইহা নির্ভরযোগ্যরূপে প্রমাণিত যে পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রপগণ বা শকজাতি উদ্ভূত ক্ষত্রপগণ ধ্বংসকারী ছিলেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা ভারতীয় শিল্প ও ধর্ম এবং তৎসহ খৃষ্টীয় ১৫০ অব্দেই লেখমালার ভাষারূপে সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে সংস্কৃত কাব্যের চর্চা এবং বিকাশ কখনোই ব্যাহত হয় নাই।

গিরনার লেখ

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় খৃষ্টীয় ১৫০ অব্দের রুদ্রদামনের গিরনার লিপি পূর্ণবিকশিত কাব্যরীতি অনুসারে এবং ব্যাকরণসম্মত রূপে গদ্যে লিখিত। যদিও লেখটিতে মহাকাব্যগত রীতির লঙ্ঘন পাওয়া যায়, তথাপি ইহার রচয়িতা অলংকার প্রয়োগে ছিলেন একজন দক্ষশিল্পী। অনুপ্রাসের উদাহরণরূপে এই শব্দসমষ্টির উল্লেখ করা যাইতে পারে: 'অভ্যস্তনাম্নো রুদ্রদাম্নো'। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ সত্ত্বেও রচনাশৈলীর সাবলীলতা এবং প্রাঞ্জলত্ব কখনোই পরিত্যক্ত হয় নাই। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হইল যে রচনাকার কাব্যশাস্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং দণ্ডীকর্তৃক বৈদর্ভরীতিতে আরোপিত গুণাবলীর কথাও তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

নাসিক লেখ

নাসিকে প্রাপ্ত সিরি পুলুমায়ির লেখ প্রাকৃত গদ্যে লিখিত অপর একটি লিপি। এই লেখের কাল পূর্বোক্তটির সমসাময়িক। রচয়িতা নিশ্চিতরূপেই সংস্কৃত ভাষার সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তিনি দীর্ঘ সমাসপদ সহ সুদীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। অনুপ্রাস, এমন কি পরবর্তীযুগের কাব্যের রীতিদোষসমূহও এই লেখটিতে পাওয়া যায়।

এলাহাবাদ লেখ

আরও একটি লেখ হইল হরিষেণের সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি সংবলিত বিখ্যাত এলাহাবাদ প্রস্তরস্তম্ভলিপি। এই লেখটি কাব্যসাহিত্যের সহিত নিকট সম্পর্কের অনেক তথ্যই উপস্থাপিত করে এবং খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে সভাকাব্যের অক্লান্ত চর্চা প্রমাণিত করে। নয়টি শ্লোক এবং একটি দীর্ঘ গদ্য অংশে নিবদ্ধ এই প্রশস্তি একটি চম্পূকাব্য বিশেষ। শ্লোক সমূহে হরিষেণ অনেক সময়েই ছন্দ পরিবর্তনের অবতারণা করিয়াছেন। সেগুলি খুবই প্রাঞ্জল এবং দীর্ঘসমাসপদমুক্ত। গদ্যাংশে কিন্তু সহজ শব্দের ব্যবহার নাই, আছে অতিদীর্ঘ সমাসপদ। এই বৈপরীত্য অপ্রত্যাশিত নহে, বরং ইচ্ছাকৃত। কারণ দীর্ঘসমাসপদের ব্যবহারই যে গদ্যরীতির অপরিহার্য

বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে কাব্যশাস্ত্রের সকল গ্রন্থকারই একমত। নিঃসন্দেহে হরিষেণ বৈদর্ভরীতির অনুসরণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র গদ্যাংশেই তিনি অনুপ্রাসের সহজতম নমুনাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহাও বারংবার নহে। অর্থালংকারের ব্যবহার তিনি করিয়াছেন ঠিকই, কিন্তু কতকগুলি বর্ণিত পরিবেশের চিত্র রচনায় এবং যথাযথ শব্দ নির্বাচন ও বিন্যাসের উপর তিনি যতটা মনোনিবেশ করিয়াছেন অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তততখানি মনোযোগ দেন নাই। হরিষেণের কাবিক রূপকল্পে কাব্যসাহিত্যে সুপরিচিত অনেক কল্পনারই পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবীর মধ্যে শাশ্বত কলহ একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। প্রশস্তির গদ্যাংশে প্রশস্তিরচনাশিল্পে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য কবির প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। বস্তুতপক্ষে হরিষেণের প্রশস্তি তাঁহাকে কালিদাস এবং দণ্ডীব সমপর্যায়ভুক্ত করিয়াছে।

মান্দাসোব লিপি

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে কাব্যসাহিত্যের ঐকান্তিক চর্চা হইত বৎসভট্টির প্রশস্তি তাহার উদাহরণ। ইহা পরিপূর্ণভাবে ছন্দোবদ্ধ এবং চুয়াল্লিশটি শ্লোকে নিবদ্ধ। মান্দাসোরের সূর্যমন্দির ইহার বিষয়বস্তু। প্রশস্তিটি পাঠ করিলে মনে হয় যে কবি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র এবং ছন্দের নিয়মগুলি অনুসরণ করিয়াছেন। কাব্যধর্মী বর্ণনা এবং পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কবি একাগ্রতার সহিত প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার যে সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আরও মনে হয় তাঁহার রচনাকে মহাকাব্যসদৃশ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। অলংকারশাস্ত্র-মতে একটি মহাকাব্যে নগর, পর্বত, সমুদ্র, ঋতু প্রভৃতির বর্ণনা থাকা বাঞ্ছনীয়। নয়টি চমৎকার শ্লোকে দশপুর নগরীর বর্ণনা এবং দুইটি করিয়া শ্লোকে শীত এবং বসন্তের বর্ণনা এই প্রসঙ্গে পাঠ্য। ছন্দ এবং রীতির অনুধাবন করিলে বুঝা যায় শ্লোকগুলি রচনায় কবি কতখানি পরিশ্রম সাধন করিয়াছেন। বৎসভট্টির রচনাশৈলী গৌড়ীয় শাখার কবি-কুলের সাক্ষ্য বহন করে। তিনি দীর্ঘ সমাসপদের ব্যবহার করিয়াছেন

এবং একই বাক্যে সুললিত এবং কর্কশ শব্দাংশের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। বলা হয়, কবি কালিদাসের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার প্রচুর প্রমাণও আছে। অবশ্য তিনি যে সাধারণ স্তরের কবি ছিলেন তাহাতে দ্বিমত নাই। বৎসভট্টির মৌলিক প্রতিভার অভাব ছিল। কিন্তু গভীর যত্নের সহিত তিনি আদর্শ প্রকাশভঙ্গীর একটি মিশ্রিত সংকলন রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে গঠন এবং ভাবের দিক হইতে প্রশস্তিটি সংস্কৃত সাহিত্যের কৃত্রিম রচনাবলীরই পর্যায়ভুক্ত। একথা মনে করা ভুল হইবে না যে সেই সময়ে এমন অনেকগুলি কাব্য প্রচলিত ছিল যাহা প্রশস্তিকারকে অনুপ্রাণিত করে।

উপসংহার

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষের রচনাবলীই সংস্কৃত কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন নহে। খৃষ্টকালের প্রারম্ভ হইতেই কাব্য সাহিত্যের অবিরাম বিকাশ ঘটিয়াছিল। প্রাচীনতর কাব্যগুলি হয়তো দুর্ভাগ্যবশতঃ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই অথবা কালিদাসের ন্যায় কবিগণ তাঁহাদের পূর্বসূরীদের গৌরব সম্পূর্ণরূপে হরণ করিয়াছেন। যেমন, কালিদাস যে তিনজন নাট্যকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজনের নাটকসমূহের কথা আমরা জানি।

গ্রন্থপঞ্জী

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

Macdonell, A. A. : *A History of Sanskrit Literature*

Muller, Max : *A History of Ancient Sanskrit Literature*

Buhler, G. : *Indian Inscriptions and the Kāvya* (IA., Vol. XLII)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন বৌদ্ধ রচনা

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতীর ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য দিকচিহ্নের অভাব সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়নের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে সংস্কৃত সাহিত্যের কালটি অন্ধকারাবৃত ; তাহার ফলে কোনও এক লেখক কোন্ সময়ে লিখিয়াছেন বা কখন জীবিত ছিলেন তাহা নির্ধারণ করা একেবারেই অসম্ভব না হইলেও, অত্যন্ত দুঃসাধ্য। ভারতীয় সাহিত্যের কালনির্ঘণ্ট এরূপ বেদনাদায়ক অস্পষ্টতায় আবৃত যে, সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ লেখকগণ যে-বিরাট সাহিত্য রচনা করিয়াছেন সে সম্পর্কে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ অজ্ঞ ছিলেন।

মহাযান ও হীনযান রচনা বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত

বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার চিন্তাধারা যে ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা পালি নহে, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের অসাধারণ সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত ধর্মীয় সাহিত্য যে-ভাষায় রচিত তাহা অংশত-সংস্কৃত ও অংশত এমন এক আঞ্চলিক ভাষা অধ্যাপক সেনার্ত যাহার নাম দিয়াছেন মিশ্র-সংস্কৃত। কিন্তু অধ্যাপক পিশেল ইহাকে বলিয়াছেন গাথা। মহাযান শাখার এই সাহিত্যকে 'বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য' বলা হয়। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য শুধু মহাযান শাখার সমৃদ্ধ সাহিত্যের সহিতই সমার্থ-বোধক নহে, ইহার পরিধি আরও ব্যাপক ; কারণ হীনযান শাখার সাহিত্যও তাহার অন্তর্ভুক্ত এবং হীনযান শাখান্তর্গত এক গোষ্ঠী 'সর্বাস্তিবাদী'দের একটি অনুশাসন এবং বেশ বৃহদায়তন সাহিত্যও সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

সংস্কৃত অনুশাসনটি অবশ্য অখণ্ডরূপে পাওয়া যায় না কিন্তু মহাবস্তু, দিব্যাবদান ও ললিতবিস্তরের ন্যায় গ্রন্থে ইহার বহু উদ্ধৃতির সাক্ষ্য হইতে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এই সংস্কৃত অনুশাসনটির সহিত পালি অনুশাসনের ঘনিষ্ঠ মিল দেখা যায় এবং বলা হয় যে দুইটিই মাগধী ভাষায় অধুনালুপ্ত মূল অনুশাসন হইতে অনূদিত।

মহাবস্তু : রচনাকাল

হীনযান শাখার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক 'মহাবস্তু'—বিরাট ঘটনাবলীর গ্রন্থ। মহাসাংঘিকদের এক উপবিভাগ লোকোত্তরবাদীদের শাখার এই মহাবস্তু গ্রন্থটিতে ভূমিকার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে: "আর্যমহা-সাংঘিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং মধ্যদেশিকানাং পাঠেন বিনয়পিটকস্য মহাবস্তু আদি।" ইহা হইতে গ্রন্থটির রচনাকাল নির্ণয়ের সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য জানা প্রয়োজন মহাসাংঘিকদের লোকোত্তরবাদী শাখাটি কখন দেখা দিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের মৃত্যুর তারিখও নির্ণয় করা প্রয়োজন। ঠিক কোন বৎসরে বুদ্ধের জীবনাবসান ঘটিয়াছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। অধ্যাপক ম্যাক্স ম্যুলর ও কানিংহ্যাম বলিয়াছেন খৃঃ পূঃ ৪৭৭, আর শ্রীগোপাল আইয়ার বলেন খৃঃ পূঃ ৪৮৩। কিন্তু ডঃ স্মিথের তত্ত্বই অধিকতর সম্ভাব্য। তাঁহার মতে বুদ্ধের মৃত্যু হইয়াছিল খৃঃ পূঃ ৪৮৭-তে। কথিত আছে যে অশোক সিংহাসনে অভিষিক্ত হন খৃঃ পূঃ ২৬৯-এ এবং এই অভিষেক অনুষ্ঠান হইয়াছিল বুদ্ধের জীবনাবসানের প্রায় দুইশত আঠারো বৎসর পরে। কিন্তু দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধদিগের বিবরণ যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে এই বর্ষটি ছিল খৃঃ পূঃ ৫৪৪ কিংবা ৫৪৩। মহাবংশের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভিক পংক্তিগুলি মহাসাংঘিকদিগের আত্মপ্রকাশের কালের উপর আলোকপাত করে।[১] সেখানে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধের মৃত্যুর পরবর্তী প্রথম শতকে

১. একোহব থেরবাদো সো আদিবস্সসতে অহু। অঞ্ঞাচরিয়বাদা তু ততো ওরং অজায়িসুং॥ তেহি সংগীতিকারেহি থেরেহি দুতিয়েহি তে। নিগ্গহিতা পাপভিক্খূ সব্বে দসসহস্সিকা॥ অকংসআচারিয়বাদং মহাসংঘিকনামকম্॥

থেরদের মধ্যে একটিমাত্র বিভেদ দেখা দিয়াছিল। এই সময়ের পরে গুরুদিগের মধ্যে আরও বিভেদ ঘটে। থেরগণ (ইহারা দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান করেন) যে-সমস্ত পাপী পুরোহিতদিগের (সংখ্যায় দশ সহস্র) পদাবনতি ঘটাইয়াছিলেন, তাহাদের ভিতর হইতে গুরুদের মধ্যে মহাসাংঘিক মতধারী এক উপশাখার উদ্ভব হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৮টি বিভাগ দেখা দিয়াছিল এবং এগুলির সব কয়টিই বুদ্ধের মৃত্যুর দুই বছরের মধ্যে। কিন্তু অসুবিধার বিষয় হইল, মহাবংশতে লোকোত্তরবাদীদের কোনও উল্লেখ নাই। মহাবংশের অনুবাদের পরিশিষ্টে বলা হইয়াছে যে দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধ পরম্পরার মধ্যে লোকোত্তরবাদীদের দেখা যায় না। গোকুলিকদের অব্যবহিত পরেই তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। রকহিলের গ্রন্থে (পৃঃ ১৮২) যেখানে গোকুলিকদের উল্লেখ থাকিবার কথা সেখানে লোকোত্তরবাদীদের উল্লেখ দেখা যায়। অধিকন্তু অন্যান্য আরও দুইটি প্রসঙ্গে গোকুলিকদের উল্লেখ আছে, লোকোত্তরবাদীদের নাই। অতএব দুইটি একই গোষ্ঠী বলিয়া ধরিয়া লওয়াই শ্রেয় এবং সেক্ষেত্রে লোকোত্তরবাদীদের উদ্ভব মনে হয় অন্ততঃ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে ; তাহা হইলে তাহাদের প্রথম গ্রন্থরূপে কথিত মহাবস্তু সেই সময়ের পরবর্তী রচনা নিশ্চয়ই নয়।

মহাবস্তু : চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

কিন্তু একটি নূতন অসুবিধা দেখা দেয়। মহাবস্তু অখণ্ড সামগ্রিকতা-বিশিষ্ট গ্রন্থ নহে। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে রচিত এবং ইহা হইতেই গ্রন্থটির অবিন্যস্ত তথ্য ও চিন্তার কারণ বোঝা যায়। তাহা ছাড়া মহাবস্তু শিল্পগুণসমন্বিত সাহিত্যকর্মও নহে। সঠিকভাবেই ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে—'একটি গোলকধাঁধা, যেখানে বহু কষ্টে বুদ্ধের জীবনের সুসংলগ্ন বিবরণীর সূত্রটিকে আমরা আবিষ্কার করি।' বিষয়বস্তু যথাযথ রূপে বিন্যস্ত নহে এবং পাঠক বারংবার একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করেন। কিন্তু গ্রন্থটির গুরুত্ব এইখানে যে ইহা সুপ্রাচীনকালের অসংখ্য ঐতিহ্য ও পালি অনুশাসনের মূল পাঠের ভাষ্য রক্ষা করিয়াছে। মহাবস্তুর আরও একটি গুরুত্ব এইজন্য যে ইহার মধ্যে পাঠক কাহিনীর

এক অফুরন্ত ভাণ্ডার আবিষ্কার করেন। গ্রন্থটির প্রায় অর্ধেকই জাতক ও অনুরূপ কাহিনীতে পূর্ণ। অধিকাংশ বর্ণনাই পুরাণের কাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রহ্মদত্তের ইতিহাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উপসংহারে বলা যায়, মহাবস্তু হীনযান শাখার গ্রন্থ হইলেও উহার সহিত মহাযান মতবাদের মিলও কিছুটা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কারণ উহাতে একাধিক বুদ্ধের উল্লেখ আছে এবং বুদ্ধের আত্মজন্মের বর্ণনা আছে। এই সকল ধারণা নিঃসন্দেহে মহাযান শাখার চিন্তাধারার সহিত সংশ্লিষ্ট।

<u>ললিতবিস্তর</u> : ইহার প্রকৃতি

বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মূলতঃ হীনযানের সহিত সংশ্লিষ্ট সর্বাস্তিবাদী শাখার গ্রন্থ হইলেও ললিতবিস্তরকে মহাযান ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা যায়, কারণ ইহাকে বৈপুল্যসূত্ররূপে গণ্য করা হয়। গ্রন্থটিতে যে মহাযানবাদী ধর্মমত আছে তাহা উহার নামকরণ হইতেই অনুমান করা যায়, গ্রন্থটির নামের অর্থ—"বুদ্ধের ক্রীড়ার বিশদ বিবরণ।" গ্রন্থটির সমালোচনাত্মক অধ্যয়ন হইতে অবশ্য দেখা যায় যে ইহা "প্রাচীনতর এক হীনযান রচনার পরিমার্জিত রূপ —মহাযান ভাবধারায় পরিবর্ধিত ও অলংকৃত,—সর্বাস্তিবাদী শাখার পরিচায়ক বুদ্ধজীবনী।" একথাও সত্য যে বর্তমান ললিতবিস্তর কোনও বিশেষ লেখকের রচনা নহে; বরং ইহা এক "অজ্ঞাতনাম সংকলন যাহাতে প্রাচীন ও নবীন উভয় অংশই স্থান লাভ করিয়াছে।" এমতাবস্থায় গ্রন্থটিকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানাহরণের সুপ্রাচীন উৎস বলিয়া গণ্য করা সঠিক নহে। ইহার মধ্যে পাঠক প্রাচীনতম অবস্থায় বুদ্ধকাহিনীর ক্রমবিকাশ দেখিতে পান। তাই অধ্যাপক ভ্যালে পুসাঁ যখন বলেন যে "ললিতবিস্তর জনপ্রিয় বৌদ্ধধর্মের প্রতিভূ," তখন এই উক্তির আদৌ কোনও তাৎপর্য থাকে না। অবশ্য সাহিত্য ইতিহাসের দিক হইতে গ্রন্থটির গুরুত্ব বিরাট, কারণ অশ্বঘোষের মহাকাব্য 'বুদ্ধচরিতে'র উপাদান এই গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে।

ললিতবিস্তরের কাল : কার্নের মত

গ্রন্থটির রচনাকাল স্থির করিবার সময়ে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা একটি বৈপুল্যসূত্র। বৈপুল্যসূত্রগুলিতে আমরা গদ্যে সম্পাদিত কিছু অংশ পাই, তাহার পরেই পাই ছন্দোবদ্ধ অংশ। শেষোক্তটি সারগতভাবে প্রথমোক্তটিরই পুনরাবৃত্তি। গদ্যাংশের বাগ্‌ধারা একধরনের সংস্কৃত ; পদ্যাংশের বাগ্‌ধারা হইল গাথা-ছন্দের খাতিরে যতটুকু করা সম্ভব সেই মত কিছুটা অপটুভাবে সংস্কৃতান্বিত প্রচ্ছন্ন প্রাকৃত। অধ্যাপক কার্ন মনে করেন যে গদ্যাংশগুলি নিঃসন্দেহে প্রাকৃত মূল পাঠের সংস্কৃত অনুবাদ। অতএব প্রশ্ন ওঠে : মূল বাগ্‌ধারার স্থান সংস্কৃত কেন ও কখন গ্রহণ করিয়াছে? একথা সুবিদিত, ভারতে সকল প্রাকৃত ভাষার ভাগ্যেই অবলুপ্তি ঘটিয়াছে আর বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সাধারণ ভাষা রূপে এবং আর্য ও দ্রাবিড়দিগের মধ্যে যোগসূত্র রূপে সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন ও অনুশীলন সমগ্র দেশ জুড়িয়া রক্ষিত হইয়াছে। এখন অনুসন্ধান করা যাইতে পারে, সংস্কৃত কখন তাহার প্রাধান্য পুনরায় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অধ্যাপক কার্ন বলেন যে, খুব সম্ভবত ইহা ঘটিয়াছিল মহান কুষাণ নৃপতি কনিষ্কের শাসনকালে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধসংগীতির অল্প কিছু পূর্বে বা পরে।

নরিম্যানের মত ও সিদ্ধান্ত

শ্রী জি. কে. নরিম্যান তাঁহার *Literary History of Sanskrit Buddhism* গ্রন্থে বলেন, একথা চিন্তা করা ভুল যে প্রথম খৃষ্টীয় যুগে ললিতবিস্তর চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অধিকন্তু, ৩০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ফুয়াউকিঙ নামক চৈনিক বুদ্ধজীবনী 'ললিতবিস্তরে'র বর্তমান পাঠের দ্বিতীয় অনুবাদ—এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। অপর পক্ষে তিনি বলেন যে সংস্কৃত পাঠের এক যথাযথ অনুবাদ তিব্বতী ভাষায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে। উল্লেখের বিষয়, প্রাচীনতা সম্পন্ন অনেক কিছুই যে গ্রন্থটিতে আছে একথা প্রমাণ করিবার জন্য অধ্যাপক কার্ন যথেষ্ট কষ্ট করিয়াছেন। এই কথা বিবেচনা করিয়া ললিতবিস্তরকে খৃষ্টীয় যুগের কিছু পূর্বের রচনা বলা যায়।

সংস্কৃত ভাষায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ লেখক হইলেন অশ্বঘোষ। তাঁহার কালকে রহস্যের এক যবনিকা বেষ্টন করিয়া আছে। ডঃ স্মিথ তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন: "সাহিত্যে কনিষ্কের স্মৃতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ লেখক নাগার্জুন, অশ্বঘোষ ও বসুমিত্রের নামের সহিত জড়িত। অশ্বঘোষ কবি, সংগীতকার, পণ্ডিত, ধর্মীয় বাচনপটু, ও উৎসাহী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ধর্মবিশ্বাসে গোঁড়া ও কঠোর শৃঙ্খলানিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে বর্ণিত।" সমস্ত সাক্ষ্য -প্রমাণাদি বিচার করিয়া, এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার সভার একটি রত্ন অশ্বঘোষের কাল খৃষ্টীয় প্রথম শতক।[১]

১. মুদ্রাতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত কালানুক্রমিক গোষ্ঠীতে কনিষ্ক গোষ্ঠী কদফিস গোষ্ঠীর পরবর্তী। কিন্তু এই মতও পণ্ডিতগণের অবিসংবাদিত সমর্থন লাভ করে না। কোনও কোনও পণ্ডিত যেরূপ মনে করেন, কনিষ্ক, বাসিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব প্রমুখ রাজগণ যদি প্রথম কদফিসের পূর্ববর্তী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বাসুদেব এবং প্রথম কদফিসের মুদ্রা একত্রে পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই; এবং দ্বিতীয় কদফিস ও কনিষ্কের মুদ্রাকেও যেরূপ করা হইয়া থাকে সেরূপ একত্রে জড়িত করা উচিত নহে। উপরোক্ত অভিমতের প্রধান সমর্থকগণ হইলেন ড. ফ্লীট, ড. ফ্র্যাঙ্ক ও শ্রীকেনেডি। ড. ফ্র্যাঙ্ক এই বিষয়টির উপর জোর দেন যে বৌদ্ধ লেখকগণের সহিত পৃথকভাবে চৈনিক ঐতিহাসিকগণ কনিষ্কের কোনও উল্লেখ করেন না। কিন্তু যখন তিনি এই মত পোষণ করেন যে, তুর্কিস্তানের জাতিগুলি সম্পর্কে কাহিনীকার যে-উৎস হইতে তথ্য আহরণ করিতে পারিতেন, তাহা ১২৫ খৃষ্টাব্দেই শুরু হইয়া যায়, তখন তিনি নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেন। ড. ফ্লীট কনিষ্কের সিংহাসনারোহণকে পরম্পরাগত বিক্রম সংবতের সহিত যুক্ত করেন, এই সংবতের আরম্ভ খৃঃ পূঃ ৫৭ হইতে। ড. টমাস যথাযথভাবে এই মতকে খণ্ডন করিয়াছেন এবং অধ্যাপক মার্শালের আবিষ্কার ইহার সত্যতা সম্পূর্ণরূপে অপ্রমাণ করে। লেখসমূহ, মুদ্রা ও হিউয়েন সাঙের বিবরণে দেখা যায় যে গান্ধার কনিষ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চৈনিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি অনুযায়ী কিপিন বা কাপিশ-গান্ধার খৃঃ পূঃ প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কুষাণ রাজাদিগের অধীনস্থ ছিল না। অধ্যাপক মার্শাল, স্টেন কোনো, স্মিথ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে কনিষ্কের শাসন ১২৫ খৃঃ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুয়ে বিহার লেখমালার সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে কনিষ্কের সাম্রাজ্য সিন্ধু উপত্যকার নিম্নাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু রুদ্রদামনের জুনাগড় লেখে দেখি যে সম্রাটের রাজত্বের মধ্যে সিন্ধু ও সৌবীর-ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা

. কিন্তু লোককথা হইতে যতটুকু আমরা পাই এবং তাঁহার রচনাবলী হইতে যেটুকু জানা যায় তাহা ছাড়া অশ্বঘোষের ব্যক্তিগত ইতিহাস খুবই স্বল্পজ্ঞাত। তাঁহার গ্রন্থাদির অধ্যায়ান্তিক বৃত্তান্ত হইতে দেখা

সুবিদিত যে রুদ্রদামন ১৩০ হইতে ১৫০ খৃঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এমতাবস্থায় ক্ষমতাবান প্রাদেশিক শাসকের (দ্রঃ 'স্বয়মধিগতম্ মহাক্ষত্রপনাম') স্বাধীনতার সহিত কুষাণ রাজার সার্বভৌম কর্তৃত্বকে মিলানো প্রায় অসম্ভব। কনিষ্কর কাল ৩-২৩, বাসিষ্কর কাল ২৪-২৮, হুবিষ্কর কাল ৩১-৬০, ও বাসুদেবের কাল ৭৪-৯৮: ইহা হইতে একটি কথা প্রায় পরিষ্কার যে কনিষ্কই ছিলেন একটি অব্দের প্রবর্তক। কিন্তু আমাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে নতুন কোনও সংবৎ শুরু হয় নাই। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মত পোষণ করেন যে কনিষ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত কালটি ছিল ২৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দের 'কলচুরি' সংবৎ। কিন্তু অধ্যাপক জুভো দ্যবক্রইল বলেন যে কনিষ্কর সিংহাসনারোহণের তারিখের ১০০ বৎসর বাদে বাসুদেবের রাজত্ব সমাপ্ত হইয়াছিল, ইহা নাও হইতে পারে; কারণ যে-মথুরায় বাসুদেব শাসন করিতেন তাহা প্রায় ৩৫০ খৃষ্টাব্দে নাগদের অধীনে আসে। আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে উপরোক্ত কারণে আমরা স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকরের মতবাদও মানিয়া লইতে পারি না। তিনি ২৭৮ খৃষ্টাব্দকে কনিষ্কর সিংহাসনারোহণের তারিখ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অধ্যাপক ফারগুসন, ওল্ডেনবার্গ, টমাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, র‍্যাপসন প্রমুখের মতে কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সূচিত শকাব্দ প্রবর্তন করেন। অধ্যাপক দ্যবক্রইল এই মত গ্রহণ করেন না। কারণগুলি নিম্নরূপ: প্রথমত, কুজুল কদফিস ও হারমাওযিস ৫০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে শকাব্দ প্রতিষ্ঠা করেন এই মত যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে প্রথম কদফিসের শাসনের শেষ ও দ্বিতীয় কদফিসের সমগ্র শাসনকালের জন্য মাত্র ২৮ বৎসর থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় কদফিস এক অশীতিপর বৃদ্ধের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন এবং ইহাও অসম্ভব নহে যে তাঁহার রাজত্বকাল ছিল স্বল্পস্থায়ী। অধ্যাপক মার্শাল বলেন যে অধ্যাপক দ্যবক্রইল তক্ষশিলায় একটি দলিল আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাকে ৭৯ খৃষ্টাব্দের বলা যায় এবং ইহাতে যে রাজার উল্লেখ আছে তিনি অবশ্যই কনিষ্ক নহেন। কিন্তু অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী দেখাইয়াছেন যে দেবপুত্র উপাধিটি কনিষ্ক গোষ্ঠীর প্রতিই প্রযোজ্য, পূর্বতন কোন গোষ্ঠীর প্রতি নহে। একটি ব্যক্তিনাম বাদ দেওয়াতে ইহা প্রমাণ হয় না যে প্রথম কুষাণ রাজার কথাই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, অধ্যাপক স্টেন কোনো দেখাইয়াছেন যে তিব্বতী ও চৈনিক দলিলসমূহ প্রমাণ করে কনিষ্ক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক ছিলেন। কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে যে এই কনিষ্ক হইলেন ৪১ খৃষ্টাব্দের 'আরা' লেখমালার কনিষ্ক। এই সালটিকে যদি শকাব্দ হিসাবে বলা

যায় যে তিনি ছিলেন সাকেতের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং তাঁহার মাতার মান ছিল সুবর্ণাক্ষী।

বুদ্ধচরিত —

অশ্বঘোষের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বুদ্ধচরিত'—বুদ্ধের জীবনেতিহাস। ৎসিঙের বিবরণী হইতে বোঝা যায় তিনি বুদ্ধচরিতের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং গ্রন্থটিতে অষ্টাদশটি সর্গ ছিল। তিব্বতী অনুবাদেও একই সংখ্যক সর্গ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সংস্কৃত গ্রন্থটিতে মাত্র সপ্তদশটি সর্গ আছে। ইহার মধ্যে শেষ চারটি সর্গের উদ্ভব সন্দেহজনক। বলা হয়, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর জনৈক অমৃতানন্দ উক্ত চারটি সর্গ যোগ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিতেও চতুর্দশ সর্গের মাঝামাঝি পর্যন্ত আছে।

সমালোচনামূলক বিচার

বুদ্ধচরিত বাস্তবিকই এক শিল্প-কর্ম। ইহা মহাবস্তু ও ললিতবিস্তরের মতো নহে, ইহাতে বিষয়বস্তুকে সুবিন্যস্তরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। পাঠক কোনরূপ বিভ্রান্ত বা অসংলগ্ন বর্ণনার সাক্ষাৎ পান না। অলংকার ব্যবহার সম্পর্কে কবি অতি সতর্ক এবং অলংকার প্রয়োগের অতি প্রাচুর্য হইতে বিরত থাকায় তাহা কবিতাকে এক বিশেষ মাধুর্য প্রদান করিয়াছে। তদ্ব্যতীত বৌদ্ধ কাহিনীতে অলৌকিকের অবতারণা করা হইয়াছে সমান সংযমের সহিত।

যায় তাহা হইলে সেই তারিখটি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে পড়িবে। পো-তিয়াও প্রথম বাসুদেবের অন্যতম উত্তরাধিকারী হইতে পারেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্মিথ একাধিক বাসুদেবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সর্বশেষে, অধ্যাপক কোনো দেখাইয়াছেন যে কনিষ্ককাল ও শকাব্দের লেখগুলিতে একইভাবে তারিখ দেওয়া নাই। পণ্ডিতপ্রবর দেখাইয়াছেন যে কনিষ্কর লেখসমূহ পৃথক ভঙ্গিতে তারিখান্বিত। খরোষ্ঠী লেখমালায় কনিষ্ক তাঁহার শক-পহ্লব পূর্বপুরুষদের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। অপর দিকে, ব্রাহ্মী লেখমালায় তিনি অনুসরণ করিয়াছেন প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি। ইহা কি অসম্ভব যে পশ্চিম ভারতের স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ করিবার জন্যই তিনি তৃতীয় এক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন?

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কবিতাটি এক মহৎ সৃষ্টি। সুউচ্চ হর্ম্যের গবাক্ষপ্রান্ত হইতে সুদর্শনা তরুণীগণ রাজকুমারের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া দেখিতেছেন, এবং তাহার পরে রাজকুমার কিরূপে জরার বিতৃষ্ণাকর দৃশ্যের সম্মুখীন হইতেছেন তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। রমণীকুল যখন জানিতে পারিলেন যে রাজকুমার নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহারা গবাক্ষের নিকটে ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহাদের দেহের বসনভূষণ অসংবৃত সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কবি তাঁহাদের মুখাবয়বের বর্ণনা করিয়াছেন কতকগুলি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের সহিত। এই পৃথিবীর সুখসুবিধা পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় সংকল্প হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় রত সুন্দরী নারীদের মায়া কিভাবে তিনি কাটাইয়া ওঠেন, কবি সেই বিষয়টি শিল্পীসুলভ কুশলতায় বর্ণনা করিয়াছেন। আবার, মধুর নিদ্রাভিভূত সুন্দরী নারীদের নিরাবরণ দেহ দেখিতে দেখিতে রাজকুমার রাজপুরী পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিতেছেন—এই বিখ্যাত দৃশ্যটির বর্ণনাও দুর্লভ কাব্যগুণের আরেকটি দৃষ্টান্ত। সারথির সহিত কথাবার্তার পর রাজকুমার তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন এবং সেই কথোপকথনেই প্রকাশ পাইতেছে যে জাগতিক সুখের প্রতি তিনি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন—এই দৃশ্যটিও কম করুণ নয়। কবি বর্ণনাশক্তিরও সহজাত অধিকারী। 'মার' ও তাহার দানবিক জনবলের বিরুদ্ধে বুদ্ধের প্রতিরোধের দৃপ্ত বর্ণনাটি অবিস্মরণীয়। কাব্যটিতে এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় যে কবি রাষ্ট্রপরিচালনা-কৌশল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

সৌন্দরনন্দ

অশ্বঘোষ 'সৌন্দরনন্দ' নামক আরেকটি মহাকাব্যেরও রচয়িতা। এই মহাকাব্যটি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত। অষ্টাদশ সর্গে রচিত এই কাব্যটিতেও বুদ্ধের জীবনেতিহাস আছে, কিন্তু মূল বিষয়বস্তু হইল সুন্দরী ও নন্দ-র পরস্পরের প্রেম। নন্দ ছিলেন বুদ্ধের সম্পর্কীয় ভ্রাতা, বুদ্ধ তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দেন।

গণ্ডীস্তোত্রগাথা

কবির তৃতীয় গ্রন্থ—ঊনত্রিংশ স্তবকে রচিত এক গীতিকবিতা 'গণ্ডীস্তোত্র-গাথা'। ইহা এ. ফন স্টায়েল-হলস্টাইন কর্তৃক চীন ভাষা হইতে মূল সংস্কৃতে পুনঃরূপান্তরিত। ইহা দীর্ঘ সুসমঞ্জস কাষ্ঠখণ্ড নির্মিত বৌদ্ধ বিহারের ঘণ্টা-'গণ্ডী'র প্রশংসায় এবং ইহার উপর আরেকটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা আঘাত করিলে সেই ধ্বনি যে ধর্মীয় বাণী বহন করে তাহার প্রশংসায় রচিত।

সূত্রালংকার

কবির আরেকটি গ্রন্থ হইল 'সূত্রালংকার'।[১] ইহা বুদ্ধচরিতের পরবর্তী রচনা, কারণ ইহাতে বুদ্ধচরিতের উদ্ধৃতি আছে। দুঃখের বিষয় সংস্কৃত পাঠটি অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। আমাদের নিকট শুধু চীনা অনুবাদটি আছে। এই 'সূত্রালংকার' জাতক ও অবদানশতকের ধরনে ধর্মীয় উপাখ্যানের সংকলন। অশ্বঘোষের সময়েও নাট্যসাহিত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি সূত্র এই গ্রন্থ হইতে আমরা লাভ করি। মার সম্পর্কিত কবিতাটিতে নাটকের বিন্যাসের রূপ পাওয়া যায়।

শারিপুত্রপ্রকরণ

অশ্বঘোষ যে নাট্যকারও ছিলেন তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 'শারিপুত্রপ্রকরণ' নামক ৯য় অঙ্ক বিশিষ্ট নাটকের শেষ অংশ আবিষ্কারের বিরাট ঘটনাটির উল্লেখ করা যায়। ইহাতে শারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের পরিবর্তনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তুরফান হইতে প্রাপ্ত ভূর্জপত্রে লিখিত মহামূল্যবান পাণ্ডুলিপিসম্পদের মধ্যে একটি পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে, অধ্যাপক ল্যুডার্স তাহাতেই এই নাটকটি পাইয়াছেন। নাটকটির লেখক রূপে রহিয়াছে অশ্বঘোষের নাম।

---

১. ড. ভিনতারনিৎসের মতে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক কবি কুমারলাত রচিত। গ্রন্থটির নাম 'কল্পনামণ্ডিতিকা' বা 'কল্পনালংকৃতিকা'।

মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র

অশ্বঘোষের আরেকটি রচনা বলা হয় 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র'কে। ইহা মহাযান মতবাদের ভিত্তিতে একটি দার্শনিক রচনা।[১] অধ্যাপক লেভি মন্তব্য করিয়াছেন, এই গ্রন্থে লেখক পরিচয় দিয়াছেন যে তিনি একজন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, অধিবিদ্যাবিৎ, যিনি বৌদ্ধধর্মকে পুনর্জীবন দানের যোগ্য এক মতবাদকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কাজে অটলভাবে ব্রতী। অনুমান করা হয় যে লেখক ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি সর্বাস্তিবাদী শাখায় যোগদান করেন, পরে মহাযানের জন্য প্রস্তুত হন। এক সময়ে মনে করা হইত যে মহাযানবাদের ক্ষেত্রে অশ্বঘোষ পথিকৃৎ ছিলেন। অবশ্য একথা মনে করাই বুদ্ধিমত্তার কাজ হইবে যে এবিষয়ে তিনিই প্রথম লেখক নহেন, বরং ইহার দৃঢ় প্রবক্তা ছিলেন। কারণ একথা অনস্বীকার্য যে মহাযান শাখা অশ্বঘোষের বহু পূর্বে উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

বজ্রসূচী

'বজ্রসূচী'কেও অশ্বঘোষের আরেকটি রচনা বলা হয়। এখানে লেখক ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিয়া পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অভ্রান্ততা ও বর্ণ-সংক্রান্ত দাবি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন এবং সমানাধিকারের মতবাদের সপক্ষে বলেন। চৈনিক 'তিপিটক' তালিকায় গ্রন্থটি ধর্মকীর্তির রচনা বলা হইয়াছে।[২]

মাতৃচেতা ও তাঁহার রচনা

মাতৃচেতা এক বৌদ্ধ সংস্কৃত কবির গুপ্ত নাম। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের মতে ইনি অশ্বঘোষ ব্যতীত আর কেহ নহেন। ৎসিঙের মতে মাতৃচেতা 'চতুশ্‌শতকস্তোত্র' ও 'শতপঞ্চাশতিকনামস্তোত্রে'র রচয়িতা।

১. ড. ভিনতারনিৎসের মতে এই রচনাটিকে ভ্রমক্রমে অশ্বঘোষের বলা হইয়াছে।
২. দ্রষ্টব্য বুনইউ নানজিও, *Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tipitaka*, No. 1333.

এই দুইটি কবিতা যথাক্রমে চারিশত ও একশত পঞ্চাশটি শ্লোকে নিবদ্ধ। মধ্য এশিয়ায় প্রথমোক্তটির মূল সংস্কৃত পাঠের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। কবিতা দুইটিতে শিল্পগত চমৎকারিত্ব কিছুটা দেখা যায়। ইঁহার আরেকটি রচনা বলা হয় 'মহারাজ-কনিকলেখ'কে।[১]

আর্যচন্দ্র : মৈত্রেযব্যাকবণ

আর্যচন্দ্র সম্ভবত মাতৃচেতারই সমসাময়িক। তিনি 'মৈত্রেয়ব্যাকরণ' কিংবা 'মৈত্রেয়সমিতি'র লেখক রূপে পরিচিত। গ্রন্থটি গৌতম বুদ্ধ ও শারিপুত্রের মধ্যে কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখিত। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত এই গ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়।

আর্যশূব : জাতকমালা

জনপ্রিয় 'জাতকমালা'র লেখক কবি আর্যশূরের নাম সুবিখ্যাত। গ্রন্থটি 'সূত্রালংকার'কে আদর্শ রূপে অনুসরণ করিয়া রচিত। অজন্তার গুহাগুলিতে অঙ্কিত চিত্রসমূহের মধ্যে আর্যশূরের রচনার উৎকীর্ণ অংশবিশেষসহ 'জাতক-মালা' হইতে নানা দৃশ্য আছে। লেখগুলি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের; কিন্তু কবির আরেকটি রচনা যেহেতু ৪৩৪ খৃষ্টাব্দে চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, সেই হেতু মনে হয় তিনি নিশ্চয় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে বর্তমান ছিলেন।

সদ্ধর্মপুণ্ডবীক

মহাযান শাখার বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে 'মহাযানসূত্র' নামক কতকগুলি গ্রন্থ একান্ত রূপে রক্ষিত হইয়াছে। এগুলি প্রধানত একাধিক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের গরিমাগাথায় পূর্ণ। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'। ইহা পুরাণের ভঙ্গিতে লিখিত। গ্রন্থটি বুদ্ধ শাক্যমুনির গৌরবগাথা, ইহাতে বিভিন্ন কালের উপাদান আছে; কারণ এইরূপ মনে করা হয় যে মিশ্র-সংস্কৃততে সংস্কৃত গদ্য ও গাথা একই

১. এফ. ডবলিউ. টমাস: *Mātṛcetā and the Mahārāja—Kanikalekha* (I. A. Vol. XXXII).

সময়ে বিকাশ লাভ করে নাই। গ্রন্থটি ২২৫ ও ৩১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অতএব মূল গ্রন্থটি নিশ্চয়ই এরূপ এক সময়ে রচিত হইয়াছিল যাহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পরবর্তী নহে। কোনও কোনও পণ্ডিত অবশ্য ইহার রচনাকাল আরও কিছু পূর্বের বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অধ্যাপক কার্নও এমন কোনো স্তবক খুঁজিয়া পান নাই যাহাতে কোনপ্রকার প্রাচীন চিন্তার লক্ষণ দেখা যায়।

কারণ্ডব্যূহ

আরেকটি গ্রন্থ হইল 'কারণ্ডব্যূহ'। ইহা দুইটি ভাষ্যে রক্ষিত আছে, উহাতে আস্তিকতামূলক প্রবণতার লক্ষণ দেখা যায়। ইহাতে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। ২৭০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটি চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

সুখাবতীব্যূহ ও অক্ষোভ্যব্যূহ

'সুখাবতীব্যূহ'তে বুদ্ধ অমিতাভ-র মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটিতে পাঠক এক আত্মিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সন্ধান লাভ করেন। 'অক্ষোভ্যব্যূহ'তে বুদ্ধ অক্ষোভ্য-র বৃত্তান্ত বর্ণিত। গ্রন্থটি ৩৮৫ হইতে ৪৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত।

দার্শনিক সাহিত্য

বৌদ্ধ কবিগণের দার্শনিক সাহিত্যের অবদান প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কম নহে। প্রাচীনতম মহাযানসূত্রের দার্শনিক রচনার মধ্যে 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র নাম উল্লেখ করা দরকার। ধর্মীয় ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে ইহা এক অনন্য আসন অধিকার করিয়া আছে। প্রজ্ঞাপারমিতার চীনা অনুবাদ হইয়াছিল ১৭৯ খৃষ্টাব্দেই। অন্যান্য দার্শনিক মহাযানসূত্র হইল: বুদ্ধাবতংসক, গণ্ডব্যূহ, রত্নকূট, দশভূমক, রাষ্ট্রপাল, লঙ্কাবতার, সমাধিরাজ ও সুবর্ণপ্রভাস।

নাগার্জুন : তাঁহার রচনাবলী

নাগার্জুনের নাম কুষাণ রাজা কনিষ্কের সহিত জড়িত।[১] 'মাধ্যমিক-কারিকা' চারিশত শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ পদে তাঁহারই লিখিত এক সুসংবদ্ধ দার্শনিক রচনা। ব্রাহ্মণ্য দার্শনিক সাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনার সহিত আমরা পরিচিত। নাগার্জুন 'অকুতোভয়'-এর লেখক রূপেও খ্যাত। ইহা তাঁহার নিজের রচনা সম্পর্কে টীকা, তিব্বতী অনুবাদে ইহা সংরক্ষিত। তাঁহার অপর রচনাগুলি হইল : যুক্তিষষ্টিকা, শূন্যতাসপ্ততি, প্রতীত্যসমুৎপাদহৃদয়, মহাযানবিংশক, বিগ্রহব্যাবর্তনী, একশ্লোকশাস্ত্র, প্রজ্ঞাদণ্ড ও অন্য কয়েকটি টীকা। 'সুহৃল্লেখ'কেও নাগার্জুনের রচনা বলা হয়, কিন্তু ইহাতে কোনও মাধ্যমিক মতবাদ নাই।

আর্যদেব, মৈত্রেয়নাথ, আর্য অসঙ্গ ও বসুবন্ধু অসঙ্গ : তাঁহাদের রচনা

অশ্বঘোষ ও নাগার্জুনের জীবনীর চৈনিক অনুবাদে (৪০৪ খৃঃ) জনৈক আর্যদেবের নামোল্লেখ আছে। তাঁহার 'চতুশ্‌শতক' গ্রন্থটি মাধ্যমিক মতবাদ সম্পর্কিত এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচারের বিরুদ্ধে একটি তর্কমূলক রচনা। তাঁহার অপর গ্রন্থাদি হইল—দ্বাদশনিকায়শাস্ত্র ও চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ। যোগাচার শাখার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মৈত্রেয়নাথ 'অভিসময়ালংকারকারিকা'র লেখক। ইহা সম্ভবত খৃঃ চতুর্থ শতকে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। মৈত্রেয়নাথের বিখ্যাত শিষ্য আর্য অসঙ্গ কয়েকটি গ্রন্থ ব্যতীত 'যোগাচারভূমিশাস্ত্রে'র লেখক। এই সমস্ত গ্রন্থ চৈনিক অনুবাদে সংরক্ষিত আছে। সর্বাস্তিবাদী শাখার দৃঢ় অনুগামী বসুবন্ধু অসঙ্গ সাংখ্য দর্শনের বিরোধিতা কল্পে 'অভিধর্মকোষ' ও 'পরমার্থসপ্ততি' রচনা করেন। অধ্যাপক তাকাকুসু ৪২০ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার কাল নির্ণয় করেন এবং য়োগীহারা করেন ৩৯০ হইতে ৪৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি মহাযান মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়, তখন 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' রচনা কং

১. কেহ কেহ মনে করেন যে নাগার্জুন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে লোক ছিলেন।

দিঙ্‌নাগ : তাঁহার রচনাবলী

প্রাচীন দার্শনিকগণের মধ্যে দিঙ্‌নাগ ছিলেন প্রধান। তিনি তাঁহার মহৎ রচনা 'প্রমাণসমুচ্চয়' ও 'ন্যায়প্রবেশ'-এর মধ্য দিয়া মূল্যবান অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সম্ভবত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে জীবিত ছিলেন। সম্ভবত এই শতাব্দীতেই স্থিরমতি ও ধর্মপালও জীবিত ছিলেন। ইঁহারা মাধ্যমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান টীকা লিখিয়াছেন।[১]

অবদান সাহিত্য

অবদান সাহিত্যের সুবিশাল ক্ষেত্রটিও বৌদ্ধ কবিগণের সংস্কৃত রচনার এক সুন্দর উদাহরণ। 'অবদান' শব্দটির তাৎপর্য হইল "মহৎ ধর্মীয় বা নৈতিক কীর্তি তথা মহৎ কীর্তির ইতিহাস।" এই মহৎ কর্ম নিজের জীবন বিসর্জন বা মন্দিরে ধূপ, পুষ্প, স্বর্ণ ও মণি-রত্ন সরবরাহের জন্য কোনও প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা মন্দির নির্মাণ হইতে পারে। অবদান কাহিনী এই শিক্ষা প্রচারের জন্য রচিত যে, কালো (নীচ) কাজ কালো (নীচ) ফল ধারণ করে আর সাদা (মহৎ) কাজ জন্ম দেয় সাদা (মহৎ) ফলের। এইভাবে সেগুলি 'কর্মন্'-এর কাহিনীও বটে।

অবদানশতক ও কর্মশতক

অবদান সাহিত্যের রচনাতালিকার শীর্ষে 'অবদানশতকে'র স্থান। ইহা দশটি দশক লইয়া গঠিত। তাহার প্রত্যেকটির নিজস্ব বিষয়বস্তু আছে। আরেকটি রচনা 'কর্মশতকে'র সহিত প্রথমোক্তটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। 'কর্মশতক' শুধু তিব্বতী অনুবাদেই রক্ষিত আছে। তিব্বতী ভাষায় (অবশ্য মূল সংস্কৃত হইতে অনূদিত) আরেকটি কাহিনী সংগ্রহের নাম 'দ্সানগ্লুন্'।

১. বৌদ্ধধর্মের সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত শাখার পরবর্তী দার্শনিক গ্রন্থসমূহ—যথা, যশোমিত্র, চন্দ্রকীর্তি, শান্তিদেব, ধর্মকীর্তি, ধর্মোত্তর ও অন্যান্যদের দর্শন সম্পর্কে রচনা—পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

দিব্যাবদান

'দিব্যাবদান' অবদান সাহিত্যের একটি সুবিখ্যাত সংকলন। গ্রন্থটি ব্যাপক অর্থে হীনযান শাখার ; কিন্তু ইহাতে মহাযানীয় প্রভাবের চিহ্নও আবিষ্কার করা যায়। সংগ্রহটি বহু উপাদানে রচিত এবং তাহার ফলে ইহাতে ভাষার কোনরূপ সমধর্মিতা নাই। কিন্তু ভাষা প্রাঞ্জল এবং উহাতে সত্যকার কবিতারও অভাব নাই। ভারতীয় সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ হইতে গ্রন্থটির গুরুত্ব বিরাট। ইহার সম্পাদনার কাল সম্পর্কে বলা যায় যে ইহাতে যেহেতু পুষ্যমিত্র পর্যন্ত অশোকের: উত্তরাধিকারীদের উল্লেখ আছে এবং 'দীনার' শব্দটি যেহেতু বারংবার ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই হেতু ইহাকে আদৌ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্বেকার রচনা বলা যায় না।

অশোকাবদান, কল্পদ্রুমাবদানমালা, রত্নাবদানমালা; দ্বাবিংশত্যবদান ও গোণ অবদানসমূহ

'অশোকাবদান' হইল কাহিনীমালা, হইার মূল বিষয়বস্তু অশোকের ইতিবৃত্ত। ইতিহাসগতভাবে এই কাহিনীগুলির মূল্য সামান্যই। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকেই চৈনিক ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ কল্পদ্রুমাবদানমালা, রত্নাবদানমালা ও দ্বাবিংশত্যবদানের উল্লেখ করা যায়। ইহাদের বিষয়বস্তু 'অবদানশতক' হইতে আহৃত। আরও তিনটি গ্রন্থের কথা পাণ্ডুলিপি আকারেই আমরা জানি। সে তিনটি গ্রন্থ হইল—ভদ্রকল্পাবদান, ব্রতাবদানমালা এবং বিচিত্রকর্মিকাবদান।

অবদানকল্পলতা

অবদান সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত রচনা হইল খৃষ্টীয় একাদশ শতকের ক্ষেমেন্দ্রর 'অবদানকল্পলতা'। গ্রন্থটি অলংকারসমৃদ্ধ মহাকাব্যের শৈলীতে লিখিত।

গ্রন্থপঞ্জী

Keith, A. B. · *A History of Sanskrit Literature*

Kern, H. *Manual of Buddhism*

Nariman, G. K. *Literary History of Sanskrit Buddhism*

Raychoudhury, H. C. : *Political History of Ancient India*

Smith, V. A. *Oxford History of India*

Winternitz, M. *A History of Indian Literature,* Vol. II

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহাকাব্য

ক. ভূমিকা

লক্ষণ : প্রয়োজনীয়

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের পণ্ডিত লেখকগণ লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্যের লক্ষণসমূহের এক বিশদ তালিকা দিয়াছেন। এই লক্ষণগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপ্রয়োজনীয় বা আনুষ্ঠানিক। ইহার মধ্যে প্রয়োজনীয় লক্ষণগুলি কবিতার তিনটি অঙ্গের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিনটি অঙ্গ হইল : কাহিনীর বিষয়বস্তু (বস্তু), নায়ক (নেতৃ), ও রস।[১] প্রথমত, মহাকাব্যের বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকা দরকার, তাহা কাল্পনিক হইলে চলিবে না। দ্বিতীয়ত, নায়ককে উচ্চ বংশোদ্ভূত গুণান্বিত ব্যক্তি হইতে হইবে, পরিভাষায় যাহাকে 'ধীরোদাত্ত' বলে সেইরূপ হইতে হইবে। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হইল বিভিন্ন রস ও ভাবের চিন্ময় বর্ণনা।

লক্ষণ : অপ্রয়োজনীয়

অপ্রয়োজনীয় লক্ষণগুলি বাহ্যিক এবং শুধু কলাকৌশলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহার সংখ্যা অনেক এবং তাহারা দাবি করে যে (১) মহাকাব্য

১. সাধারণ ভাবে রস আট প্রকার, যথা, শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। কেহ কেহ বলেন যে, 'শান্ত' রসটি পরবর্তীকালে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র সুপণ্ডিত টীকাকার অভিনবগুপ্ত কর্তৃক সংযুক্ত হইয়াছিল। ইহা সম্ভবত যুক্ত হইয়াছিল মহাভারতে 'মহাপ্রস্থানে'র ভাবটিকে বুঝাইবার জন্য। এ কথা বলা হয় যে ভরত আটটি রসের সংখ্যা নিরূপণ করিযাছিলেন শুধু নাটকের জন্য, মহাকাব্যের জন্য নহে।

আরম্ভ হইবে আশীর্বাদ, অভিবাদন বা ঘটনার বিবরণ সহ, (২) পরিচ্ছেদ বা বিভাগের নাম হইবে 'সর্গ', (৩) সর্গের সংখ্যা ত্রিশের অধিক কিংবা আটের কম হইবে না, (৪) প্রতি সর্গে শ্লোকের সংখ্যা সাধারণ ভাবে ত্রিশের কম ও দুই শতের অধিক হইবে না, (৫) তাহাতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, জলাশয় ও উদ্যান, প্রণয়োদ্দীপক ক্রীড়া ও আনন্দ-বিহার প্রভৃতির বর্ণনা থাকিবে, (৬) বিষয়বস্তুর বিকাশ স্বাভাবিক হইবে এবং তাহার পাঁচটি 'সন্ধি' মুহূর্ত সুবিন্যস্ত হইবে, এবং (৭) প্রতি সর্গের শেষ দুই বা তিন স্তবক পৃথক এক বা একাধিক ছন্দে রচিত হইবে।[১]

১. সহজেই দেখা যায় যে এই লক্ষণগুলি সব মহাকাব্যে সর্বদা নাই। পঞ্চাশ সর্গে রচিত 'হরবিজয়', 'নৈষধীয়চরিতে'র দ্বিশতাধিক শ্লোক বিশিষ্ট কয়েকটি সর্গ এবং মাত্র ২৭টি শ্লোকবিশিষ্ট 'ভট্টিকাব্যে'র প্রথম সর্গ এই বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ।

খ. মহাকাব্যের উৎপত্তি ও বিকাশ

অশ্বঘোষ

অশ্বঘোষের নাম আমরা জানি মহাকাব্যের জ্ঞাত প্রাচীনতম কবিদের অন্যতম রূপে। তাঁহার দুইটি মহৎ মহাকাব্য বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ সম্পর্কে পূর্ববর্তী এক পরিচ্ছেদে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

কালিদাস : তাঁহার কাল

মহাকাব্য রচয়িতা কবিদের মধ্যে রাজকুমার হইলেন কালিদাস। কিন্তু কোন সময়ে তিনি বর্তমান ছিলেন তাহা স্থির করা দুরূহ, হয়তো অসম্ভব। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় যে কবি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খৃঃ ৩৮০—৪১৫) আবির্ভূত হন, তাঁহার কাব্যক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে ছিল প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (খৃঃ ৪১৫—৪৫৫) এবং তিনি স্কন্দগুপ্তের শাসনও (খৃঃ ৪৫৫—৪৬৭) দেখিয়া গিয়াছেন।১

১. কালিদাসের কাল সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা বিভ্রান্তিকর প্রশ্নগুলির অন্যতম। এবং পণ্ডিতগণের মতামত—তাহা যত দক্ষতার সহিতই উদ্ভাসিত হউক না কেন—আমাদের কোনরূপ সুনিশ্চিত উত্তর প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়। দুঃখের বিষয়, ভারত তাহার শ্রেষ্ঠতম কবি ও নাট্যকারের ইতিহাস সংরক্ষণ করে নাই। লোক পরম্পরা কালিদাসের নামকে ঘিরিয়া বহু কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিয়াছে এবং এত দিন পরে উপকথার বর্ণাঢ্যতার মধ্য হইতে ঐতিহাসিক তথ্য পৃথক করিয়া লওয়া প্রায় অসম্ভব। পরম্পরাগত মতবাদে কালিদাস বিক্রম সংবতের সমসাময়িক, এই সংবতের প্রারম্ভিক বর্ষ খৃঃ পূঃ ৫৭। এই মতবাদের প্রধান সমর্থকদের মধ্যে আছেন স্বর্গীয় স্যার উইলিয়ম জোনস, ড. পিটারসন, অধ্যক্ষ এস. রায় ও শ্রী আই. আর. বালসুব্রহ্মণ্যম্। অধ্যক্ষ রায় যুক্তি দেখাইয়াছেন যে ১৯০৯-১০ সালে ড. মার্শাল কর্তৃক এলাহাবাদের নিকট যে 'ভীটা' পদকটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে এরূপ একটি দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে যাহা দেখিতে ঠিক 'শাকুন্তলে'র উদ্বোধনী দৃশ্যের মতো। পদকটি শুঙ্গ যুগের (খৃঃ পূঃ ১৮৭—৭৫)।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত এক মহাকাব্য। ইহার মধ্যে প্রথম আটটি সর্গকেই খাঁটি বলিয়া মনে করা হয়। মল্লিনাথ শুধু প্রথম আটটি সর্গ সম্পর্কেই তাঁহার টীকা লিখিয়াছেন। পরবর্তী

অধিকন্তু কালিদাসের রচনাশৈলীই তাঁহাকে অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী বলিয়া প্রমাণ করে। 'রঘুবংশ'তে অজের রাজধানী প্রবেশের যে বর্ণনা দেখা যায় অশ্বঘোষ তাহা ব্যবহার করিয়াছেন এবং কালিদাসের শব্দ ও শৈলী গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, যে 'ভীটা' পদকে প্রাপ্ত দৃশ্যকে নিশ্চিন্তরূপে 'শাকুন্তলে'র দৃশ্যের সহিত এক বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। অধ্যাপক কাওয়েল তাঁহার 'বুদ্ধচরিতে'র সংস্করণে মন্তব্য করিয়াছেন যে কালিদাসই অশ্বঘোষের অনুকরণ করিয়াছেন, ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটে নাই। শ্রীবালসুব্রহ্মণ্যম্ তাঁহার তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন কালিদাসের নাটকসমূহের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের উপর। 'মালবিকাগ্নিমিত্র'র উপসংহারে এই মতকে সমর্থন করা হইয়াছে যে পুষ্যমিত্রের পুত্র খৃঃ পূঃ প্রথম শতকের অগ্নিমিত্রের রাজত্বকালে কালিদাস জীবিত ছিলেন। 'শাকুন্তল'তে আইন ব্যবস্থা, বিশেষত উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন, যে ভাবে দেখা যায় তাহাতে মনে হয় কবি নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভের পূর্বের লোক। অধিকন্তু খৃঃ পূঃ প্রথমে শতকে উজ্জয়িনীতে এক বিক্রমাদিত্য ছিলেন এবং কবি যেহেতু তাঁহার সভার কবি ছিলেন, সেই হেতু কালিদাসের রচনা পরোক্ষ ভাবে তাঁহারই উল্লেখ করে।

ড. পিটারসনের নিজস্ব বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো যথেষ্ট যুক্তি নাই। তিনি শুধু লিখিয়াছেন যে, "কালিদাস খৃষ্টীয় যুগের বহুপূর্বে যদি নাও হন, প্রারম্ভের কাছাকাছি অধিষ্ঠান করেন।" 'শাকুন্তলে'র ভূমিকায় স্যার উইলিয়ম জোনস কোনরূপ যুক্তি না দেখাইয়া খৃষ্ট পূর্বাব্দের মতবাদকেই মানিয়া লন।

আরেকটি মতবাদ কালিদাসকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে লইয়া আসে। এই মতবাদের অন্যতম সমর্থক স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে রঘুর বিশ্বজয়কালীন তৎকর্তৃক হূণদের পরাজয় স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক হূণদের পরাজয়ের কথা ইঙ্গিত করে (খৃঃ ৪৫৫—৪৮০)। 'মেঘদূতে' ব্যবহৃত 'দিঙ্‌নাগ' ও 'নিচুল' শব্দদুইটি কালিদাসের পূর্ববর্তী মহৎ শিক্ষকদের কথা ইঙ্গিত করে। এই মতবাদের আরেকজন অনুগামী অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার অধ্যাপক ফারগুসনের মন্তব্যের উপরে তাঁহার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অধ্যাপক ফারগুসন দেখান যে মালব সংবৎ ৫৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে পিছাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; এবং যশোধর্মদেব বিষ্ণুবর্ধন বিক্রমাদিত্য, যিনি ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে হূণদের পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিজয়ের স্মারকরূপে মালব সংবৎ প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাহা করিবার সময়ে তিনি

সর্গগুলির বিষয়বস্তুর শোভনতা সম্পর্কেই মতপার্থক্য আছে। মহাকাব্যটির বিষয়বস্তু হইল শিব ও হিমালয় দুহিতা উমার বিবাহ, কার্তিকেয়র জন্ম। কার্তিকেয় তারক রাক্ষসকে পরাভূত করেন। পণ্ডিতগণের মতে কাব্যটি কবির প্রথম রচনাবলীর অন্যতম। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আধুনিক রুচির নিকট 'কুমারসম্ভবে'র আবেদন 'মেঘদূত' অপেক্ষা অধিক; ইহার কারণ, তাহার সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য, কল্পনার চমৎকারিত্ব ও অনুভূতির অধিকতর প্রগাঢ়তা। কবিতাটিতে বসন্তকালের শোভা ও বিবাহিত প্রেমের আনন্দ হইতে প্রেমাস্পদার মৃত্যুর কঠোর বেদনা পর্যন্ত বিচিত্র ভাব বিধৃত। বিষয়বস্তুটিও দুঃসাহসিকতাপূর্ণ, কারণ ইহা সর্বোচ্চ দেবদেবীর প্রেমকে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পায়। উমার আশ্রমে তরুণ তাপসের আবির্ভাব ও তৎকর্তৃক শিবের নিন্দা এবং তাহার পরেই উমার কঠোর ও ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনা এবং তৎপরে তাপসের পরিচয় আবিষ্কার চমৎকার কল্পনা ও সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচায়ক। কালিদাসের কবিক্ষমতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটিয়াছে তৃতীয় সর্গে শিবের প্রলোভন বর্ণনায় এবং চতুর্থ সর্গে মৃত স্বামীর জন্য রতির বিলাপের মর্মস্পর্শী করুণ চিত্রে। বলা

ইচ্ছাপূর্বক ৬০০ বছরের পুরাতন তারিখ দিয়া তাহা আরম্ভ করেন। ফারগুসনের এই তত্ত্বকে অবশ্য ড. ফ্লীট নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে এমন কোনও বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব ছিল না। অধিকন্তু, ৫৪৪ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বেই মালব নামে পরিচিত একটি কালের অস্তিত্ব ছিল। তাই অধ্যাপক ম্যাক্স ম্যুলরের তত্ত্বের কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। এই প্রসঙ্গে তাঁহার একদা-জনপ্রিয় ও বর্তমানে-পরিত্যক্ত "লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের নবজাগরণ তত্ত্বের" উল্লেখ করা যায়। এই তত্ত্বে বলা হয় যে গুপ্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত সংস্কৃত শিক্ষা ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল এবং কালিদাস ছিলেন এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন।

সাধারণভাবে অবশ্য বিশ্বাস করা হয় যে কালিদাস গুপ্ত বংশের (খৃঃ ৩৮০—৫১৫) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে খ্যাতিমান ছিলেন। কিন্তু এই যুক্তিও দেওয়া হয় যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি লিখিত হইয়াছিল প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (খৃঃ ৪১৫—৪৫৫)। কিন্তু কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে কবি তাঁহার জীবদ্দশায় স্কন্দগুপ্তের (খৃঃ ৪৫৫—৪৬৭) শাসনও দেখিয়া গিয়াছেন। একথা অবশ্য প্রণিধানযোগ্য যে চন্দ্রগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত উভয়েরই 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ছিল, আর কুমারগুপ্তের উপাধি ছিল 'মহেন্দ্রাদিত্য'।

হয় যে এই কবিতাটির আদর্শ হইল রামায়ণ। বাস্তবিকই রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা বনে বসন্তের এক সুন্দর বর্ণনা আছে; বসন্ত সমাগম ও পৃথিবীর প্রাণের পুনর্জাগরণের চমৎকার চিত্র অঙ্কনে উহা কালিদাসকে প্রভাবিত করিতেও পারে। রতির বিলাপের অনুরূপ বিষয়ও রহিয়াছে। বালি নিহত হইবার পর তারা সমান ঐকান্তিকতায় ও চিরায়ত শৈলীর চিহ্নযুক্ত ভাষায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ করে।

রঘুবংশ

'রঘুবংশ' নিঃসন্দেহে এক পরিণত হাতের রচনা। ইহার উপজীব্য সাধারণভাবে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজাদের এবং বিশেষরূপে রামের জীবন বৃত্তান্ত। ঊনবিংশ সর্গে রচিত এই মহাকাব্যটিতে বাল্মীকিরই কাহিনী সুপরিণত কবি কর্তৃক দক্ষতার সহিত পুনরায় কথিত হইয়াছে। সাধারণতঃ বলা হয় যে গ্রন্থটি সংস্কৃত মহাকাব্যের শর্তাদি যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ণ করে। ইহাও সঠিক ভাবেই স্বীকৃত যে 'রঘুবংশ' কবির অসাধারণ শিল্পগুণসম্পন্ন কল্পনাকে সম্পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিয়াছে। ইহাও সত্য যে ইহার ঊনিশটি সর্গের মধ্যে এমন একটি সর্গও নাই যেখানে মনোমুগ্ধকর কোনও চিত্র উপস্থাপিত হয় নাই। কবি সুদীর্ঘ কাব্যটি জুড়িয়া শৈলী ও অভিব্যক্তির মোটামুটি সমান মানসম্পন্ন চমৎকারিত্ব বজায় রাখিয়াছেন। রামের অতীতের বেদনাময় অথচ মধুর স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়া সীতার নির্বাসনের কঠোর আঘাতের জন্য পাঠককে প্রস্তুত করিবার সময়ে কালিদাসের প্রতিভা শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করে। রামের পরবর্তী জীবন নীরব কষ্টভোগের মধ্যে পূর্বেকার জীবন অপেক্ষা অধিকতর বীরত্বপূর্ণ; এই জীবনের চিত্রটি সতর্ক সমালোচকদের নিকট হইতেও দ্ব্যর্থহীন প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

ভারবি : কিরাতার্জুনীয়

ভারবি-র কাল অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে কারণ ৬৩৪ খৃঃ তারিখাঙ্কিত দ্বিতীয় পুলকেশীর বিখ্যাত আইহোলি লেখে কালিদাসের সহিত তাঁহার নামের উল্লেখ আছে। ভারবি একটি মহাকাব্যেরই রচয়িতা—'কিরাতার্জুনীয়'।

ইহার কাহিনীর উৎস মহাভারত। অর্জুন কিরূপে শিবের নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করিলেন, এই কাব্যে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ঊনবিংশ সর্গের এই কাব্যটি অলংকারবহুল শৈলীতে লিখিত হইলেও, মাঝে মাঝে শব্দের ঝংকারের সহিত চিন্তার গভীরতাতেও ('অর্থগৌরব') পূর্ণ। ভারবি কালিদাসের মতো মহান না হইলেও মাঝারি নহেন। তাঁহার কবিতা অধিকতর প্রশান্ত, অধিকতর জ্ঞানভারনত ও রচনাকৌশল সম্পন্ন, কিন্তু উদ্দাম কল্পনাপূর্ণ নহে। ভারবি বর্ণনার ক্ষেত্রে অনন্য। তিনি প্রকৃতি ও নারীর সৌন্দর্য দর্শন ও বর্ণনায় অসাধারণ কুশলী। তাঁহার কবিতায় গীতিধর্মিতার অভাব থাকিলেও, তাঁহার অভিব্যক্তিগুলি সংক্ষিপ্ততা ও গাম্ভীর্য গুণবিশিষ্টতার জন্য এক অনন্য বিস্ময়ের উদ্রেক করিতে সক্ষম হয়।

ভট্টি : রাবণবধ

বিশ্বের সাহিত্যের কোথাও এরূপ একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না যেখানে কবিতা শুধু ব্যাকরণের নিয়মকানুন বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে। দ্বাবিংশ সর্গে রচিত 'ভট্টিকাব্য' বা 'রাবণবধ' চারটি অংশে বিভক্ত যথা—প্রকীর্ণকাণ্ড, প্রসন্নকাণ্ড, অলংকারকাণ্ড ও তিঙন্তকাণ্ড। ইহা একটি মহাকাব্য, রামের জন্ম হইতে রাবণের মৃত্যু পর্যন্ত রামের জীবনেতিহাস ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্যের রচয়িতা ভট্টি মহান বৈয়াকরণ-দার্শনিক ভর্তৃহরি বা সাধারণ ভাবে হরি নামে খ্যাত ব্যক্তি হইতে পৃথক। লেখক নিজেই তাঁহার রচনায় লিখিয়াছেন যে তিনি জনৈক শ্রীধরসেনের অধীনে বলভীতে বাস করিতেন। ইতিহাসে আমরা চারজন ধরসেনের পরিচয় পাই। ইহাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তির মৃত্যু হয় ৬৫১ খৃষ্টাব্দে। তাই ইহা সম্ভব হইতে পারে যে ভট্টি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধ ও সপ্তম শতকের প্রথম চারিপাদের লোক ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভট্টি ভামহ নামক মহান অলংকারশাস্ত্রবিদের পূর্বেকার লোক ছিলেন। ভামহ 'রাবণবধে'র কাব্যগুণের নিন্দা করিয়াছেন।[১] রচনাটি যদিও ব্যাকরণকাব্য

১. কাব্যালংকার ২, ২০।

তথাপি একাধিক স্থানে কবি তাঁহার শিল্প-প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। উদাহরণ হিসাবে কাব্যটির দ্বিতীয়, একাদশ ও দ্বাদশ সর্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কুমারদাস : জানকীহরণ

৫১৭ হইতে ৫২৬ খৃঃ পর্য্যন্ত সিংহলের রাজা বলিয়া কথিত কুমারদাস লক্ষণীয় প্রতিভাসম্পন্ন কবি হিসাবে রাজশেখর কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছেন। ড. কীথ মনে করেন যে কবি 'কাশিকাবৃত্তি' (খৃঃ ৬৫০) অবগত ছিলেন এবং বামনের (খৃঃ ৮০০) নিকট পরিচিত ছিলেন। পঁচিশ সর্গে রচিত তাঁহার কাব্য 'জানকীহরণের' বিষয়বস্তু রামায়ণ হইতে গৃহীত। গ্রন্থের নামেই তাহা বোঝা যায়। কবি কালিদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। উচ্চ স্তরের কল্পনার পরিচয় তিনি দেন নাই বটে, তবুও তাঁহাকে এক বলিষ্ঠ বর্ণনামূলক কবি বলা যায়। তিনি অনুপ্রাসের ভক্ত, তবে এবিষয়েও রীতিমত সতর্ক যাহাতে তাহার বাহুল্যে রচনা কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট না হয়।

মাঘ : শিশুপালবধ

নবম শতকের মহান অলংকারশাস্ত্রবিদ্ আনন্দবর্ধন মাঘের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইনি খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের লোক ছিলেন। ইনি দত্তকসর্বাশ্রয়ের পুত্র এবং বিখ্যাত ব্যাকরণগত রচনা 'ন্যাস' এর লেখক জিনেন্দ্রবুদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১] ন্যাসের তারিখ বলা হয় ৭০০ খৃঃ। মাঘের 'শিশুপালবধ' মহাভারতের এক কাহিনীর ভিত্তিতে কুড়ি সর্গে রচিত কাব্য। তাঁহার রচনাশৈলী অত্যন্ত অলংকারবহুল এবং শব্দের মারপ্যাঁচের জন্য প্রায়ই তিনি অর্থকে বিসর্জন দিয়াছেন। তিনি ভারবির অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনাশৈলীতে ভারবির মতো সম্ভ্রান্ততা নাই। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে অভিব্যক্তি ও চিন্তার প্রচুর বর্ণাঢ্যতা তাঁহার করায়ত্ত। তাঁহার অনুরাগীরা প্রায়শই তাঁহার কবিকল্পনার দুর্লভ ক্ষমতার উল্লেখ করেন। সেই গুণের জন্যই তিনি

১. শিশুপালবধ ২, ১১২।

'ঘণ্টা-মাঘ' অভিধায় অভিহিত হইয়াছেন। সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়ের মাঝখানে সমুন্নত শির এক পর্বতকে কবি তুলনা করিয়াছেন উভয় পার্শ্বে প্রলম্বিত ঘণ্টাদ্বয় যুক্ত একটি হস্তীর সহিত।

শ্রীহর্ষ : নৈষধচরিত

মহাভারতে নল ও দময়ন্তীর চিত্তাকর্ষক কাহিনীটি শ্রীহর্ষের মহৎ সৃষ্টি 'নৈষধচরিত' বা 'নৈষধীয়চরিতে'র মূল বিষয়বস্তু। ইহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে লিখিত। কাব্যটি বাইশটি সর্গে রচিত। কবি ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে খ্যাতিমান পণ্ডিত এবং ব্যাকরণ, অলংকার ও শব্দার্থে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। কালিদাসের ন্যায় মহান ভারতীয় কবিদের রচনার বৈশিষ্ট্যসূচক ব্যঞ্জনাশক্তির পরিচয় না দিলেও, তাঁহার অভিব্যক্তির ক্ষমতা একান্তভাবে চিত্তাকর্ষক। তাঁহার ত্রুটি বলিয়া যাহা আমাদের নজরে পড়ে তাহা এই যে অতিরঞ্জিত বিবৃতির প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। নৈষধচরিতের গুরুত্ব তাহার কাব্য প্রকৃতিতে নিহিত নয়—কাব্যটি ঐতিহ্যগত জ্ঞানের এক ভাণ্ডার এবং পাঠক যাহাতে তাহার মূল্য পরিপূর্ণ রূপে অনুধাবন করিতে পারেন সেই জন্য ইহাও আশা করা হয় যে পাঠকও সে-রূপ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইবেন। আধুনিক পাঠকের প্রায়শই এই শিক্ষার অভাব থাকে এবং কাব্যটিতে তাহার আগ্রহের অভাবের কারণও ইহার দ্বারা বোঝা যায়।

গ. গৌণ মহাকাব্য

জাম্ববতীবিজয় ও পাতাল-বিজয় : পাণিনির রচনা বলা হয়—দুইটি পৃথক রচনা না একই গ্রন্থের দুইটি নাম, সে কথা অজ্ঞাত ; ব্যাকরণগত ভুলভ্রান্তি মুক্ত নহে—লেখক সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক আছে।

বাররুচ কাব্য : পতঞ্জলি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা পাই নাই।

পদ্যচূড়ামণি : বুদ্ধঘোষের (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী নহে) রচনা বলা হয়—দশ সর্গের কবিতা, 'মার'-এর পরাজয় পর্যন্ত বুদ্ধের জীবনী ইহাতে দেখানো হইয়াছে। ললিতবিস্তর ও বুদ্ধচরিতের ভাষ্য হইতে কোনও কোনও বিশদ বিষয়ে কিছুটা পৃথক।

কুন্তেশ্বরদৌত্য : ক্ষেমেন্দ্র কর্তৃক কালিদাসের রচনা বলিয়া কথিত—কুন্তলের সভায় এক দৌত্যের বর্ণনা।

হয়গ্রীববধ : ভর্তৃমেণ্ঠর রচনা, বর্তমানে লুপ্ত—কবি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে মাতৃগুপ্ত-র সময়ের লোক ছিলেন।

পদ্মপুরাণ : খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের রবিষেণ কর্তৃক রচিত—প্রথম তীর্থংকর ঋষভের গৌরবগাথা।

রাবণার্জুনীয় বা আর্জুনরাবণীয় : ভৌমক বিরচিত—সাতাশটি সর্গে ভট্টির ধরনে লিখিত—কার্তবীর্য ও রাবণের মধ্যে সংঘর্ষ অবলম্বনে রচিত।

হরিবংশপুরাণ : খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের জিনসেন কর্তৃক লিখিত—ছেষট্টি সর্গে জিনবাদী পশ্চাৎপটে মহাভারতের কাহিনীর বর্ণনা।

কপ্‌ফণাভ্যুদয় : খৃষ্টীয় নবম শতকের অবন্তীবর্মনের শাসনকালে জনৈক কাশ্মীরী বৌদ্ধ শিবস্বামী বিরচিত—কুড়ি সর্গে লিখিত—অবদানশতকের একটি কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত।

হরবিজয় : খৃষ্টীয় নবম শতকের জনৈক কাশ্মীরী রত্নাকর বিরচিত—শিব কর্তৃক অন্ধক নামক দানবকে হত্যার কাহিনী অবলম্বনে রচিত—পঞ্চাশ সর্গে লিখিত—বাণ ও মাঘের প্রভাব আছে।

রাঘবপাণ্ডবীয় : কবিরাজ কর্তৃক লিখিত, ইনি জয়ন্তপুরীর কাদম্ব কামদেবের (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দ) রাজত্বকালের লোক ছিলেন—তেরটি সর্গে রামায়ণ ও মহাভারত উভয়েরই কাহিনী শ্লেষ যুক্ত শ্লোকের মাধ্যমে যুগপৎ উপস্থাপিত।

মহাপুরাণ : খৃষ্টীয় নবম শতকেব জিনসেন ও গুণভদ্র কর্তৃক লিখিত—দুইটি অংশবিশিষ্ট—আদিপুরাণ ও উত্তরপুরাণ।

পার্শ্বাভ্যুদয় : খৃষ্টীয় নবম শতকের জিনসেন বিরচিত—পার্শ্বনাথের কাহিনী বর্ণনাকালে কবি সমগ্র মেঘদূতকেও তাঁহার কাব্যের অংশীভূত করিয়াছেন।

কাদম্বরীকথাসার : খৃষ্টীয় দশম শতকের নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টের পুত্র অভিনন্দ রচিত—আট সর্গে বাণের কাদম্বরীর কাহিনী বর্ণিত।

যশোধরচরিত : খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পদে বাদিবাজ কর্তৃক চার সর্গে লিখিত—রাজা যশোধরের কাহিনী বর্ণিত। মাণিক্যসেন (কাল অজ্ঞাত) কর্তৃক একই নামে আরেকটি কাব্য লিখিত হইয়াছিল।

কবিরহস্য : খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর হলায়ুধ বিরচিত—রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের প্রশস্তি সংবলিত—ভট্টির শৈলী অনুসরণে লিখিত।

রামচরিত : শতানন্দের (কাল অজ্ঞাত) পুত্র অভিনন্দ প্রণীত।

রামায়ণমঞ্জরী ও ভারতমঞ্জরী : খৃষ্টীয় একাদশ শতকের কাশ্মীরের বহুশাস্ত্রজ্ঞ ক্ষেমেন্দ্র কর্তৃক লিখিত।

হরিবিলাস : খৃষ্টীয় একাদশ শতকের লোলিম্বরাজ প্রণীত—পাঁচ সর্গে কৃষ্ণ কাহিনী বর্ণিত।

শ্রীকণ্ঠচরিত : খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের রুয্যকের এক শিষ্য, কাশ্মীরী মঙ্খ কর্তৃক রচিত—পঁচিশ সর্গে লিখিত—শিব কর্তৃক ত্রিপুর নামক দানবের বিনাশের কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত—কিছুটা ঐতিহাসিক কৌতূহলোদ্দীপক, কারণ কাশ্মীরের জয়সিংহের (খৃঃ ১১২৭—১১৫০) এক মন্ত্রী ও কবির ভ্রাতা অলংকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিশ জন জ্ঞানী ব্যক্তির এক সমাবেশের উল্লেখ আছে—অত্যন্ত অলংকারবহুল শৈলীতে লিখিত, প্রাঞ্জলতার অভাব আছে।

শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য : খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের ধনেশ্বর প্রণীত—চতুর্দশ সর্গে লিখিত—পবিত্র পর্বত শত্রুঞ্জয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা।

ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত : ১০৮৮—১০৭২ খৃষ্টাব্দের হেমচন্দ্র প্রণীত—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা, ইহার সপ্তম কাণ্ডটির নাম 'জৈন-রামায়ণ', দশমটির নাম 'মহাবীরচরিত' তাহাতে মহাবীরের জীবনকাহিনী বিবৃত এবং ইহার পরিশিষ্টাংশ—'পরিশিষ্টপর্ব' রূপকথা ও কাহিনীর আকর বিশেষ।

ধর্মশর্মাভ্যুদয় : হরিচন্দ্র (কাল অজ্ঞাত) প্রণীত—পঞ্চদশ তীর্থংকর ধর্মনাথের জীবনীর ভিত্তিতে একুশ সর্গে লিখিত।

নেমিনির্বাণ : খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাগ্‌ভট বিরচিত—পঞ্চদশ সর্গে লিখিত—নেমিনাথের জীবনী সংক্রান্ত।

বালভারত : খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের অমরচন্দ্র প্রণীত—পর্ব অনুযায়ী মহাভারতের কাহিনী লইয়া রচিত।

পাণ্ডবচরিত্র ও মৃগবতীচরিত্র : খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের দেবপ্রভসূরি প্রণীত—প্রথমটি অষ্টাদশ সর্গে এবং দ্বিতীয়টি উদয়নের কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত।

পার্শ্বনাথচরিত : খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের ভাবদেবসূরি প্রণীত।

সহৃদয়ানন্দ : খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের কৃষ্ণানন্দ প্রণীত—পঞ্চাশ সর্গে নলের উপাখ্যান বর্ণনা।

নলাভ্যুদয় : খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের বামনভট্ট বাণ প্রণীত—আট সর্গে নলের কাহিনী।

হরিবংশ : খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের সকলকীর্তি ও তাঁহার শিষ্য জিনদাস প্রণীত।

রসিকাঞ্জন : খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর রামচন্দ্র প্রণীত—দ্বর্থবোধক শ্লেষের মাধ্যমে প্রেম ও তপশ্চর্যার দুইটি ভাব বর্ণিত।

পাণ্ডবপুরাণ : খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শুভচন্দ্র প্রণীত—'জৈন মহাভারত' নামে অভিহিত।

রাঘবনৈষধীয় : হরদত্তসূরি (কাল অজ্ঞাত) কর্তৃক লিখিত—দ্ব্যর্থবোধক শ্লেষের মাধ্যমে রাম ও নলের উপাখ্যান বর্ণনা।

রাঘবপাণ্ডবীয়যাদবীয় : বিজয়নগরের প্রথম বেঙ্কটের (খৃঃ ১৫৮৬—১৬১৪)

আশ্রিত চিদাম্বর কর্তৃক লিখিত—ত্রিবিধ অর্থব্যঞ্জনার মাধ্যমে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের কাহিনী বর্ণনা ।।

গ্রন্থপঞ্জী

Keith, A. B.	*A History of Sanskrit Literature*
Macdonell, A. A.	*A History of Sanskrit Literature*
Winternitz, M.	*A History of Indian Literature*, Vol. II
Dasgupta, S. N. and De, S. K.	*History of Sanskrit Literature*, Vol. I
Krishnamachariar, M.	*Classical Sanskrit Literature*

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নাটক

ক. সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। পণ্ডিতগণের মধ্যে এ বিষয়ে যেরূপ বিভিন্ন মতামত দেখা যায় তাহাতে একটির সহিত অপরটির মিল ঘটানো দুঃসাধ্য। সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে এযাবৎ জ্ঞাত প্রাচীনতম গ্রন্থ যে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' তাহা অনস্বীকার্য। নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক বলিয়াই সাধারণ ভাবে স্বীকার করা হয়। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে গ্রন্থটি 'সূত্র'-ধরনের কোনও এক মৌলিক রচনাভিত্তিক সংকলন। এই গ্রন্থের এক কাহিনী অনুযায়ী ব্রহ্মা আবৃত্তির জন্য ঋগ্‌বেদ হইতে কিছু অংশ, সামবেদ হইতে সংগীত, যজুর্বেদ হইতে অঙ্গভঙ্গি এবং অথর্ববেদ হইতে ভাবাবেগ গ্রহণ করিয়া নাটক সৃষ্টি করেন। তাই নাটক পঞ্চম বেদ রূপে পরিচিত। শিব ও পার্বতীর নিকট হইতে তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্য আহৃত হয়, বিষ্ণু দেন রীতি। উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে নাটক অভিনীত হইত ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে, যেখানে উক্ত ভরতের পুত্র ও শিষ্যগণ গন্ধর্ব অপ্সরাদিগের সহিত অভিনয়ে অংশগ্রহণ করিতেন। প্রথম যে দুইটি নাটক অভিনীত হইয়াছিল সেই দুইটির নাম 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ', উভয় নাটকই স্বয়ং ব্রহ্মা কর্তৃক লিখিত।

গ্রীক হইতে উদ্ভবের তত্ত্ব

এক সময়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে ভারতীয় নাটকের গ্রীক উৎস সংক্রান্ত তত্ত্বের বহু অনুগামী দেখা গিয়াছিল।১ তাহার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন অধ্যাপক

১. এই ইঙ্গিত আসিয়াছিল অধ্যাপক ভেবারের নিকট হইতে; কিন্তু অধ্যাপক পিশেল

উইণ্ডিশ (১৮৮২)। তিনি গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকের মধ্যে বহু লক্ষণীয় সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন এবং এই ভিত্তির উপরে তাঁহাব তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন যে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর গ্রীকদের সহিত ভারতীয়দের দীর্ঘকাল যোগাযোগ ছিল এবং অদ্যাপি বিদ্যমান পুরাতন কোনও সংস্কৃত নাটকই খৃষ্ট-পূর্ব কালের নহে। অতএব তাঁহার মতে বিভিন্ন অঙ্কে শ্রেণীবিভাগ, স্বস্তিবাচন ও উপসংহার, নটদের প্রবেশ ও প্রস্থানের ভঙ্গি, 'যবনিকা' শব্দটি, বিষয়বস্তু ও তাহার প্রয়োগবিন্যাস, পরিচালনার বৈচিত্র্য, বিদূষক, প্রতিনায়ক প্রভৃতির ন্যায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র—সকল বিষয়ই গ্রীক উৎসের ইঙ্গিতবাহী। সীতাবেঙ্গা গুহায় একটি গ্রীক নাট্যমঞ্চের ভারতীয় রূপ আবিষ্কারের দ্বারা এই তত্ত্বের আরও সমর্থন পাওয়া যায়।[১] কিন্তু এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কারণ পার্থক্যের বিষয়গুলিও সমধিক। দেশ, কাল এবং ক্রিয়া তিনটির সমন্বয়ের অভাব সংস্কৃত নাটককে গ্রীক নাটক অপেক্ষা এলিজাবেথীয় যুগের নাটকেরই কাছাকাছি টানিয়া আনিয়াছে। গ্রীক নাটকে দেশ, কাল ও ক্রিয়া—এই তিনের ঐক্য অত্যাবশ্যক। সংস্কৃত নাটকে দুইটি অঙ্কের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কয়েক বৎসরও হইতে পারে (যথা, ভবভূতির 'উত্তররামচরিত': তাহাতে প্রথম দুইটি অঙ্কের মধ্যে দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধান)। সংস্কৃত নাটকের একটি নির্দিষ্ট অঙ্কেই একটি মাত্র স্থানের ঘটনা উপস্থাপিত হয়। উদাহরণস্বরূপ 'শাকুন্তলে'র ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা যায় রাজা দুষ্যন্তের প্রাসাদের দৃশ্য, সপ্তম অঙ্কে দেখা যায় হিমালয়ের চূড়ায় ঋষি মারীচের আশ্রমের দৃশ্য এবং তাহার প্রথম অংশে আছে রাজার গগনপথে যা.া। 'যবনিকা' শব্দটি সম্পর্কে অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন যে উহার প্রবর্তন হইয়াছিল পরবর্তী কালে, শব্দটি পারসিক ট্যাপেস্ট্রি বা কারুকার্যময় চিক-জাতীয় বস্ত্রাদিরই ইঙ্গিত করে, গ্রীক কোনও কিছুকে নহে।

ইহার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন।

১. On the antiquites of Ramgarh Hill, District of Sarguja—IA, Vol. II.

অপর পক্ষে, কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যেভাবে ইয়োরোপীয় নাটকের উদ্ভবের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, সেইভাবেই সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব নির্ধারণ করিতে চাহেন। তাই যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে প্রথম সংস্কৃত নাটক যেহেতু ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে (ইয়োরোপের মে-পোল নৃত্যের সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়) অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, সেই হেতু সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব শীতের বিদায়ের পর বসন্তের বিবিধ উৎসবের সহিত যুক্ত করা উচিত। কিন্তু এই তত্ত্বটি বাতিল হইয়াছে; কারণ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন যে পূর্বোক্ত ইন্দ্রধ্বজ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বর্ষার শেষে।

রিজওয়ের অভিমত

অধ্যাপক রিজওয়ে মৃত পূর্বপুরুষগণের পূজার সহিত ভারতীয় নাটকের উদ্ভবকে জড়িত করিয়াছেন। কিন্তু এই তত্ত্বটি ভারতীয় আর্যদিগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। তাহাদের মৃত-সংকার অনুষ্ঠান অত্যন্ত অনাড়ম্বর।

কৃষ্ণ-পূজা হইতে উদ্ভব

কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি কৃষ্ণ-পূজাকে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভবের কারণ বলিয়া মনে করেন। এইভাবে সংস্কৃত নাটকে সৌরসেনী প্রাকৃতের যে ভূমিকা আছে তাহা সহজেই ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু এই তত্ত্বটির সহিত কালাসঙ্গতির প্রশ্ন জড়িত; কারণ ইহা প্রমাণ সাপেক্ষ যে কৃষ্ণ-সংক্রান্ত নাটকগুলিই প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটক।[১]

পিশেলের অভিমত

অধ্যাপক পিশেল এই তত্ত্ব উপস্থিত করিয়াছেন যে সংস্কৃত নাটক মূলতঃ ছিল পুতুল নাচ। সংস্কৃত নাটকে মঞ্চ-ব্যবস্থাপককে বলা হয় সূত্রধার এবং

১. একই ভাবে প্রমাণ করা যায় যে ভারতীয় নাটকের উদ্ভবে বিষ্ণু-পূজা, শিব-পূজা ও রাম-পূজা সংক্রান্ত তত্ত্বও গ্রহণ যোগ্য নহে।

মঞ্চ-ব্যবস্থাপকের অব্যবহিত পরে প্রবেশ করিতে হয় তাহার সহকারী স্থাপককে এবং কাহিনীর প্রতিপাদ্য, নাটকের নায়ক অথবা মূলবস্তুকে যথাস্থানে স্থাপিত করিতে হয় তাহাকেই। সংস্কৃত নাটকে পুতুলের উল্লেখ প্রায়শই আছে; তাহাদের নাচানো যাইত কিংবা চলাফেরা করানো যাইত এবং এমন কি তাহাদের কথাও বলানো যাইত। সীতার রূপ পরিগ্রাহী এরূপ একটি সবাক পুতুল রাজশেখরের নাটকে দেখা যায়। ভবভূতির 'উত্তরামচরিতে' ছায়া-সীতার কাহিনীটি প্রাচীন ভারতের পুরাতন ছায়া-নাটকের কথা স্মরণে আনে। সংস্কৃত নাটক সম্পর্কে বহু বিষয়, যথা গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ তথা ভাষাবৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা এই তত্ত্বটি উপস্থিত করিতে পারে না।১

উদ্ভবেব সূত্র বৈদিক যুগে

এই বিষয় সম্পর্কে আরেকটি তত্ত্বে বলা হয় যে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব অনুসন্ধান করা উচিত ঋগ্‌বেদেব সংবাদসূক্তসমূহে। এই গাথা-স্তোত্র সংখ্যায় প্রায কুড়িটি, তাহাদের সারমর্ম লক্ষণীয়ভাবে নাটকীয়।২ সামবেদস্থ এই স্তোত্রগুলিব নির্দিষ্ট কোনও আচারগত প্রয়োগ নাই; মনে হয়, যজ্ঞের হোতাদের মনস্তুষ্টিব জন্য দীর্ঘ যজ্ঞকালের বিরতির (পরিপ্লব) মধ্যে ইহা আবৃত্তি করা হইত। কিন্তু স্তোত্রগুলি গাথারূপে ব্যবহৃত হইত কি না (অধ্যাপক পিশেল ও গেল্ডনার যেরূপ মনে করেন); কিংবা নৃত্যগীতাদি সহ সত্যকার মঞ্চ-পরিচালনা ও অভিনয়ের সহিত নিয়মিত আচাবগত নাটকরূপে ব্যবহৃত হইত কি না (অধ্যাপক শ্রোয়েডারের মতানুযায়ী); অথবা সর্বশেষে, কবিতাগুলিকে একটি সমগ্রতায় গ্রথিত করিবার উদ্দেশ্যে গদ্যের মিশ্রণসহ, কথোপকথনের প্রাধান্য সম্পন্ন বিবরণ-মূলক কাহিনীরূপে ব্যবহৃত হইত কিনা (অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গের মত), সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ আছে।৩

১. অধ্যাপক হিলেব্রাণ্ডট্ যুক্তি দেখাইয়াছেন অধ্যাপক পিশেলের তত্ত্ব মানিয়া লওযা যায় না। কাবণ পুতুল নাচেব কথায় ন ূকের প্রাক্ অস্তিত্বেব কথা ধবিযা লইতে হয়।

২. ঋগ্বেদ ॥ ১।১৬৫, ১৭০ ও ১৭৯; ৩।৩৩; ৪।১৮; ৭।৩৩; ৮।১০০; ১০।১১, ২৮, ৫১—৫৩, ৮৬, ৯৫ ও ১০৮ ইত্যাদি।

৩. অধ্যাপক হার্টেল 'সুপর্ণাধ্যায়'-এব মধ্যে এক পূর্ণাঙ্গ নাটক আবিষ্কাব কবিযাছেন।

উপসংহার

বিস্ময় ইহা দেখা গিয়াছে যে নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভারতও এবিষয়ে ব্যতিক্রম নহে। যে যজ্ঞকালীন নাট্যানুষ্ঠান ভারতীয় নাটকের প্রাচীন সূত্রপাতকে চিহ্নিত করে, তাহার কথা স্মরণে রাখিয়া আমরা সুস্পষ্টরূপে দাবি করিতে পারি যে সংস্কৃত নাটক ভারতীয় মনের একটি ফল। ভারতীয় মন জীবনকে দেখিয়াছে তাহার বৈচিত্র্যময় সমস্ত দিক হইতে এবং ইহা বিকাশের বহু স্তর অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে; সে-মন তাহার রূপক সংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রভাবিত হইয়াছে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের দ্বারা অথবা অন্য কোনও বহিরাগত বিষয়ের দ্বারা, তবু তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখিয়াছে। তাই কোনও একটি তত্ত্ব তাহার সমস্ত চারিত্রবৈশিষ্ট্যকে যথাযথ রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারে না এবং সেই হেতু সংস্কৃত নাটকের উদ্ভবের বিচারে যে-কোন একটি তত্ত্বকে বাছিয়া লওয়ার চেষ্টা হইতে বিরত থাকা উচিত।

খ. সংস্কৃত নাটকের বৈশিষ্ট্য

রসের প্রাধান্য

ভারতীয় চিন্তানায়কদের মতে কবিকুলশ্রেষ্ঠই নাট্যকার। সংস্কৃত নাটকের সকল দিকের বিবর্তন ঘটিয়াছে বিশেষরূপে এক ভারতীয় পরিমণ্ডলে অন্তর্নিহিত নান্দনিক বোধসহ সংস্কৃত নাট্যকারগণ চরিত্র কিংবা বিষয়বস্তু অপেক্ষা রসাভিব্যক্তিকেই বেশী গুরুত্ব দিয়াছিলেন। তাই সংস্কৃত নাটকগুলি চরিত্রগতভাবে ছিল অত্যন্ত ভাববাদী ও আবেগ-প্রবণ। কাব্য ও আবেগের স্পর্শে সংস্কৃত নাটক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল এবং মানব চরিত্রের সৌন্দর্য ও গভীরতা প্রকাশে তাহার উচ্চতর ও অধিকতর কাব্যগুণসম্পন্ন স্বাভাবিকতা ছিল চিত্তাকর্ষক। সংস্কৃত নাটকে বিশেষ ব্যক্তিত্ব-আরোপিত চরিত্র অপেক্ষা এক একটি বিশিষ্ট চরিত্র সৃষ্টির জন্য দায়ী ভাবাবেগের প্রাধান্য। বলা হয়, চরিত্রগুলি প্রায়শই গতানুগতিক, মৌলিক নহে। যদিও স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন নাট্যকারগণের হাতে ভাববাদী সৃষ্টি সক্রিয় অভিনয় ও চরিত্ররূপায়ণকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তৎসত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাট্যকারগণ এরূপ অসামান্য চরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন যেগুলি আদৌ অবাস্তব নহে। এইরূপে 'মৃচ্ছকটিকে'র চারুদত্ত ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর দুষ্যন্ত নিছক বিশেষ ধরনের চরিত্র নহে। অনুরূপভাবেই শূদ্রকের নাটকে শকার ও বীট চরিত্রদুইটিও চমৎকার চিত্রিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকসমূহ মাঝে মাঝে বাস্তবতার স্পর্শে উদ্ভাসিত হইলেও, ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, নাটকীয় সক্রিয়তা বা চরিত্রের প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য কাব্যগুণকে কখনই বিসর্জন দেওয়া হয় নাই। আধুনিক মান৺.ও অবশ্য অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকই নাট্যকাব্যরূপে গণ্য হইবে। কোনও কোনও নাট্যকারের ক্ষেত্রে মনে হয়, রসগত ও কাব্যগুণ সম্পন্ন বিষয় চিত্রিত করিবার ক্রমবর্ধমান

প্রচেষ্টায় নাটকীয়তার বোধটি তাঁহারা হতাশাজনকভাবে হারাইয়াছেন ; ইহাও সত্য যে কোন কোন খ্যাতিমান নাট্যকারের নাটকে নাট্যগুণের অভাবের জন্য দায়ী গীতিকাব্য বা মহাকাব্যধর্মী বিষয় নির্বাচন—যাহা আদৌ নাট্যরস সৃষ্টির যোগ্য নহে। তবুও একথা আমরা বলিতে পারি না যে সংস্কৃত নাট্যকারগণ নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিলেন। একথা বরং সুস্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে যে নাট্যকাহিনীর অবশ্যই পাঁচটি 'সন্ধি'ক্ষণ থাকিতে হইবে, যথা : মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ, ও নির্বহণ। অধিকন্তু সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই নির্ধারিত করিয়াছেন যে নাটকে রস ও বিষয়বস্তু বা নাট্যকাহিনীর এক ত্রুটিহীন অঙ্গাঙ্গী মিলন ঘটিবে। নাট্যকাহিনীর ক্রমান্বিত ও সুসংবদ্ধ বিকাশকে বিসর্জন দিয়া রসের মাত্রাতিরিক্ত অভিব্যক্তি এবং রসপ্রবাহকে ব্যাহত করিয়া কাহিনীর তুচ্ছ বিষয়কে অতিরিক্ত বিশদ করার প্রবণতাকে সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। ✓ নাটকের প্রধান রস হিসাবে শৃংগার, বীর বা শান্তরসকে গ্রহণ করাই ছিল সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে প্রচলিত রীতি, তাহার সহিত থাকিত গুরুত্ব অনুযায়ী অন্যান্য সমস্ত রস। এখানে আরও বলা প্রয়োজন যে কোনও কোনও চিন্তাবিদের মতে উপরোক্ত রীতিকে অযথা ভক্তি করা উচিত নহে, নবরসের যে কোনও একটি রসই নাটকের প্রধান রস হইতে পারে।✓

ট্রাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটকের অভাব

সমালোচকগণ প্রায়শই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে সংস্কৃত নাটকে ট্রাজেডি বা বিয়োগান্তভাবের অভাব লক্ষণীয়রূপে প্রতীয়মান। ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে এই কথা বলিয়া যে, যাহাকে 'বিপ্রলম্ভ শৃংগার' বলা হয় তাহা অপেক্ষাকৃত দুর্লভ 'করুণ' নাটকের অভাব ভালোভাবেই পূর্ণ করে ; এই 'করুণ' রস অতি সাধারণ নাটকসমূহের একটিমাত্র শ্রেণীরই প্রধান রস। কিন্তু ইহাও সত্য যে সংস্কৃত নাটকে কখনও বিয়োগান্ত কোনও বিপর্যয় দেখা যায় না এবং তাহার কারণ পাওয়া যাইবে এই চিন্তাধারার মধ্যে যে ইহার ফলে রসচ্যুতি ঘটে। তাই মৃত্যু, হত্যা, যুদ্ধ, বিপ্লব ও

যে-কোনও অশোভন ঘটনা, যাহা নন্দনতাত্ত্বিক তৃপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটায়, তাহা মঞ্চে প্রদর্শন নিষিদ্ধ। সংস্কৃত নাটক সাধারণতঃ জীবনের রাজপথ ধরিয়াই অগ্রসর হয় এবং বিশ্বাস করে যে কঠোর বাস্তব মনকে মহিমান্বিত করিতে পারে না, বরং রোমান্টিক আবহাওয়াকে বিঘ্নিত করে। তাই বিয়োগান্ত পরিণতির স্থলে সেখানে সূক্ষ্মতর রসানুভূতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং বিয়োগান্ত নাটক অপেক্ষাকৃত স্বল্প উন্নত বহিয়া গিয়াছে। অপর পক্ষে এই উক্তিটির মধ্যেও সত্য নিহিত আছে যে সংস্কৃত নাটকে আনন্দময় মিলনের শর্ত আরোপের ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহাতে বিয়োগান্ত ভাবের মূল্য খর্ব হইয়াছে।

নায়ক।

সংস্কৃত নাটকে বস সৃষ্টির মধ্যেই প্রধান আগ্রহ নিহিত বলিযা নাট্যকারের পক্ষে কোনও একটি জনপ্রিয় বিষয়বস্তু সংবলিত নাট্যকাহিনী গ্রহণ করাই সুবিধাজনক। নাটকেব নায়ককে অবশ্যই 'ধীরোদাত্ত' চরিত্রের উচ্চবংশসম্ভূত সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি হইতে হইবে। সেই নায়ক হইবে স্বর্গীয় কিংবা পার্থিব বীব। সংস্কৃত নাটকে আমরা কখনও কখনও মরজগতের মানুষের পাশাপাশি দেবতাগণকেও দেখিতে পাই এবং এইভাবে যথার্থ রোমান্টিক আবহাওয়া সৃষ্টির মাধ্যমে নাট্যকাবেব কল্পনাকে প্রচুব সুযোগ দেওযা হয়।

নৈতিকতা ও নাটক

ভারতীয় সাহিত্যেব অন্য সব শাখাব মতোই সংস্কৃত নাটকেব এক ধর্মীয় ভিত্তি আছে এবং নৈতিক ও ধর্মীয় বিধি লঙ্ঘন করে এরূপ কোন কিছুই সংস্কৃত নাটকে পরিবেশিত হয় নাই।

ব্যঙ্গ ও প্রহসন

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রযোজন যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে প্রহসনমূলক রচনার অভাব নাই। 'চতুর্ভাণী'[১] এক চারিটি একাঙ্ক স্বগতোক্তিমূলক

১. ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত চারটি নাটক হইল : উভয়াসারিকা, পদ্মপ্রভৃতক,

নাটকের আবিষ্কার ব্যঙ্গাত্মক ও প্রহসনমূলক রচনায় ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাট্যকারদের ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে। এই চারিটি নাটক একই ধরনের, ইহাতে বৈচিত্র্য, ব্যঙ্গ, কৌতুকাবহ ঘটনা ও অবাধ কথ্য ভঙ্গি উপস্থাপিত হইয়াছে। এরূপ নাটকের কাহিনী সামান্য কিন্তু সেই সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যেই আছে বহু বৈচিত্র্য। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ব্যঙ্গাত্মক ও কৌতুককর চিত্র, যথা —নভোলোকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি কবি, কপর্দকশূন্য অক্ষম পুরুষ, বিশুষ্কা প্রণয়িনী, রাজসভার বারাঙ্গনাকে বুদ্ধের ভাষায় সান্ত্বনাদানরত ভিক্ষুক, কৃত্রিম-ভঙ্গিসর্বস্ব বৈয়াকরণ, ভণ্ড বৌদ্ধ প্রভৃতি—সত্যই উপভোগ্য। এইরূপ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'বিট'-এর উদ্ভব খুঁজিয়া পাওয়া যায় 'চারুদত্ত' ও 'মৃচ্ছকটিকে'র মতো প্রাচীন নাটকে।[1] একথা সত্য যে পরবর্তী কালের 'ভাণে' তাহার জৌলুস অনেকখানিই সে হারাইয়াছে এবং উপস্থিত হইয়াছে স্থূলতম অর্থে এক প্রণয়প্রার্থী রূপে; পরবর্তী ভাণগুলি নিতান্তই সাহিত্যিক প্রচেষ্টা, তাহাতে বৈচিত্র্য নাই, প্রাচীন ভাণের বৈশিষ্ট্য যে স্বাভাবিক মানবিক গুণসম্পন্ন মৃদু উপহাস, তাহা নাই। ভাণ ছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় প্রহসনমূলক সাহিত্যের আরেকটি ধারা আছে, ইহা ভাণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাহা হইল প্রহসন। ইহাও নিঃসন্দেহে ভাণের মতোই শিল্পগুণসমৃদ্ধ। প্রহসন ও ভাণের মধ্যে পার্থক্য এই যে প্রথমটিতে যেখানে কৌতুক ও ব্যঙ্গের অধিকতর সুযোগ, শেষোক্তটিতে সেখানে আদিরসাত্মক ভাবের প্রাধান্য আছে।

ধূর্তবিটসংবাদ ও পাদতাড়িতক। অনুমিত রচয়িতা যথাক্রমে বররুচি, শূদ্রক, ঈশ্বরদত্ত ও শ্যামিলক। নাটকগুলিতে একই প্রকার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং অনুমান করা হয় যে এই চারিটি নাটক ও পরবর্তীকালের 'ভাণ'গুলির নমুনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান যথেষ্ট। খুব সম্ভবতঃ এই ভাণগুলি উচ্চাঙ্গ সংস্কৃত নাট্যরচয়িতাদের সমসাময়িক।

গ. সংস্কৃত নাটকের শ্রেণীবিভাগ

রূপক ও উপরূপক

প্রারম্ভেই বলা প্রয়োজন যে ইংরাজী Drama-র সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'রূপক', 'নাটক' নহে। শেষোক্তটি প্রথমটিরই একটি রূপভেদ এবং প্রথমোক্তটির পরিধি আরও ব্যাপক। সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ব-বিষয়ের লেখকগণ সংস্কৃত নাটককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) মুখ্য (রূপক) ও (২) গৌণ (উপরূপক)। প্রতিটি রূপের ভিন্ন ভিন্ন ধরন বিভিন্ন পণ্ডিতগণের মত অনুযায়ী পৃথক। সংস্কৃত নাটকের দুইটি ধরনের বিভিন্ন রূপের নিম্নলিখিত তালিকাটি বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণে' প্রদত্ত হইয়াছে:

১. মুখ্যরূপ: (ক) নাটক (যথা, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল), (খ) প্রকরণ (যথা, ভবভূতির মালতীমাধব), (গ) ভাণ (যথা, বৎসরাজের কর্পূরচরিত), (ঘ) ব্যায়োগ (যথা, ভাসের মধ্যমব্যায়োগ), (ঙ) সমবকার (যথা, বৎসরাজের সমুদ্রমথন), (চ) ডিম (যথা, বৎসরাজের ত্রিপুরদাহ), (ছ) ঈহামৃগ (যথা, বৎসরাজের রুক্মিণীহরণ), (জ) অঙ্ক অথবা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক (যথা, শর্মিষ্ঠাযযাতি), (ঝ) বীথি (যথা, মালবিকা), এবং (ঞ) প্রহসন (যথা, মহেন্দ্রবিক্রমবর্মনের মত্তবিলাস)।

২. গৌণরূপ: (ক) নাটিকা (যথা, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী), (খ) ত্রোটক (যথা, কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়), (গ) গোষ্ঠী (যথা, রৈবতমদনিকা), (ঘ) সট্টক (যথা, রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী), (ঙ) নাট্যরাসক (যথা, বিলাসবতী), (চ) প্রস্থান (যথা, শৃংগারতিলক), (ছ) উল্লাপ্য (যথা, দেবীমহাদেব), (জ) কাব্য (যথা, যাদবোদয়), (ঝ) প্রেঙ্খন (যথা, বালিবধ), (ঞ) রাসক (যথা, মেনকাহিত), (ট) সংলাপক (যথা, মায়াকাপালিক), (ঠ) শ্রীগদিত (যথা, ক্রীড়ারসাতল), (ড) শিল্পক (যথা, কনকাবতীমাধব), (ঢ) বিলাসিকা (সাহিত্যদর্পণে এ-জাতীয় রচনার কোনও উল্লেখ নাই), (ণ) দুরমল্লিকা (যথা, বিন্দুমতী), (ত) প্রকরণিকা

(সাহিত্যদর্পণে কোনও রচনার উল্লেখ নাই), (থ) হল্লীশ (যথা, কেলিরৈবতক) ও (দ) ভাণিকা (যথা, কামদত্তা) ।১

১. যে সমস্ত রচনার পাশে লেখকের নামোল্লেখ আছে, সেইগুলি বর্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং পাওয়া যায়। সাহিত্যদর্পণের লেখক অন্য রচনাগুলির নামোল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, বর্তমানে এগুলির অস্তিত্ব আছে বলিয়া জানা যায় না ।

ছন্দঃ

ব্রাহ্মণগুলির কোনও কোনটিতে বৈদিক ছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাঙ্খ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ও ঋগ্‌বেদ প্রাতিশাখ্যের শেষ পটলে, বিশেষত সামবেদের নিদানসূত্রে বৈদিক ছন্দের উল্লেখ আছে। কাত্যায়নের 'অনুক্রমণী'তেও বৈদিক ছন্দের আলোচনা দেখা যায়। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র বৈদিক ছন্দের প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু উহা বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে রচিত এবং উহাতে সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রও আলোচিত হইয়াছে।

৬. জ্যোতিষ

বৈদিক যাগযজ্ঞের সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সম্বন্ধ অতি নিকট। বিশেষ বিশেষ তারিখে চন্দ্রসূর্যের অবস্থান অনুযায়ী যজ্ঞাদি আরম্ভ ও সম্পন্ন হইত। সেই কারণে জ্যোতিষের চর্চা ঋগ্‌বেদের কাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। জ্যোতিষ কাল-বিজ্ঞান-শাস্ত্র এবং গণিতবিজ্ঞান সাপেক্ষ। ভারতবর্ষে গণিত জ্যোতিষের অংশ মাত্র, জ্যোতিষের আশ্রয় ব্যতীত স্বাধীনভাবে গণিতের কোনও পরিপুষ্টি হয় নাই। ঋগ্‌বেদের বহু স্থানে গণিতের সাধারণ প্রণালী বিবৃত হইয়াছে এবং ছান্দোগ্য উপনিষদেও জ্যোতিষ ও গণিতালোচনা দৃষ্ট হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষগ্রন্থাদির মধ্যে লগধমুনির ঋগ্‌বেদীয় বেদাঙ্গজ্যোতিষ ও শেষমুনির যজুর্বেদীয় বেদাঙ্গজ্যোতিষ বিদ্যমান আছে।

গ. উপাঙ্গ বা পরিশিষ্ট

বেদাঙ্গ ব্যতীত বেদাধ্যয়নের আনুষঙ্গিক বহু গ্রন্থ আছে। সে-গুলিকে উপাঙ্গ বা পরিশিষ্ট বলা যায়। ব্যাকরণ বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত কিন্তু 'প্রাতিশাখ্য' বৈদিক ব্যাকরণের পরিশিষ্ট। উপাঙ্গের ভিতর বেদের পাঠের সঠিক উচ্চারণ নির্ণয়কারী পদপাঠ, ঘনপাঠ, জটাপাঠ প্রভৃতি উল্লিখিত হয়। ইহা ব্যতীত ঋগ্‌বেদের কোন্ সূক্ত কোন্ ঋষিকৃত তাহা নির্দেশ করিবার জন্য 'আর্ষানুক্রমণী', কোন্ ঋকের কোন্ দেবতা তাহা নির্দেশ করিবার জন্য 'দেবানুক্রমণী', এবং কোন্ সূক্তের কোন্ ছন্দঃ তাহা 'ছন্দোনুক্রমণী'তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কত্যায়নকৃত 'সর্বানুক্রমণী'তে ঐ সকল অনুক্রমণীগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, এবং সম্ভবত সেই কারণেই তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত।

'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে সকল সূক্তের সকল ঋকের দেবতাদের নাম আছে। 'নৈগমপরিশিষ্ট' গ্রন্থে একার্থবাচক শব্দগুলির সমাবেশ দেখা যায়। 'প্রবরাধ্যায়' গ্রন্থে এক বংশীয় প্রধান প্রধান ঋষির নাম প্রদত্ত হইয়াছে। 'চরণব্যূহ' গ্রন্থে বেদের প্রত্যেক শাখার নাম ও যে যে প্রদেশে ঐ শাখাগুলি প্রচলিত তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া পরিগণিত।

গ্রন্থপঞ্জী

জাহ্নবীচরণ ভৌমিক	সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস
Winternitz, M.	*A History of Sanskrit Literature*, Vol. 1
Majumdar, R. C. (ed.)	*The Vedic Age*

'অনর্ঘরাঘব'. রচনা করেন প্রায় খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রারম্ভে। নাটকটি সাত অঙ্কে রচিত। খাঁটি অর্থে মুরারীকে নাট্যকার অপেক্ষা বরং এক মার্জিত কবি বলা যায়। তাঁহার সম্পর্কে বলা যায় যে তিনি অবক্ষয়ী সংস্কৃত নাট্যকারদের বিশিষ্ট লক্ষণসম্পন্ন। নাটকটিকে কাব্য সমালোচনা ও ব্যাকরণগত শিক্ষার মানস্বরূপ গণ্য করা হয়।

রাজশেখর : তাঁহার নাটকসমূহ

রাজশেখর ছিলেন কনৌজের রাজা মহেন্দ্রপালের স্বনামধন্য শিক্ষক। বহু রচনার মধ্যে রাজশেখর চারটি নাটকও রচনা করিয়াছেন। 'বালরামায়ণ' দশ অঙ্কের নাটক। তাহার উপজীব্য রামের জীবনেতিহাস। 'বালভারত' একটি অসম্পূর্ণ নাটক, ইহার মাত্র দুইটি অঙ্কই পাওয়া যায়। 'কর্পূরমঞ্জরী' চার অঙ্কের নাটক (সট্টক), প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। ইহাতে কুন্তলের এক রাজকুমারীর জন্য রাজা চন্দ্রপালের প্রেমের সুকঠিন উত্থান-পতন, রাণীর ঈর্ষা ও তার ফলস্বরূপ বাধা, প্রণয়ীযুগলের গোপন সাক্ষাৎ ও পরিণামে বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'ও চার অঙ্কের নাটক। ইহাতে রাজা বিদ্যাধর ও লাট-এর রাজা চন্দ্রবর্মনের কন্যা রাজকুমারী মৃগাঙ্কবতীর গোপন বিবাহ প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজশেখরের রচনাশৈলী অত্যন্ত কৃত্রিম কিন্তু নাট্যকার নিজেকে বিরাট কবি বলিয়া দাবি করেন।

ক্ষেমীশ্বর : চণ্ডকৌশিক

ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' পাঁচ অঙ্কের নাটক। লেখক নাটকটি কনৌজের রাজা মহীপালের জন্য রচনা করেন। রাজা মহীপাল সিংহাসনারোহন করেন ৯১৪ খৃষ্টাব্দে। এই নাটকের কাহিনী হইল রাজা হরিশ্চন্দ্র ও ঋষি বিশ্বামিত্রর বিখ্যাত উপাখ্যান। এই নাটকটির রচনাশৈলীও অত্যন্ত কৃত্রিম।

দামোদরমিশ্র : মহানাটক

দমোদরমিশ্র তাঁহার 'মহানাটক' বা 'হনুমন্নাটক' লেখেন খৃষ্টীয় একাদশ শতকে। নাটকটির তিনটি সংস্করণ পাওয়া যায়, তাহাকে পৃথক পৃথক ভাবে নয়,

দশ ও চৌদ্দটি অঙ্ক আছে! কাহিনীটি রামায়ণ-ভিত্তিক এবং নাট্যকার কাব্যরূপ দানে যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। রচনাটি বিরাট, নাটক অপেক্ষা বরং কবিতাই পাওয়া যায় বেশী এবং তাহার মধ্যে অন্যান্য লেখকের কাব্য পঙ্‌ক্তির অবাধ ব্যবহার আমরা প্রায়ই আবিষ্কার করি।

ল্যাডারের মতে ইহা সংস্কৃত ভাষায় 'ছায়া-নাটকে'র একটি নমুনা, এই অর্থে যে ইহা প্রধানত পদ্যে রচিত, গদ্য সামান্যই, পদ্যও নাটকীয় ধরনের নহে বরং বর্ণনামূলক, প্রাকৃত আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই এবং নাটকের কুশীলব যদিও অনেক, তবু কোনও বিদূষক নাই।

কৃষ্ণমিশ্র : প্রবোধচন্দ্রোদয়

(কৃষ্ণমিশ্র রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' হইল) প্রথম দিককার রূপকধর্মী নাটক। ইহার তারিখ আনুমানিক খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষার্ধ। মুখবন্ধে জনৈক গোপালের উল্লেখ আছে। তাঁহারই নির্দেশে চেদিরাজ কর্ণের বিরুদ্ধে রাজা কীর্তিবর্মনের জয়লাভ স্মরণে নাটকটি রচিত হয়।) যেহেতু ১০৪২ খৃষ্টাব্দের একটি লেখে চেদিরাজের উল্লেখ আছে, এবং চন্দেল্ল রাজ কীর্তিবর্মনের একটি লেখেরও তারিখ যেহেতু ১০৯৮ খৃষ্টাব্দ, সেই হেতু এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে কৃষ্ণমিশ্র খৃষ্টীয় একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক ছিলেন। (এই নাটকের চরিত্র হইল—বিবেক, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি। এই নাটকটিই একমাত্র উদাহরণ যেখানে অনাসক্ত প্রশান্তিমূলক ভাবধারা মঞ্চে উপস্থাপিত হইয়াছে। নাটকটিতে ছয়টি অঙ্ক আছে, রচনাশৈলীও সরল।)

(সংস্কৃত ভাষায় রূপক নাটকের উদ্ভবের ইতিহাস স্বল্পজ্ঞাত এবং একথা বলা কঠিন যে কৃষ্ণমিশ্র এক প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন, অথবা ব্যক্তিতে আরোপিত বিমূর্ততার সাহায্যে প্রতীকধর্মী নাটক প্রযোজনার প্রচেষ্টার জন্য কৃতিত্বটুকু তাঁহারই প্রাপ্য কিনা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে (অধ্যায় ২৫-২৮) পুরঞ্জয়ের কাহিনীতে দার্শনিক রূপকের চিহ্ন পাওয়া যায়। হয়তো উহাই একটি ধর্মবিশ্বাসকে নাটকে পরিণত করিতে পরবর্তী নাট্যকারদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। একথা অবশ্য পরিষ্কার যে এরূপ রূপকধর্মী নাটক বাস্তব জীবন হইতে তাহার সুদূরতার কারণে এবং বিমূর্ত চিন্তা ও প্রতীক

ব্যবহার করার জন্য চরমতম আগ্রহ সৃষ্টি করিবে বলিয়া আশা করা যায় না। কৃষ্ণমিশ্র অবশ্য মানবমনের আত্মিক সংগ্রামের বিশদ চিত্রকে প্রাণবন্ত সংঘর্ষের এক নাটকীয় রূপে উপস্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন—তাহাতে শৃংগার, কৌতুক ও ভক্তিমূলক ভাবকে সুচতুরভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। আঙ্গিকগতভাবে রচনাটি মিলনান্তক এবং উহার সংলাপ প্রাণবন্ত। বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ অবতারণা করার ক্ষেত্রে লেখক যথেষ্ট ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রচিত্রণের ক্ষমতা বলিষ্ঠ, আগ্রহকে কখনোই স্তিমিত হইতে দেওয়া হয় না। কৃষ্ণমিশ্রের রচনার নিজস্ব এক চিরস্থায়ী মূল্য থাকিলেও, তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত পরবর্তী লেখকগণের রচনা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নহে। এইভাবে, জৈনধর্মের স্বার্থে লিখিত পাঁচ অঙ্কের নাটক যশঃপালের (ত্রয়োদশ শতাব্দী) 'মহাপরাজয়', উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের নির্দেশে পরমানন্দদাসসেন কবিকর্ণপূর (ষোড়শ শতাব্দী) রচিত শ্রীচৈতন্যের জীবনের এক নাট্যরূপ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', ভূদেব শুক্লর (ষোড়শ শতাব্দী) পাঁচ অঙ্কের নাটক 'ধর্মবিজয়', বেদকবির (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী) দুইটি সাত অঙ্কের নাটক 'বিদ্যাপরিণয়' ও 'জীবানন্দ', গোকুলনাথের (সপ্তদশ শতাব্দী) পাঁচ অঙ্কে রচিত 'অমৃতোদয়', পাঁচ অঙ্কে রচিত সামরাজদীক্ষিতের (সপ্তদশ শতক) 'শ্রীদামচরিত', দশ অঙ্কে রচিত বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিক কবিতার্কিকসিংহের 'সংকল্পসূর্যোদয়' এবং ছয় অঙ্কে রচিত বরদাচার্যের 'যতিরাজ-বিজয়' হইল কয়েকটি রূপকধর্মী নাটক।

ঙ. স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ নাটক

ভগবদজ্জুকীয় : বোধায়নকবি প্রণীত--খৃষ্টীয় প্রথম ও চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি —বৌদ্ধধর্মের নীতিকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত দুই অঙ্কের প্রহসন ; নামকরণের কারণ প্রধান চরিত্রগুলির নাম ভগবান (একজন ভিক্ষু) ও অজ্জুকা (এক গণিকা)।

তাপসবৎসরাজচরিত : অনঙ্গহর্ষ মাত্ররাজ প্রণীত—এই নাটকটির কালসীমাকে ড. কীথ 'রত্নাবলী'র কাল বলিয়া নির্ণয় করেন—কাহিনীটি বৎসরাজ, পদ্মাবতী ও বাসবদত্তার উপাখ্যানের রূপভেদের উপর আশ্রিত।

লোকানন্দ : তিব্বতীয় পাঠে একটি বৌদ্ধ নাটক, ইহার লেখক বলা হয় চন্দ্র বা চন্দ্রককে (?), বলা হয় যে ইনিই খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমিন্।

উদাত্তরাঘব : মায়ুরাজ রচিত রাম-বিষয়ক এই নাটকটি অধুনালুপ্ত—'দশরূপকে' ইহার উদ্ধৃতি আছে পাঁচবার, অভিনবগুপ্ত ও কুন্তক নাটকটি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

স্বপ্নদশানন : ভীমট রচিত, ইনি মোট পাঁচটি নাটক রচনা করেন—রাজশেখর ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ধর্মাভ্যুদয় : মেঘপ্রভাচার্য রচিত একাঙ্ক নাটক—অজ্ঞাত তারিখের 'ছায়া-নাটক' —মঞ্চনির্দেশে পুতুলের (পুত্রক) সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, নাটকটি নিজেকে 'ছায়ানাট্যপ্রবন্ধ' নামে অভিহিত করিয়াছে।

কর্ণসুন্দরী : খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বিহ্লণ রচিত নাটক।

চিত্রভারত : খৃষ্টীয় একাদশ শতকের ক্ষেমেন্দ্র রচিত—অধুনালুপ্ত নাটক।

প্রবুদ্ধরৌহিণেয় : খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের রামভদ্র মুনি রচিত—ছয় অঙ্কে।

কৌমুদীমিত্রানন্দ : খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের রামচন্দ্র রচিত—দশ অঙ্কের প্রকরণ।

লটকমেলক : খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শঙ্খধর কবিরাজ রচিত—দুই অঙ্কের

প্রহসন ; দন্তুরা-র গৃহে তাহার কন্যা মদনমঞ্জরীর কৃপালাভের জন্য বিভিন্ন ধরনের দুর্বৃত্ত লোকের সমাবেশ বর্ণিত।

মুদ্রিতকুমুদচন্দ্র : খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের যশশ্চন্দ্র রচিত জৈন নাটক।

নির্ভয়ভীমব্যায়োগ : খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের রামচন্দ্র রচিত—ইনি প্রচুর জৈন নাটকের রচয়িতা।

কীরাতার্জুনীয়, রুক্মিণীহরণ, ত্রিপুরদাহ, সমুদ্রমথন, কর্পূরচরিত ও হাস্যচূড়ামণি : খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বৎসরাজ রচিত—প্রথমটি ব্যায়োগ, দ্বিতীয়টি চার অঙ্কের ঈহামৃগ ; তৃতীয়টি চার অঙ্কের ডিম ; চতুর্থটি তিন অঙ্কের সমবকার ; পঞ্চমটি ভাণ ; ষষ্ঠটি এক অঙ্কের প্রহসন।

পার্থপরাক্রম ; খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রহ্লাদনদেব রচিত ব্যায়োগ।

প্রসন্নরাঘব : খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের (বেবারের) জয়দেব রচিত—রামায়ণ আশ্রিত সাত অঙ্কের নাটক।

হবকেলিনাটক : খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বিশালদেব বিগ্রহরাজ রচিত—অংশত প্রস্তরে রক্ষিত।

কুন্দমালা : দিঙ্‌নাগ ও ধীরনাগের রচনা বলিয়া কথিত—সাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত—খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পরবর্তী নহে।

দূতাঙ্গদ : খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সুভট রচিত—ছায়া-নাটক।

হম্মীরমদমর্দন : খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের জয়সিংহ রচিত—পাঁচ অঙ্কের নাটক।

বিক্রান্তকৌরব ও মৈথিলীকল্যাণ : খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের হস্তিমল্ল রচিত—যথাক্রমে ছয় ও পাঁচ অঙ্কে রচিত।

পার্বতীপরিণয় : বাণের রচনা বলিয়া কথিত, আবার খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের বামনভট্ট বাণ-কেও ইহার রচয়িতা বলা হয়।

সৌগন্ধিকাহরণ : খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের বিশ্বনাথ রচিত—ব্যায়োগ।

ধূর্তসমাগম : খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের কবিশেখর প্রণীত—এক অঙ্কের প্রহসন।

বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব : খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের রূপগোস্বামী রচিত—কৃষ্ণকাহিনী ইহার উপজীব্য—যথাক্রমে সাত ও দশ অঙ্কে রচিত।

কংসবধ : খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষকৃষ্ণ রচিত—সাত অঙ্কে।

জানকীপরিণয় : খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের রামভদ্র দীক্ষিত রচিত।

মল্লিকামারুত : খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের উদ্দণ্ডী রচিত—প্রকরণ।

ধূর্তনর্তক : খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের সামরাজ দীক্ষিত রচিত—এক অঙ্কের প্রহসন কিন্তু দুইটি সন্ধি আছে।

কৌতুকরত্নাকর : খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের বাণীনাথের পুত্র কবিতার্কিক রচিত—প্রহসন।

অদ্ভুতদর্পণ : রামভদ্রর সমসাময়িক মহাদেব রচিত—দশ অঙ্কে।

হাস্যার্ণব : জগদীশ্বর রচিত, তারিখ অজ্ঞাত—দুই অঙ্কের জনপ্রিয় প্রহসন।

কৌতুকসর্বস্ব : গোপীনাথ রচিত, তারিখ অজ্ঞাত—বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা উপলক্ষে রচিত প্রহসন—অপর প্রহসনগুলি অপেক্ষা অধিকতর কৌতুকজনক ও কম অশ্লীল।

উন্মত্তরাঘব : ভাস্কর রচিত, তারিখ অজ্ঞাত—'অঙ্ক' নাটক।

মুকুন্দানন্দ : কাশীপতি কবিরাজ রচিত, ইনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে মহীশূরের নঞ্জরাজের সভাকবি ছিলেন—মিশ্র 'ভাণ'।

মাধবসাধন : খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের নৃত্যগোপাল কবিরত্ন প্রণীত।

অমরমঙ্গল : খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধের পঞ্চানন তর্করত্ন রচিত—আট অঙ্কে।

গ্রন্থপঞ্জী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	: বিবিধ প্রবন্ধ
চন্দ্রনাথ বসু	: শকুন্তলা তত্ত্ব
দেবেন্দ্রনাথ বসু	: শকুন্তলায় নাট্যকলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	: প্রাচীন সাহিত্য
অশোকনাথ শাস্ত্রী	: ১. প্রাচীন ভারতে দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির ইতিহাস (ভারতবর্ষ, সন ১৩৩৩-৩৪)
	২. ভারতীয় নাট্যের বেদমূলকতা
	৩. ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা (মাসিক বসুমতী, সন ১৩৪৫-৪৬)
	৪. *Abhinayadarpaṇa of Nandikeśvara*

Ayyar, A. S. P. : *Two plays of Bhāsa*

Barooah, A. : *Bhavabhūti—His Place in Sanskrit Literature*

Belvalkar, S. K. . (i) *Origin of Indian Drama* (*The Calcutta Review*, May, 1922)
(ii) *Uttararāmacarita* (HOS)

Bhandarkar, R. G, : *Mālatīmādhava*

Bühler, G. . *On the Authorship of the Ratnāvalī* (1A, Vol. II)

Chatterjee, N. : *Mṛcchakaṭika* : *A Study*

Devadhar, C. R. ; *Plays Ascribed to Bhāsa* : *Their Authenticity and Merits*

Gajendragadkar, A. B, : *The Veṇīsaṁhāra* : *A Critical Study*

Horrwitz, E. P. : *The Indian Theatre*

Kale, M. R, . (i) *Abhijjnānaśakuntala*
(ii) *Uttarāramacarita*

Keith, A. B. (i) *The Sankrit Drama*
·) JRAS. 1909

Kulkarni, K. P. : *Sanskrit Drama and Dramatists*

Konow, S. · IA. Vol XLIII (on Visākhadatta)

Konow, S. and Lanmann, C. R. : Karpūramañjarī (HOS)

Lévi, S. : *Le Theatre Indien*

Macdonell, A. A. : *A History of Sanskrit Literature*

Mankad, D. R. : *The Types of Sanskrit Drama*

Nariman, G. K. and Jackson, A. V. W. : *Priyadarśikā*

Pishraoti, A. K. : *Bhāsa's Works—a Criticism*

Pusalkar, A. D. : *Bhāsa : a Study*

Rapson, E. : JRAS. 1900. (on Viśākhadatta)

Ridgeway : (i) *The Origin of Tragedy,*
(ii) *Dramas and Dramatic, Dances of Non-European Races*

Sāstrin, T. G. *Bhāsa's Workes—a Critical Study*

Vidyābhūṣaṇa, S. C. *Date of Ratnāvalī*

Weber, A. *The History of Indian Literature*

Wilson, H. H. *Theatre of the Hindus*

Winternitz, M. *Some Problems of Indian Literature*

Yajnik; R. K. *The Indian Theatre*

নবম পরিচ্ছেদ

গীতি-কবিতা

ক. ভূমিকা

সংস্কৃত গীতি-কবিতা

লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য গীতি-কবিতায় সুসমৃদ্ধ। ইহা যদিও সত্য যে লৌকিক গীতি-কবিতায় যথেষ্ট দীর্ঘায়তন কাব্য রচিত হয় নাই, তবু একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে উহা উচ্চগুণসম্পন্ন। গীতি-কবিতার কবিগণ শিল্পগুণসমৃদ্ধ লেখনীর কয়েকটি রেখায় প্রেমাত্মক ভাব বর্ণনা করায় প্রায়শই সফল হইয়াছেন এবং তাঁহাদের রচনা বিদেশী কবিদের রচনার সহিত তুলনায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। সংস্কৃত গীতিকাব্যসাহিত্য অতি ব্যাপক। ইহা শুধু প্রেম ও শৃংগার রসাত্মক বিষয়বস্তুতেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহাতে ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মীয়, নীতিবাক্য-মূলক ও শিক্ষামূলক কবিতা রচিত হইয়াছে এবং এইভাবে তাহা একঘেয়েমি রোধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট বৈচিত্র্য পরিবেশন করে।

সংস্কৃত গীতিকাব্যে প্রকৃতি

প্রেম-সংক্রান্ত সমস্ত গীতি-কবিতাতেই প্রকৃতি এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্ভবতঃ সাহিত্যের অপর কোনও শাখায় ইহা অপেক্ষা মধুর অভিব্যক্তি লাভ করে নাই। জলপদ্ম ও কমল, চকোর, চক্রবাক ও চাতক—সবই মানবজীবন ও প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়ের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

একথাও প্রণিধানযোগ্য যে প্রাকৃত সাহিত্যও গীতিকাব্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সাতবাহনের রচনা বলিয়া কথিত 'সত্তসই' বা 'গাথাসপ্তশতী' এই ধরনের এক অসামান্য রচনা। গ্রন্থটি প্রাকৃত ভাষায় সাতশত শ্লোকের একটি সংগ্রহ; ইহার বিষয়বস্তু প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়। বাণ তাঁহার 'হর্ষচরিতে' এই গ্রন্থটির উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনেল ১০০০ খৃষ্টাব্দকে ইহার কাল বলিয়া নির্ণয় করিতে চাহেন। অপর পক্ষে ইহার রচয়িতা হিসাবে কথিত হাল বা সাতবাহনকে যদি অন্ধ্রবংশের ঐ নামের এক রাজা বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এই রচনাটিকে খৃষ্টীয় কালের প্রথম দিকের বলিতে হয়।

খ. গীতি-কবিতার উৎপত্তি ও বিকাশ

মেঘদূত

সংস্কৃত গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে কালিদাসের নাম সুউচ্চে অবস্থিত। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার 'মেঘদূত' লৌকিক গীতি-কবিতার উদ্যানের শ্রেষ্ঠতম পুষ্প। পরবর্তীকালের কবিগণ[১] অসংখ্যবার ইহার ব্যর্থ অনুকরণ করিয়াছেন। এই কাব্য গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথের মতো কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাঁহারা সাহিত্যের এই ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বের প্রতি অকাতর প্রশংসা বর্ষণ করিয়াছেন। কবি কল্পনায় মেঘকে এক নির্বাসিত যক্ষের প্রেমাস্পদার প্রতি প্রেম ও অনুরাগের বার্তাবহ দূতে পরিণত করেন। যক্ষ অলকায় বর্ষাকালে প্রিয়ার বিরহে কাতর। কাব্যটি দুই অংশে বিভক্ত :— 'পূর্বমেঘ' ও 'উত্তরমেঘ'। কাব্যটি জলভারশ্রান্ত আষাঢ় মেঘের গর্জনের ন্যায় সুগম্ভীর মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত। ইহা প্রেমের মহৎ ধারণার সহিতও সঙ্গতিপূর্ণ—বিরহের জ্বলন্ত বর্ণে রঞ্জিত যে-প্রেম রূপালী রেখা সমন্বিত কৃষ্ণমেঘের সমতুল্য। বার্তার বাণী সংবলিত পংক্তিগুলি সাহিত্যে গভীরতম ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর। আর ইহার গীতিকাব্যগুণ মৃত্তিকা-উত্থিত রামধনুর ন্যায় আমাদের স্মৃতিতে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। এই কাব্য গ্রন্থটি ইয়োরোপের

১. কালিদাসের 'মেঘদূতের' আদর্শে রচিত অন্তত পঞ্চাশটি দূত-কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্যাপি বর্তমান। একথা সত্য যে তাহাদের কাব্যগুণ বেশী নহে। তাহাদের প্রধান আকর্ষণ হইল বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ভাবে মূল আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ব্যবহার। ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাল্পনিক যাত্রার জন্য দূতরূপে শুধু অচেতন বস্তুই নহে, পশু-পাখী তথা পৌরাণিক চরিত্র, এমন কি বিমূর্ত বস্তুকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। মন্দাক্রান্তা ছন্দ ব্যতীত অন্য ছন্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। জৈন ও বৈষ্ণব কবিগণ এরূপ কাব্যকে ধর্মীয় উপদেশের বাহনরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

অধিকতর খ্যাত কয়েকটি দূত-কাব্যের মধ্যে বেদান্তদেশিকের 'হংসসন্দেশ' (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক), রূপগোস্বামীর 'হংসদূত' (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক), কৃষ্ণানন্দের 'পদাঙ্কদূত' (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতক) উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, এবং শীলারের 'মারিয়া স্টুয়ার্ট'-এর উৎসও এই কাব্যটিই।

ঋতুসংহার

'ঋতুসংহার' কালিদাসের দ্বিতীয় গীতিকাব্য। ছয় সর্গে বিভক্ত ছোট ছোট কবিতায় বৎসরের ছয়টি ঋতুই ইহাতে বর্ণিত। ইহা নিঃসন্দেহে কবির প্রাচীনতর রচনা এবং কালিদাস ইহার রচয়িতা কি না সেবিষয়ে বহু পণ্ডিত[১] যদিও সন্দেহ পোষণ করেণ, তবুও এই কাব্যের মধ্যে আমরা প্রস্ফুটনোন্মুখ এক কবির সাক্ষাৎ পাই।[২]

ঘটকর্পর : ঘটকর্পর-কাব্য

লোকপরম্পরায় ঘটকর্পর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম বলিয়া কথিত। কবির নাম অনুযায়ী লিখিত 'ঘটকর্পর-কাব্য' ২২টি স্তবকে রচিত। বর্ষার প্রারম্ভে এক তরুণী বধূ কর্তৃক তাহার অনুপস্থিত স্বামীর উদ্দেশে এক মেঘ-দূত প্রেরণের কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটিতে 'যমক' অলংকারের প্রাচুর্য আছে এবং কবি এজন্য গর্বিত।

ভর্তৃহরি : তিনটি 'শতক'

ভর্তৃহরি তিনটি 'শতক' (একশত শ্লোক-সংগ্রহ) রচনার কৃতিত্বের অধিকারী ; যথা (ক) 'শৃংগারশতক', (খ) নীতিশতক ও (গ) বৈরাগ্যশতক। একই লেখক এই তিনটি কাব্যের রচয়িতা কিনা সে সম্পর্কে কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করিলেও, ভারতীয় পরম্পরায় ভর্তৃহরিকেই ইহাদের রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভর্তৃহরি ৬৫১ খৃষ্টাব্দে[৩] পরলোক

১. অধ্যাপক কীলহর্ন, বুহ্‌লার, ম্যাকডোনেল, শ্রোডার প্রমুখ কালিদাসই ইহার লেখক বলিয়া স্বীকার করেন। অন্য পণ্ডিতেরা অন্যমত পোষণ করেন।

২. দ্রষ্টব্য : অরবিন্দ ঘোষ, 'কালিদাস' ; গজেন্দ্রগড়কর, 'ঋতুসংহার'।

৩. শতকের লেখক ও 'বাক্যপদীয়'র লেখক উক্তনামধারী বিখ্যাত বৈয়াকরণ একই ব্যক্তি কি না এখনও স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় নাই।

গমন করেন বলিয়া কথিত আছে। এই তিনটি কাব্যই প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে রচিত, এবং যাহাদেব জন্য তাহা রচিত তাহাদের নিকট ইহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

ময়ূব : সূর্যশতক

ময়ূর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বাণভট্টের সমসাময়িক ছিলেন এবং বাণভট্ট তাঁহার শ্বশ্রূ বলিয়া কথিত। তাঁহার 'সূর্যশতক'[১] সূর্যের সম্মানে রচিত একশত শ্লোকের এক ধর্মীয় গীতিকাব্য। পবম্পবায় কথিত আছে যে সূর্যের এই প্রশস্তি রচনা করিয়া কবিব কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।[২]

অমরু : অমরুশতক

অমরুর সঠিক কাল নির্ণয় কবা অসম্ভব। বামন-ই (খৃঃ ৮০০) প্রাচীনতম লেখক যিনি 'অমরুশতক' হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অমরুশতক একশত স্তবকেব এক গীতিকাব্য,[৩] ইহাতে জীবন ও প্রেমের বিভিন্ন স্তরে নারীর অবস্থা বর্ণিত। কবি বাস্তবিকই প্রতিভাবান এবং বিভিন্ন রস ও ভাবাবেগ, বিশেষত প্রেম চিত্রণে তিনি চমৎকার কুশলী। অমরু যে-প্রেম পছন্দ করেন তাহা আনন্দোচ্ছল ও লঘু এবং তিনি শুধু প্রেমিকদের সম্পর্কই অঙ্কিত করেন, জীবনের অন্য দিক সম্বন্ধে আদৌ চিন্তা করেন নাই। এক্ষেত্রে তিনি ভর্তৃহরির অনুরূপ নহেন।

টীকাকার রবিচন্দ্রের মতে, অমরুর কাব্য স্তবকগুলি দ্ব্যর্থবোধক—একটি শৃংগাররসাত্মক, অপরটি দার্শনিক। কিন্তু অপর এক টীকাকাব বেমভূপাল ইহাকে বিভিন্ন শ্রেণীর নায়িকা ও তাহাদের প্রেমকলার বৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য নিছক এক আলংকারিক পাঠ্যপুস্তক বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহার রচনাশৈলী দুরূহ হইলেও, নিঃসন্দেহে সৌষ্ঠবপূর্ণ। অমরুর কবিতা সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র-

---

১. বিভিন্ন কবিব আবও 'সূর্যশতক' আছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

২ খৃষ্টীয় নবম শতকের বৌদ্ধ কবি বজ্রদত্ত 'লোকেশ্বরশতক' রচনা করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

৩. কাব্যটি আমরা চারটি সংস্করণে পাই, তাহার একটির সহিত অপরটির পার্থক্য বিরাট।

বিদ্‌গণের নিকট ব্যাপকতম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং আনন্দবর্ধনের ন্যায় বিরাট কাব্যচিন্তানায়ক তাঁহার রচনা হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। অর্জুনবর্মন (খৃঃ ১২১৫) সহ বহু লেখক তাঁহার কাব্য সম্পর্কে টীকাভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

বিহ্লণ : চৌরপঞ্চাশিকা

বিহ্লণের 'চৌরপঞ্চাশিকা' বা 'বিহ্লণকাব্য' হইল এক প্রেমিকের প্রেমাস্পদার সুমধুর সান্নিধ্যের স্মৃতি। কবিতাটিতে পঞ্চাশটি স্তবক আছে। কবির জীবৎকাল খৃঃ ১০৭৬ হইতে ১১২৮। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার জনপ্রিয় কাব্য 'বিদ্যাসুন্দরে'র অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বিহ্লণের এই কাব্যটি হইতে।

জয়দেব : গীতগোবিন্দ

সংস্কৃত কাব্যে সর্বশেষ মহৎ নামটি হইল জয়দেব। কৃষ্ণ-কাহিনী জয়দেবের মধ্যেই এক কাব্যগুণসমৃদ্ধ ভাষ্যকারকে লাভ করে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তিনি বাংলাদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন কেন্দুবিল্ববাসী ভোজদেবের পুত্র। সংস্কৃত গীতিকাব্য সমূহের মধ্যে তাঁহার কাব্য 'গীতগোবিন্দ' সুউচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছে। কবি হইলেন কবিতার এক প্রতিভাবান মহৎশিল্পী। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের মতে এই কাব্যটি বিশুদ্ধ গীতি-কবিতা ও বিশুদ্ধ নাটকের মধ্যে এক উত্তরণকালকে সূচিত করে।[১] স্যার উইলিয়াম জোন্‌স ইহাকে ধর্মোপদেশ-মূলক নাটক নামে অভিহিত করিয়াছেন, আবার অধ্যাপক ল্যাসেন ইহাকে গীতিকাব্যধর্মী নাটক বলিয়া মনে করেন। শ্রোয়েডার ইহাকে পরিশীলিত যাত্রা হিসাবে দেখেন। অধ্যাপক পিশেল ও লেভি ইহাকে সংগীত ও নাটকের মাঝামাঝি পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। কোনও কোনও ভারতীয় পণ্ডিত মনে করেন, কবিতাটি সভা-মহাকাব্য।

১. সম্ভবত, বঙ্গদেশে এখনও আধুনিক যাত্রায় যাহা করা হয়, সেইরূপ, কৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলীর পরিচায়ক জনপ্রিয় নাটকগুলিকে কবি তাঁহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধোয়ী : পবনদূত

জয়দেবের সমসাময়িক ধোয়ী রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকক্ষ অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য 'পবনদূত' অন্যান্য 'দূতকাব্যে'র মতো মেঘদূতের অনুকরণে লিখিত। কবির লেখনী অনুযায়ী মলয় পর্বতের গন্ধর্বকুমারী কুবলয়বতী নায়কের (কবির পৃষ্ঠপোষক, রাজা লক্ষ্মণসেন) দক্ষিণে রাজ্যজয়ের কালে তাঁহার প্রেমে পড়েন এবং দক্ষিণ-পূর্ব পবনকে দূতরূপে প্রেরণ করেন।

গ. গৌণ গীতি-কবিতা ও সংকলনসমূহ

শৃংগারতিলক : কালিদাসের রচনা বলা হয়—তেইশটি স্তবকে প্রেমের চিত্তাকর্ষক চিত্র সংবলিত।

ভক্তামরস্তোত্র : মানতুঙ্গ রচিত, সম্ভবত বাণের সমসাময়িক বা পূর্বের কবি—৪৩টি শ্লোকে জৈন সন্ত ঋষভ-এর সম্মানার্থে লিখিত।

কল্যাণমন্দিরস্তোত্র : সিদ্ধসেন দিবাকর রচিত, সম্ভবত খৃঃ সপ্তম শতকের—মানতুঙ্গের অনুকরণে লিখিত—৪৪টি স্তবক বিশিষ্ট।

সুপ্রভাতস্তোত্র ও অষ্টমহাশ্রীচৈত্যস্তোত্র : রাজা হর্ষবর্ধন রচিত—প্রথমটি বুদ্ধের প্রশস্তিতে ২৪টি শ্লোকে নিবদ্ধ প্রভাতস্তোত্র, দ্বিতীয়টি পাঁচ শ্লোকে নিবদ্ধ স্তোত্র—আটটি মহাচৈত্যের প্রশংসার্থে।

চণ্ডীশতক : খৃঃ সপ্তম শতকের বাণভট্ট রচিত—দেবী পার্বতীর সম্মানার্থে রচিত ১০২টি শ্লোকের সংকলন।

স্রগ্ধরাস্তোত্র : খৃঃ অষ্টম শতকের জনৈক বৌদ্ধ সর্বজ্ঞমিত্র রচিত—বৌদ্ধ দেবী তারার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—৩৭ স্তবকবিশিষ্ট।

কুট্টনীমত : কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়ের (খৃঃ ৭৭২—৮১৩) মন্ত্রী দামোদরগুপ্ত বিরচিত—ভারতীয় অশ্লীল রচনা হিসাবে উপভোগ্য গ্রন্থ, এক তরুণী কিভাবে চাটুকারিতা ও কৃত্রিম প্রেমের সর্বপ্রকার কলাকৌশল প্রয়োগ করিয়া স্বর্ণোপার্জন করে ইহাতে তাহাই বর্ণিত—হর্ষের 'রত্নাবলী'র একটি রূপ প্রদর্শন করে বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

আনন্দলহরী বা সৌন্দর্যলহরী ও মোহমুদ্গর : একেশ্বরবাদী বেদান্তের মহান গুরু শঙ্করের রচনা রূপে খ্যাত।

দেবীশতক : খৃঃ নবম শতকের বিখ্যাত আলংকারিক আনন্দবর্ধন রচিত।

ভল্লট-শতক : আনন্দবর্ধনের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক কবি ভল্লট বিরচিত—নীতিবাক্যমূলক কাব্য।

মহিম্নঃস্তোত্র : পুষ্পদন্ত (খৃঃ নবম শতকের বা তৎপূর্বের) বিরচিত—ধর্মীয় গীতি-কবিতা।

সুভাষিতরত্নসন্দোহ, ধর্মপরীক্ষা ও যোগসার : খৃঃ দশম শতকের অমিতগতি লিখিত—প্রত্যেকটিই নীতিশিক্ষামূলক।

কৃষ্ণকর্ণামৃত ও বৃন্দাবনস্তুতি—খৃঃ একাদশ শতকের বিল্বমঙ্গল বা লীলাশুক রচিত—অত্যন্ত জনপ্রিয়, শৈলী সৌষ্ঠবপূর্ণ।

সময়মাতৃকা, কলাবিলাস, দর্পদলন, সেব্যাসেবকোপদেশ, চতুর্বর্গসংগ্রহ ও চারুচর্যাশতক : কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত—সবকয়টিই নীতিশিক্ষামূলক।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় : ৫২৫ স্তবকে বিধৃত সংকলন—খৃঃ একাদশ শতকের।

অন্যোক্তিমুক্তালতাশতক : কাশ্মীরের হর্ষের (খৃঃ ১০৮৯—১১০১) অধীনে শম্ভু কর্তৃক রচিত—নীতিবাক্যমূলক কবিতা।

আর্যসপ্তশতী : জয়দেবের সমসাময়িক গোবর্ধন রচিত—সাতশত শৃংগাররসাত্মক স্তবক বিশিষ্ট—হালের 'সত্তসই' অনুসরণে লিখিত।

যোগশাস্ত্র, বীতরাগস্তোত্র ও মহাবীরস্তোত্র : খৃঃ দ্বাদশ শতকের হেমচন্দ্র বিরচিত—উচ্চমানের নীতিশিক্ষামূলক গীতিকাব্য, কখনও কখনও ভর্তৃহরির কাব্যের কথা স্মরণ হয়।

সদুক্তিকর্ণামৃত : খৃঃ দ্বাদশ শতকের শ্রীধরের কাব্য সংকলন—ইহাতে ৪৪৬জন অন্য, প্রধানত বঙ্গদেশীয়, কবির রচনা হইতেও সংকলিত অংশ আছে।

শান্তিশতক : কাশ্মীরের শিহ্লণ বিরচিত—ইনি খৃঃ ১২০৫-এর পূর্বেকার—ভর্তৃহরির কাব্যের রচনাশৈলীতে লিখিত।

ভক্তিশতক : বঙ্গদেশের রামচন্দ্র বিরচিত, ইনি রাজা পরাক্রমবাহুর (খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী) সহিত সিংহলে আসিয়াছিলেন।

শৃংগারবৈরাগ্যতরঙ্গিণী : খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর সোমপ্রভ বিরচিত—নিখুঁত কাব্যশৈলীতে ৪৬ স্তবকে রচিত এক নীতিশিক্ষামূলক কাব্য।

সুভাষিতমুক্তাবলী : খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর জহ্লণ কৃত সংকলন।

শার্ঙ্গধরপদ্ধতি : খৃঃ চতুর্দশ শতকের শার্ঙ্গধর কৃত সংকলন—১৬৩টি অংশে ও ৪৬৮৯ স্তবকে রচিত।

সুভাষিতাবলী : খৃঃ পঞ্চদশ শতকের শ্রীবর কৃত সংকলন।

পদ্যাবলী : খৃঃ পঞ্চদশ শতকের রূপগোস্বামী কৃত সংকলন—বহু লেখকের কৃষ্ণ প্রশস্তিমূলক শ্লোক বিশিষ্ট।

ভামিনীবিলাস ও গঙ্গালহরী : খৃঃ সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত আলংকারিক জগন্নাথ বিরচিত।

(বিঃ দ্রঃ—কোনও কোনও সংকলনে গীতি-কবিতা রচয়িত্রী মহিলা কবির নাম ও ইতঃস্তত কিছু শ্লোক পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অধিকতর উল্লেখযোগ্য হইলেন : শীলাভট্টারিকা, বিজ্জকা, বিকটনিতম্বা, প্রিয়ংবদা প্রমুখ)।

গ্রন্থপঞ্জী

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

Krishnamachariar, M. : *Classical Sanskrit Literature*

Macdonell, A. A. : *A History of Sanskrit Literature*

Weber, A. : *The History of Indian Literature*

দশম পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক রচনা

ক. ভূমিকা

ঐতিহাসিক বচনাব অভাব ও তাহার কাবণ

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা ও মহত্ত্ব কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রাচীন বা মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট পরিধির মধ্যে ইতিহাস সম্পর্কে কোনও গুরুত্বপূর্ণ রচনা স্বল্পই দেখা যায়। প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাব লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের সকল শিক্ষার্থীকেই বিভ্রান্ত করে। ইহা অতীব দুঃখজনক যে সমালোচনামূলক অন্তর্দৃষ্টি ও ঘটনাবলীর বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনের জন্য খ্যাত অসামান্য একজন ঐতিহাসিকও ভারত সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। একথা অবশ্য সর্বত্রই স্বীকৃত যে কহ্লণই ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সার্থকতম এবং তাঁহার অমর রচনা 'রাজতরঙ্গিণী' ব্যতিরেকে কাশ্মীরের ইতিহাস অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত। কিন্তু কহ্লণের লেখাও অতিরঞ্জন ও বিভ্রান্তিকর উক্তি হইতে মুক্ত নহে এবং কবিকল্পনাকে প্রায়শই ঐতিহাসিকের অকৃত্রিম চেতনার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে দেওয়া হইয়াছে। ঐতিহাসিক রচনার অভাবের কারণ অনুসন্ধান করা যাইতে পারে পরিবেশ ও ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা গঠিত ভারতীয় মানসিকতার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। জাগতিক জীবন সম্পর্কে লোকপ্রিয় ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্মীয় গ্রন্থাদির শিক্ষা ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করা ও সে-সম্পর্কে আলোচনা করার কোনরূপ গুরুতর প্রচেষ্টার প্রতি এক ঔদাসীনতার মনোভাব গঠনের জন্য নিশ্চয়ই দায়ী।

প্রাচীনতম ঐতিহাসিক রচনাবলী
।

ভারতীয় ইতিহাসের প্রারম্ভকালের সন্ধান মেলে পুরাণগুলির মধ্যে। পুরাণসমূহের প্রচুর ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের মধ্যে বংশানুক্রমের বিবরণীও আছে। এইগুলিই ইতিহাসের বীজস্বরূপ।

বাক্‌পতি : গৌড়বহো

প্রাকৃত ভাষায় অবশ্য 'গৌড়বহো' নামক অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক রচনা আছে। ইহা বাক্‌পতি কর্তৃক লিখিত। ইহাতে কবির পৃষ্ঠপোষক কনৌজের রাজা যশোবর্মনের দিগ্বিজয় ও জনৈক গৌড় রাজার পরাজয় বর্ণিত। যশোবর্মন আবার কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। বাক্‌পতি গৌড়ীয় শৈলীর অনুসারী এবং দীর্ঘ সমাস পদ ব্যবহার করেন। তাঁহার কাল নির্ণিত হইয়াছে অনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী এবং ভবভূতির পাশাপাশি তাঁহার নামোল্লেখ করা হয়।

খ. ঐতিহাসিক রচনার উৎপত্তি ও বিকাশ

পদ্মগুপ্ত : নবসাহসাঙ্কচরিত

পদ্মগুপ্ত—ইনি পরিমল নামেও খ্যাত—১০৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'নবসাহসাঙ্কচরিত' রচনা করেন। এই গ্রন্থে অষ্টাদশ সর্গ আছে এবং রাজকুমারী শশীপ্রভাকে জয় করিয়া লইবার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মালবের সিন্ধুরাজ নবসাহসাঙ্ক-র ইতিহাসের প্রতিও ইঙ্গিত করে।

সন্ধ্যাকরনন্দী : রামপালচরিত

সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামপালচরিতে' দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় রামকাহিনী তথা বঙ্গদেশের রাজা রামপালকাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে। রামপাল ভীম নামক এক কৈবর্ত গোষ্ঠীপ্রধানের নিকট হইতে তাঁহার কৌলিক বাসভূমি উদ্ধার করেন এবং মিথিলা জয় করেন। সন্ধ্যাকরনন্দী খৃঃ ১০৫৭—১০৮৭ পর্যন্ত খ্যাতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিহ্লণ : বিক্রমাঙ্কদেবচরিত

বিহ্লণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কল্যাণের চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য। তিনি খৃঃ ১০৭৬ হইতে ১১২৭ পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছেন। বিহ্লণ অষ্টাদশ সর্গে 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' রচনা করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষককে গরিমামণ্ডিত করিয়াছেন। বিহ্লণ ঐতিহাসিক অপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় কবিই ছিলেন এবং তাঁহার রচনায় অসংখ্য কাল্পনিক ও অবাস্তব বর্ণনার প্রাচুর্য আছে।

কহ্লণ : রাজতরঙ্গিণী

ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন কহ্লণ। তিনি ১১০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'রাজতরঙ্গিণী' রচনা করেন। কহ্লণ তাঁহার গ্রন্থের জন্য

'নীলমত-পুরাণ' সহ প্রাচীনতর উৎস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। রাজা হর্ষের মৃত্যুর পর দেশ যখন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রক্তাক্ত দিনগুলির ভিতর দিয়া যাইতেছিল তৎকালীন কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পর্কে 'রাজতরঙ্গিণী'ই একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ঐতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও, কহ্লণ ছিলেন কবিসুলভ দুর্লভ গুণের অধিকারী এবং তাঁহার গ্রন্থটি কবিকল্পনা ও ঐতিহাসিক তথ্যের এক চমৎকার সংমিশ্রণ। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে, ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র গ্রন্থ যাহা কিছুটা পরিমাণে ইতিহাসের কাছাকাছি গিয়াছে।

হেমচন্দ্র : কুমারপালচরিত

খৃঃ ১০৮৮—১১৭২-এ খ্যাতিমান হেমচন্দ্র তাঁহার 'কুমারপালচরিত' বা 'দ্ব্যাশ্রয়কাব্য' রচনা করেন চালুক্যরাজ কুমারপালের সম্মানার্থে।

পৃথ্বীরাজবিজ

'পৃথ্বীরাজবিজয়ে'র লেখক অজ্ঞাতনামা। ইহাতে ১১৯১ খৃষ্টাব্দে শিহাব-উদ্-দিন ঘোরির বিরুদ্ধে রাজা পৃথ্বীরাজের জয়লাভ বর্ণিত হইয়াছে।

সেই সুদূর খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে 'বৃহৎকথা' উল্লিখিত হইয়াছে এবং ড. ব্যুহ্লার এই গ্রন্থটির কাল নির্ণয় করিয়াছেন খৃষ্টীয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দী। ড. কীথের মতে ইহা খৃঃ চতুর্থ শতকের পরের রচনা নহে। "বৃহৎকথা'র গুরুত্ব অপরিসীম। অফুরন্ত প্রেরণার উৎসরূপে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'বৃহৎকথা'র স্থান রামায়ণ ও মহাভারতের পরই।

বিষ্ণুশর্মা : পঞ্চতন্ত্র

বিষ্ণুশর্মার রচনা বলিয়া কথিত 'পঞ্চতন্ত্র' পশুপক্ষীর উপকথা-সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। বলা হয় যে এই গ্রন্থটির একটি প্রাচীন ভিত্তি আছে ; তাহার নাম 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'। বইটি এখন পাওয়া যায় না। গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে পরিচ্ছন্ন সহজবোধ্য ভঙ্গীতে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে লিখিত। ইহাতে চাণক্যের পরোক্ষ উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়াও বোধ হয়। .হার্টেল বলিয়াছেন যে, এই গ্রন্থটির গুরুত্ব ইহা হইতে বিচার করা যায় যে ইহা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনূদিত হইয়াছিল পহ্লবি ও সিরিয়াক ভাষায়, অষ্টম শতাব্দীতে আরবি ভাষায়, একাদশ শতাব্দীতে হিব্রু ভাষায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্প্যানিশ ভাষায় এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরাজী ভাষায়।

নারায়ণ : হিতোপদেশ

'হিতোপদেশ' জনৈক নারায়ণ প[illegible]ক কর্তক লিখিত পশুপক্ষী সংক্রান্ত উপকথা সাহিত্যের আরেকটি গ্রন্থ। লেখক বিষ্ণুশর্মার রচনাশৈলী অনুকরণ করিয়াছেন এবং বিন্যাসের পদ্ধতি উভয় গ্রন্থেই এক প্রকার। লেখক ছিলেন রাজা ধবলচন্দ্রের সভার অন্তর্ভুক্ত। রাজা ধবলচন্দ্র সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। এই রচনাটির একটি পাণ্ডুলিপি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের। ড. কীথের মতে ইহার কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী হইতে পারে না। কারণ রুদ্রভট্টের একটি শ্লোক এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। অধিকন্তু জনৈক জৈন পণ্ডিত ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে এক নূতন ভাষ্য রচনা করিবার উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

শ্রীবর : কথাকৌতুক

পশুপক্ষী সংক্রান্ত উপকথা শ্রেণীর আরেকটি গ্রন্থ হইল শ্রীবর-রচিত 'কথাকৌতুক'। ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা।

বেতালপঞ্চবিংশতি, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা ও শুকসপ্ততি

রূপকথা সাহিত্যের ভিতরে অজ্ঞাত তারিখের নিম্নলিখিত তিনটি গ্রন্থকে আমরা ধরিতে পারি। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' শিবদাসের রচনা বলা হয় এবং 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা' সম্ভবত বৌদ্ধ উৎস-জাত, উভয় গ্রন্থই বিক্রম নামক এক কাল্পনিক রাজার চরিত্রের ভিত্তিতে লিখিত। ('শুকসপ্ততি'র উদ্ভব ও কাল অজ্ঞাত। ইহা সত্তরটি কাহিনীর এক সংকলন। স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হইতে উদ্যতা এক নারীকে তাহার পোষা শুকপাখী কাহিনীগুলি বিবৃত করিয়াছে।)

ঘ. গৌণ গদ্য কাহিনী

উপমিতিভবপ্রপঞ্চ-কথা : জনৈক জৈন সাধু সিদ্ধ বা সিদ্ধর্ষি রচিত (খৃঃ ৯০৬) —গদ্যে লিখিত, মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ শ্লোক আছে—নীতিশিক্ষামূলক কাহিনী।

কথার্ণব : শিবদাস রচিত—প্রধানত মূর্খ ও তস্কর সম্পর্কে পঁয়ত্রিশটি কাহিনী —কাল অজ্ঞাত, মনে হয় পরবর্তীকালের রচনা।

পুরুষপরীক্ষা : খৃঃ ১৪শ শতকের শেষভাগের বিদ্যাপতি কর্তৃক লিখিত— ৪৪টি কাহিনী বিশিষ্ট।

ভোজপ্রবন্ধ : খৃঃ ১৬শ শতকের বল্লালসেন রচিত—রাজা ভোজের রাজসভার কাহিনী সংবলিত।

চম্পকশ্রেষ্ঠীকথানক ও পালগোপালকথানক : খৃঃ ১৫শ শতকের জিনকীর্তি রচিত।

কথাকোষ : অজ্ঞাত সময়ের কাহিনী সংগ্রহ—নিকৃষ্ট সংস্কৃতে লিখিত।

সম্যক্ত্বকৌমুদী : অজ্ঞাত লেখকের সম্ভবত পরবর্তীকালের রচনা—প্রচারধর্মী চরিত্রের রচনা।

কথারত্নাকর : খৃঃ ১৭শ শত' ‾র হেমবিজয়-গণি রচিত—২৫৮টি পৃথক সংক্ষিপ্ত কাহিনী, উপকথা ও গল্প সংবলিত।

গ্রন্থপঞ্জী

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

Macdonell, A. A. : *A History of Sanskrit Literature*

Weber, A. : *The Histo: ›f Indian Literature*

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চম্পূ সাহিত্য

ক. ভূমিকা

চম্পূ : প্রকৃতি ও কাল

সংস্কৃত ভাষায় মিশ্র গদ্য ও পদ্য রচনাকে চম্পূ[১] নামে অভিহিত করা হয়। গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ বৈদিক সাহিত্যে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে দেখা গেলেও, চম্পূর উদ্ভব অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহার অব্যবহিত পূর্বসূরী—উপকথা ও কল্পকথার মধ্যে। সুবন্ধু ও বাণের রচনায় এবং কতকগুলি লেখেও আমরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু পদ্য পাই ; ইহার অনেক পরে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ সাহিত্যের এক পৃথক শাখার অনন্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। গদ্যই কথা ও আখ্যায়িকা সাহিত্যের একমাত্র বাহন ; উক্ত সাহিত্যে পাঠক ব্যতিক্রমহীন ভাবেই কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ পদেরও সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং এই ধরনের গদ্য সাহিত্য হইতে চম্পূর পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য ইহা অনুমান করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে যে চম্পূতে গদ্য ও পদ্যের মিলন অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে চলিবে না। সতর্কতার সহিত ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে চম্পূতে গদ্য ও পদ্যের প্রয়োগ কোনও নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ না করিয়াও করা চলে। চম্পূ-রচয়িতাগণ রীতিমত অবহেলাভরে একই উদ্দেশ্যে গদ্য ও পদ্য ব্যবহার করেন। ছন্দোবদ্ধ পদের ব্যবহার শুধু কাব্যময় বর্ণনা বা গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ বা ভাবাবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। চম্পূতে গদ্যও পদ্যেরই মতো সমান মূল্যসম্পন্ন বাহন। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, চম্পূর ইতিহাস কোনরূপ সাহিত্যিক কৌতূহলোদ্দীপক নহে। সেই হেতু প্রাপ্ত চম্পূ সাহিত্যের বিশদ বিবরণ দেওয়া হইতে আমরা বিরত রহিলাম। এ-কথা

১. কাব্যাদর্শ ১, ৩১।

উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে চম্পূ-ধরনের রচনা দক্ষিণ ভারতে উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধারা ও জৈন লেখকগণ ধর্মীয় প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ধরনের সাহিত্যের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কৌতূহলের বিষয়, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী অপেক্ষা পুরাতন কোনও চম্পূ বর্তমানে নাই, যদিও অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ আর্যশূরের 'জাতকমালা'য় চম্পূ-জাতীয় কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন।

খ. কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা

নলচম্পূ ও মদালসাচম্পূ : খৃঃ দশম শতকের ত্রিবিক্রমভট্ট প্রণীত।

যশস্তিলক : ৯৫৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক দিগম্বর জৈন সোমদেব রচিত—রাজা মারিদত্তের ধর্মান্তকরণের বর্ণনা।

তিলকমঞ্জরী : জনৈক জৈন ধনপাল কর্তৃক ৯৭০ খৃষ্টাব্দে লিখিত।

জীবনধরচম্পূ : একাদশ 'লম্ভকে' (অংশে) হরিচন্দ্র কর্তৃক লিখিত—৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেকার নহে।

রামায়ণচম্পূ : ভোজরাজ ও লক্ষণভট্টের রচনা বলা হয়।

ভারতচম্পূ : দ্বাদশ অধ্যায়ে অনন্ত কর্তৃক রচিত—কাল অজ্ঞাত।

উদয়সুন্দরীকথা : ১০৪০ খৃষ্টাব্দের সোড্ঢল রচিত—বাণের প্রভাব আছে।

গোপালচম্পূ : খৃঃ ষোড়শ শতকের জীবগোস্বামী প্রণীত।

পারিজাতহরণচম্পূ : ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শেষকৃষ্ণ কর্তৃক লিখিত।

আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ : কবিকর্ণপূর রচিত—কৃষ্ণের বাল্যজীবন বর্ণিত।

স্বাহাসুধাকরচম্পূ : খৃঃ সপ্তদশ শতকের নারায়ণ কর্তৃক লিখিত।

শঙ্করচেতোবিলাসচম্পূ : শঙ্কর রচিত—যথেষ্ট পরবর্তী কালের বচনা।

গ্রন্থপঞ্জী

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

Winternitz, M. : *A History of Indian Literature*, Vol. II

Dasgupta, S. N. and De, S. K. : *History of Sanskrit Literature*, Vol. I

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ব্যাকরণ

ক. ভূমিকা

সংস্কৃত ব্যাকরণের গুরুত্ব

সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলির মধ্যে ব্যাকরণ একটি। সুপ্রাচীন কাল হইতে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ব্যাকরণের স্থান ছিল অদ্বিতীয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গভীর অনুরাগ এবং সুদক্ষ প্রয়োগের মাধ্যমে ইহার চর্চা চলিয়াছে। 'ব্যাকরণমহাভাষ্যে'র গ্রন্থকার পতঞ্জলি বিস্তৃতভাবে ব্যাকরণ পাঠের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত তথ্য হইল, প্রাচীন ভারতীয়গণের নিকট সাহিত্যের একটি শাখা হিসাবে ব্যাকরণের এক স্বতন্ত্র আবেদন ছিল। আরও উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র এই ভারতবর্ষেই ব্যাকরণ চর্চা শেষ পর্যন্ত একটি বিশেষ দর্শনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছে।১

পাণিনি ও তাঁহার পূর্বসূরিগণ

সমগ্র বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাণিনি সম্প্রদায়ই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। পাণিনি অন্ততঃপক্ষে চৌত্রিশ জন পূর্বসূরী বৈয়াকরণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাশ্যপ, আপিশলি, গার্গ্য, গালব, শাকটায়ন, সেনক এবং স্ফোটায়নের নাম উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

১. বৈয়াকরণগণের প্রায় বারটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সংস্কৃত ব্যাকরণের বিপুল সমাদরের কথাই সমর্থন করে। প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের প্রবক্তাগণই খ্যাতিমান গ্রন্থকার এবং তাঁহাদের অনুগামীবৃন্দও প্রতিষ্ঠাবান। 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় ইন্দ্রকে প্রথম বৈয়াকরণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'কথাসরিৎসাগরে' উল্লেখ আছে যে 'অষ্টাধ্যায়ী' রচয়িতা পাণিনি

খ. পাণিনি সম্প্রদায়

পাণিনি : অষ্টাধ্যায়ী

পাণিনির কাল লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অধ্যাপক গোল্ডস্ট্যুকার তাঁহাকে খৃঃ পূঃ অষ্টম শতকের লোক বলিয়া মনে করেন। অন্যদিকে অধ্যাপক ম্যাক্স ম্যুলর এবং ভেবারের মতে তিনি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের লোক। তাঁহার ব্যাকরণগ্রন্থ 'অষ্টাধ্যায়ী' আটটি অধ্যায়ে নিবদ্ধ। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের আবার চারিটি করিয়া 'পাদ' আছে। সূত্রবিন্যাস পরিপূর্ণরূপে বিজ্ঞানভিত্তিক। শব্দের স্বল্প ব্যবহারই ইহার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

কাত্যায়ন : বার্ত্তিক

কাত্যায়ন বার্ত্তিককার বলিয়াই পরিচিত। তিনি পাণিনির পরবর্তীযুগে আবির্ভূত হন। সাধারণত তাঁহাকে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের লোক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। বার্ত্তিকগুলি নিঃসন্দেহে 'পরিপূরক সূত্র'। পাণিনির সূত্র রচনার পর কতকগুলি নূতন শব্দ ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। এই নূতন শব্দগুলির যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্যই কাত্যায়ন বার্ত্তিকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাত্যায়ন কেবল পাণিনির সূত্রের সম্পূরণই করেন নাই, অপ্রয়োজনীয় বোধে কতকগুলি সূত্র বাতিলও করিয়াছেন। ক্ষেত্রবিশেষে আবার প্রচলিত ভাষার প্রয়োজনানুসারে 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থের সংস্কারসাধনও করিয়াছেন।

ঐন্দ্র সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। এই জন্যই ড. বার্ণেল মনে করেন যে ভারতবর্ষে ঐন্দ্র সম্প্রদায়ই প্রাচীনতম। লক্ষণীয় বিষয় যে পাণিনি বা পতঞ্জলি কেহই ইন্দ্রকে বৈয়াকরণ হিসাবে উল্লেখ করেন নাই। সেই হেতু কেহ কেহ বলেন যে ইন্দ্র সম্প্রদায়ের রচনা পাণিনির পরবর্তীযুগের হইলেও উহার বিষয়বস্তু প্রাক্-পাণিনীয় যুগের।

পতঞ্জলি : মহাভাষ্য : খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দ

ব্যাকরণের 'ত্রিমুণি'র মধ্যে পতঞ্জলিকেই সর্বশেষ বলিয়া ধরা হয়। শুঙ্গ বংশের রাজা পুষ্যমিত্র বা পুস্পমিত্রের রাজত্বকালে তিনি আবির্ভূত হন। তাঁহার কাল সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কয়েকটি সুনিশ্চিত পথনির্দে-শকের একটি। পতঞ্জলি বিরল খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। পরবর্তী-কালের বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণও পরম সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার মতবাদসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পতঞ্জলি কিছু প্রয়োগগত কৌশল-বিধি ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার দ্বারা পাণিনির মূল সূত্রগুলির পরিধি তিনি কার্যকরভাবে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য কাত্যায়নের ন্যায় তাঁহাকে কোন সংযোজন করিতে হয় নাই। অবশ্য একথা বলিতেই হইবে যে তিনিও পাণিনির অনেক সূত্রই বাতিল করিয়াছেন। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে'র গদ্যরীতি অননুকরণীয় এবং মাধুর্য, গাম্ভীর্য ও প্রসাদগুণে বিভূষিত।

ভর্তৃহরি : বাক্যপদীয় ও অন্যান্য রচনা।

উপরোক্ত 'ত্রিমুণি'র পরই ভর্তৃহরির নাম স্মরণযোগ্য। তাঁহাকে অনেক সময়েই ভ্রান্তরূপে 'বৈয়াকরণ-কবি' ভট্টির সহিত সনাক্ত করা হয়। ই-ৎসিঙ্ খৃষ্টীয় ৬৫১ অব্দে পরলোকগত জনৈক মহান বৈয়াকরণের উল্লেখ করিতে যাইয়া খুব সম্ভবত ভর্তৃহরির কথাই বলিয়াছেন। ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়' (দুই অধ্যায়ে নিবদ্ধ), 'প্রকীর্ণক' এবং পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'র উপর একটি টীকার গ্রন্থকাররূপে পরিচিত। শেষোক্ত ভাষ্যটির অংশবিশেষ বার্লিন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের অন্তর্গত আভ্যন্তরীণ প্রমাণাদির ভিত্তিতে বলা যাইতে পারে যে বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই আবির্ভূত হন। 'বাক্যপদীয়ে'র প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ দর্শনের কথা আলোচিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং কীর্ণক' গ্রন্থে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন।

বামন এবং জয়াদিত্য : কাশিকা

বামন এবং জয়াদিত্য এই দুইজন বৌদ্ধ গ্রন্থকার 'কাশিকা' রচনা করিয়াছিলেন। 'কাশিকা' পাণিনির সূত্রের উপর একটি ভাষ্য। ই-ৎসিঙ্ বলিয়াছেন যে জয়াদিত্য প্রায় ৬৬০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।। বামন এবং জয়াদিত্যের উদ্দেশ্য ছিল চন্দ্রগোমিনের সমগ্র সংস্কার বিধানগুলি পাণিনি ধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। 'কাশিকা' গ্রন্থটি সাধারণভাবে 'বৃত্তি' বলিয়া পরিচিত।

জিনেন্দ্রবুদ্ধি : ন্যাস

জিনেন্দ্রবুদ্ধি ছিলেন একজন বাঙালী বৌদ্ধ। বামন এবং জয়াদিত্যের 'কাশিকা'র উপর তিনি 'ন্যাস' বা 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা' নামে খ্যাত একটি অপূর্ব এবং সুবিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। আলংকারিক ভামহ জিনেন্দ্রবুদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পরবর্তীকালের লোক হইতে পারেন না।

কৈয়ট : প্রদীপ

পাণিনির সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থকার হইলেন কৈয়ট। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে'র উপর তাঁহার টীকা 'প্রদীপ' একটি অমূল্য গ্রন্থ। মনে করা হয় যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কৈয়ট তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

হরদত্ত : পদমঞ্জরী

'পদমঞ্জরী'র গ্রন্থকার হরদত্ত তাঁহার স্বাধীন মতবাদের জন্য বিখ্যাত। তাঁহার মতবাদসমূহ অনেক সময়েই পতঞ্জলির উক্তির বিরোধী। 'পদমঞ্জরী' 'কাশিকা'র উপর একটি ভাষ্য। মল্লিনাথ হরদত্তের উদ্ধৃতি দিয়াছেন, আবার হরদত্ত নিজেই মাঘের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ধরা হয় যে হরদত্ত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র : 'প্রক্রিয়াকৌমুদী'

পরবর্তীকালের বৈয়াকরণগণ পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'কে ঢালিয়া সাজাইয়াছিলেন এবং আলোচ্য সূচী অনুযায়ী সূত্রগুলির পুনর্বিন্যাস করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত রামচন্দ্র 'প্রক্রিয়াকৌমুদী' রচনা করেন। ইহাকেই ভট্টোজির 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র আদর্শ হিসাবে মনে করা হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে বিট্‌ঠলাচার্য 'প্রক্রিয়াকৌমুদী'র সবাপেক্ষা প্রসিদ্ধ টীকা 'প্রসাদ' রচনা করেন।

ভট্টোজি : সিদ্ধান্তকৌমুদী

ভট্টোজির 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' বিষয়সূচী অনুযায়ী পাণিনির সূত্রের একটি পুনর্বিন্যাস মাত্র। ভট্টোজি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহা 'প্রৌঢ়মনোরমা' বলিয়া খ্যাত। তাঁহার রচিত 'শব্দকৌস্তুভ' পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র উপর একটি প্রামাণিক ভাষ্য। সংস্কৃত ব্যাকরণের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভট্টোজির খ্যাতি ঈর্ষার বস্তু। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতী রচিত 'তত্ত্ববোধিনী' 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র উপর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ টীকা। বাসুদেবের 'বালমনোরমা' সিদ্ধান্তকৌমুদী'র একটি সরল ভাষ্য।

নাগেশ : তাঁহার রচনা

নাগেশভট্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর এক বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। কেবল ব্যাকরণই নহে, যোগ, অলংকার এবং অন্যান্য বিষয় লইয়াও তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কৈয়টের 'প্রদীপে'র উপর রচিত টীকা 'উদ্দ্যোত', 'বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর' এবং 'লঘুশব্দেন্দুশেখর' (দুইটিই ভট্টোজির 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র টীকা) এবং পাণিনির ব্যাকরণ সম্পর্কে পরিভাষার একটি সংগ্রহ 'পরিভাষেন্দুশেখর' হইল ব্যাকরণ প্রসঙ্গে নাগেশভট্টের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষা' (বৃহৎ এবং লঘু) আর একটি অসাধারণ গ্রন্থ। সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় গ্রন্থটিতে আলোচিত।[১]

বরদরাজ : তাঁহার রচিত গ্রন্থ

সাম্প্রতিক গ্রন্থকার বরদরাজ 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থদ্বয় 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী' এবং 'মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদী' ব্যাকরণের প্রাথমিক শিক্ষার্থিগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে পঠিত।

---

১. যে ঐতিহ্য উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছে এবং যাহা নাগেশভট্টের আমল হইতে অবিচ্ছিন্নধারায় প্রবাহিত, সেই ঐতিহ্য অনুযায়ী নাগেশ 'পরমলঘুমঞ্জুষা'র গ্রন্থকার নহেন।

গ. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ সম্প্রদায়

চান্দ্র সম্প্রদায়

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে চন্দ্রগোমিন্ আবির্ভূত হন। 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে ভর্তৃহরি চান্দ্র সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণগণের উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ্রগোমিনের উদ্দেশ্য ছিল সংক্ষেপে পাণিনীয় ধারার পুনর্বিন্যাস। চান্দ্র ব্যাকরণ বহুল সমাদর লাভ করিয়াছে এবং ইহার উপর অসংখ্য ভাষ্যও রচিত হইয়াছে। টীকাগুলির বেশীর ভাগই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদের মারফত সংরক্ষিত।

জিনেন্দ্র সম্প্রদায়

জিনেন্দ্র খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধে আবির্ভূত হন। পাণিনির সূত্র ও বার্ত্তিককে তিনি সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণ গ্রন্থের দুইটি ভাষ্য পাওয়া যায়। একটি প্রনয়ণ করেন অভয়নন্দী (খৃঃ ৭৫০) এবং অপরটি সোমদেব প্রণীত 'শব্দার্ণবচন্দ্রিকা'।

শাকটায়ন সম্প্রদায়

শাকটায়ন নিজের নামেই একটি সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। [illegible]কে পাণিনি উল্লিখিত প্রাচীন যুগের শাকটায়ন বলিয়া মনে করিবার কোন [illegible]ণ নাই। [illegible]য় নবম শতকের প্রথম পাদে তিনি 'শব্দানুশাসন' শীর্ষক [illegible]ন। 'অমোঘবৃত্তি' এই বৈয়াকরণের অপর একটি গ্রন্থ। [illegible]য়ন এবং জিনেন্দ্রের গ্রন্থের ভিত্তিতেই শাকটায়ন তাঁহার গ্রন্থ [illegible]। শাকটায়নকে (১) 'পরিভাষাসূত্র', (২) 'গণপাঠ', (৩) '[illegible]তুপাঠ', (৪) 'উনাদিসূত্র' এবং (৫) 'লিঙ্গানুশাসন' গ্রন্থসমূহের প্রণে[illegible] হিসাবেও ধরা হয়।

হেমচন্দ্র সম্প্রদায়

বহুগ্রন্থের জৈন লেখক হেমচন্দ্র খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ‘শব্দানুশাসন’ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে চার হাজারেরও বেশী সূত্র সন্নিবেশিত। ইহা মৌলিক রচনা নহে বরং একটি সংকলন মাত্র। নিজ গ্রন্থের উপরেই হেমচন্দ্র ‘শব্দানুশাসনবৃহদ্বৃত্তি’ শীর্ষক টীকা প্রনয়ণ করেন।

কাতন্ত্র সম্প্রদায়

কাতন্ত্রসূত্রাবলীর রচয়িতা হইলেন সর্ববর্মন। ইহা কৌমার বা কালাপ বলিয়াও পরিচিত। খৃষ্ট-কালের প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই কাতন্ত্র সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। ‘কাতন্ত্রসূত্রে’ পরবর্তীকালের সংযোজনের প্রমাণ অবশ্য আছে। সর্ববর্মনের মতবাদসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই পাণিনির মতবাদ হইতে পৃথক। এই ব্যাকরণের উপরেই দুর্গসিংহ তাঁহার প্রসিদ্ধ ‘বৃত্তি’ রচনা করেন; রচনাকাল খৃষ্টীয় নবম শতকের পরে নহে। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে বর্ধমান দুর্গসিংহের ‘বৃত্তি’র উপর ভাষ্য প্রনয়ণ করেন। আবার পৃথ্বীধর বর্ধমানের গ্রন্থের উপর একটি উপভাষ্য রচনা করেন। বাংলাদেশে এবং কাশ্মীরে কাতন্ত্র সম্প্রদায় বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছে।

সারস্বত সম্প্রদায়

‘সারস্বতপ্রক্রিয়া’র গ্রন্থকার অনুভূতিস্বরূপাচার্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হন। এই সম্প্রদায়ের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য হইল গাম্ভীর্যগুণ। সারস্বতপ্রক্রিয়ার বহু টীকাকারগণের মধ্যে আছেন পুঞ্জরাজ, অমৃতভারতী, ক্ষেমেন্দ্র এবং অন্যান্যরা।

মুগ্ধবোধ সম্প্রদায়

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে বোপদেব তাঁহার ‘মুগ্ধবোধ’ গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। বোপদেবের রচনাশৈলী সংক্ষিপ্ত এবং সহজ। তাঁহার পরিভাষা বহু স্থলেই পাণিনির পরিভাষা হইতে পৃথক। রাম তর্কবাগীশ এই ব্যাকরণের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার।

জৌমর সম্প্রদায়

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকেই ক্রমদীশ্বর 'সংক্ষিপ্তসার' রচনা করেন। এই গ্রন্থটিতে আটটি অধ্যায় আছে। ইহার উদাহরণগুলি 'ভট্টিকাব্য' হইতে গৃহীত। জুমরনন্দী 'সংক্ষিপ্তসার' গ্রন্থটির আমূল সংস্কার সাধন করেন। জুমরনন্দী 'রসবতী' টীকার প্রণেতা। এই ব্যাকরণ পশ্চিম বাংলায় বহুল পঠিত।

সৌপদ্ম সম্প্রদায়

'সুপদ্মে'র রচয়িতা পদ্মনাভ। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে তিনি আবির্ভূত হন। অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ের ধারার মত এই ধারাটির ভিত্তিও পাণিনি। পদ্মনাভ নিজেও 'সুপদ্মপঞ্জিকা' নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

ঘ. বৈয়াকরণগণের ধর্মীয় সম্প্রদায়

গত কয়েক শতাব্দীতে এমন কয়েকজন বৈয়াকরণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল যাঁহারা ব্যাকরণকে ধর্মের বাহক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বোপদেবের মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে রূপগোস্বামী 'হরিনামামৃত' রচনা করেন। কৃষ্ণ এবং রাধার নাম ব্যাকরণের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত। জীবগোস্বামী একই নামে একটি ব্যাকরণগ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। অধ্যাপক কোলব্রুক 'চৈতন্যামৃত' শীর্ষক তৃতীয় বৈষ্ণব ব্যাকরণটির উল্লেখ করিয়াছেন।

৬. ব্যাকরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

দুর্ঘটবৃত্তি : রচনাকার শরণদেব—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের একজন বাঙালী বৌদ্ধ। বিষয়বস্তু—কঠিন শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিনির্ণয়।

ভাষাবৃত্তি : রচয়িতা পুরুষোত্তমদেব—কাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী—অষ্টাধ্যায়ীর উপর একটি টীকা (বৈদিক মাত্রা সম্বন্ধে অধ্যায় ইহাতে নাই)।

গণরত্নমহোদধি : রচয়িতা বর্ধমান—কাল খৃঃ ১১৪০।

পরিভাষাবৃত্তি : গ্রন্থকার শীরদেব—ব্যাখ্যাসহ পরিভাষার একটি সংকলন।

ধাতুপ্রদীপ : রচয়িতা মৈত্রেয়রক্ষিত—হেমচন্দ্রের পরবর্তীকালের লোক। গ্রন্থটিতে ধাতুগুলির একটি তালিকা এবং তাহাদের প্রয়োগ সন্নিবেশিত।

ধাতুবৃত্তি : সায়নের পুত্র মাধব বিরচিত। 'ধাতুপ্রদীপে'র অনুসরণে লিখিত।

বৈয়াকরণভূষণ এবং বৈয়াকরণভূষণসার : রচনাকার ভট্টোজির ভ্রাতুষ্পুত্র কোণ্ডভট্ট—সংস্কৃত ব্যাকরণের দর্শন এবং অন্যান্য বিষয় লইয়া রচিত।

শব্দরত্ন : গ্রন্থকার হরিদীক্ষিত—তিনি ভট্টোজির পৌত্র এবং নাগেশের আচার্য। গ্রন্থটি 'প্রৌঢ়মনোরমা'র উপর একটি টীকা।

প্রৌঢ়মনোরমাকুচমর্দিনী : রচয়িতা বিখ্যাত আলংকারিক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ—'প্রৌঢ়মনোরমা'র একটি সমালোচনা।

গ্রন্থপঞ্জী

Belvelkar, S. K. : *Systems af Sanskrit Grammar*

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

অলংকার ও নাট্যশাস্ত্র

ক. ভূমিকা

ভরতের নাট্যশাস্ত্র

ঋগ্বেদ, শতপথব্রাহ্মণ, উপনিষদসমূহ এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে প্রাচীনযুগের কাব্যিক প্রয়াসের সন্ধান মেলে। বৈদিক মন্ত্রসমূহের অনেকগুলিতেই কাব্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এ-কথা ঠিক যে সংস্কৃত সাহিত্যের কবিগণের ন্যায় বৈদিক কবিগণ দীপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অর্থালংকার ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু বিভিন্ন শৈলীর সাহিত্য-রচনায় অবলম্বনস্বরূপ আলংকারিক উপাদান সম্পর্কে তাঁহাদের কিছু জ্ঞান ছিল। ইহা অনুধাবন করা যায় কতগুলি অক্ষর বা শব্দের পুনরাবৃত্তি হইতে, যাহা প্রায় অনুপ্রাস বা যমকের সমীপবর্তী। দুইটি মহাকাব্যেই এমন সব অত্যুত্তম কাব্যময় অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়, যেগুলি নিঃসন্দেহে অতিপরিচিত শব্দ এবং অর্থালংকারের উদাহরণ।

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের ইতিহাস

'নিরুক্তে' অলংকার কথাটির পারিভাষিক অর্থ নাই। কিন্তু যাস্ক কথাটিকে 'যাহা অলংকৃত করে' এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 'নিঘণ্টু' ৩. ১৩-তে বিভিন্ন প্রকার উপমাবোধক দ্বাদশটি অব্যয়ের একটি তালিকা আছে। এরূপ ছয়টি প্রকারভেদ 'ইব', 'যথা', 'ন', 'চিৎ', 'নু', এবং 'আ' অব্যয়ের দ্বারা নির্ধারিত। অন্যান্য উপমালংকারের মধ্যে যাস্ক 'ভূতোপমা', 'সিদ্ধোপমা', 'রূপোপমা' এবং 'লুপ্তোপমা'র উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির ব্যাকরণ রচনার বহুপূর্বেই যে 'উপমা,' 'উপমান' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইত পাণিনির সূত্রেই তাহার স্পষ্ট উদাহরণ আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য এবং আপস্তম্বের রচনায় কিংবা 'বিষ্ণুপুরাণে' এবং 'অর্থশাস্ত্রে' অলংকারশাস্ত্রের কোন উল্লেখ নাই এবং পতঞ্জলির পূর্বে ভারতবর্ষে অলংকার-বিষয়ক কোন শাস্ত্রের প্রকৃত বিকাশ ঘটিয়াছিল কি না তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। আমরা পূর্বেই যেরূপ বলিয়াছি, ইহার উদ্ভব ভরতের কাল হইতে নিশ্চিতরূপে অনুসরণ করা যায়। ভরত তাঁহার 'নাট্যশাস্ত্রে' একটি প্রকৃষ্ট কাব্যের চারিটি অলংকার, দশটি গুণ এবং ছত্রিশটি লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন।

সংস্কৃতে অলংকার এবং নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক সাহিত্য বিশেষরূপে সমৃদ্ধ। অলংকার এবং নাট্যশাস্ত্র উভয় বিষয়ের উপরেই বহু বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কখনো বা একই গ্রন্থকার এই দুইটি পরস্পরাবদ্ধ শাস্ত্র লইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অলংকার এবং নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্র প্রাচীনতম গ্রন্থ। এই ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচনাকাল পণ্ডিতগণ বিভিন্নভাবে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে নির্দেশ করিয়াছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অন্ততপক্ষে একশত বৎসরের পূর্ববর্তী একটি সুসংবদ্ধ ঐতিহ্যধারার অভ্রান্ত প্রমাণ আছে। অলংকারশাস্ত্রের পরবর্তীকালের সকল গ্রন্থকারই ভরত সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁহার গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট অনুপ্রেরণার আধার স্বরূপ।

অ।লংক বিকগণেব চ।বটি সম্প্রদ'য

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আলংকারিকগণের মধ্যে চারিটি প্রধান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে। কাব্যের অপরিহার্য গুণ লইয়া তাঁহারা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এইরূপে যুগে যুগে অলংকার, রীতি, রস এবং ধ্বনি কাব্যের মূল উপাদানরূপে বিবেচিত হইয়াছে। অলংকার সাহিত্যের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধ্বনিবাদী সম্প্রদায়ই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। 'ধ্বন্যালোকে'র গ্রন্থকার আনন্দবর্ধনই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত এবং ভাষ্যকার অভিনবগুপ্তই তাঁহার কালজয়ী রচনাবলীতে ধ্বনিবাদের গুরুত্বকে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন

১. আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে 'অগ্নিপুরাণ' ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের উপর একটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী বচনা। ইহাতে এগাবটি অধ্যায় এবং গ্রন্থকারের নিকট পরিচিত আলংকাবিকগণের বিভিন্ন সম্প্রদ'য বিষয়ে একটি ব্যাপক এবং প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়।

(১) অলংকারবাদী সম্প্রদায়—ভামহ : কাব্যালংকার

প্রাচীনতম আলংকারিকগণের মধ্যে ভামহ হইলেন একজন যিনি ভরতের অলংকার বিচারের অনুসরণে কাব্যসুষমা সম্পর্কে একটি সুসংবদ্ধ আলোচনা করিয়াছেন। যতদূর মনে হয় ভামহ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র গ্রন্থ 'কাব্যালংকারে' ছয়টি অধ্যায় সন্নিবেশিত। কাব্যের সংজ্ঞানির্দেশে ভামহ 'শব্দ' এবং 'অর্থ'কে সমান গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন, যদিও পূর্বোক্তটির প্রতিই তিনি অধিকতর মনোযোগী।

উদ্ভট : অলংকারসংগ্রহ

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উদ্ভট 'অলংকারসংগ্রহ' রচনা করেন। গ্রন্থটি একচল্লিশটি অলংকারের সংজ্ঞানির্দেশক শ্লোকরাজির একটি সংগ্রহ মাত্র। ইহার ছয়টি অধ্যায়। অলংকার বিচারের ক্ষেত্রে উদ্ভট ভামহকে অনুসরণ করিয়াছেন।১

রুদ্রট : কাব্যালংকার

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম চতুষ্টকে রুদ্রট তাঁহার 'কাব্যালংকার' রচনা করেন। ষোড়শ অধ্যায়ে নিবদ্ধ এই গ্রন্থ প্রধানতঃ কাব্যের অলংকার লইয়াই রচিত। অলংকার বিচারের ক্ষেত্রে রুদ্রট ভামহ এবং উদ্ভটের ধারা হইতে পৃথক একটি ধারার অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রুদ্রটের তিনজন টীকাকারের মধ্যে নমিসাধুই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

(২) রীতিবাদী সম্প্রদায় : দণ্ডীর কাব্যাদর্শ

'কাব্যাদর্শের' গ্রন্থকার দণ্ডীই রীতিবাদী সম্প্রদায়ের অগ্রদূত। বামন ইহার বিকাশ সাধন করেন। যদিও দণ্ডীকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরা হয়, তথাপি ভামহ এবং দণ্ডীর পৌর্বাপর্য সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের

১. উদ্ভট নিজে অলংকার সম্প্রদায়ের লোক হইলেও তাঁহার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার এবং মুকুলভট্টের শিষ্য প্রতিহারেন্দুরাজ কিন্তু রসবাদী সম্প্রদায়ের অনুগামী। প্রতিহারেন্দুরাজকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক বলিয়া ধরা হয়।

ইতিহাসে একটি বিতর্কিত বিষয়। অলংকারবাদী সম্প্রদায়ের দ্বারা দণ্ডী বহুলভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অলংকার শাস্ত্রে তাঁহার বিশিষ্টতম অবদান হইল গুণবাদ। কাব্যের সংজ্ঞায় দণ্ডী 'শব্দ' অপেক্ষা অর্থের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 'কাব্যাদর্শে'র সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য টীকাকার হইলেন তরুণবাচস্পতি।

বামন : কাব্যালংকারসূত্র

বামন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হন। তিনি পাঁচ অধ্যায় ও দ্বাদশ অধিকরণে বিভক্ত 'কাব্যালংকারসূত্র' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি রীতিই যে কাব্যের আত্মাস্বরূপ তাহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। দশটি গুণ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তাহাদের দ্বারাই রীতি নিরূপিত হয়। 'কামধেনু' 'কাব্যালংকারসূত্রের' একটি প্রাঞ্জল ভাষ্য। ইহা গোপেন্দ্র তিপ্প ভূপালের একটি পরবর্তী যুগের রচনা।

রসবাদী সম্প্রদায় : লোল্লট

ভাষ্যকারগণের রস সম্পর্কে ভরতের সূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতেই রসবাদী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। প্রাচীনতম ব্যাখ্যাকার বলিয়া পরিচিত লোল্লটের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। দুর্ভাগ্যবশতঃ লোল্লটের গ্রন্থটি লুপ্ত, যদিও তাঁহার মতবাদের একটি সমীক্ষা অভিনবগুপ্তের 'অভিনবভারতী' এবং মম্মটের 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'রসবৎ' অলংকার সম্পর্কে দণ্ডীর উক্তি হইতে অনুমান করা যায় যে এই আলংকারিক লোল্লট সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশঙ্কুক

আরেকজন ব্যাখ্যাকার হইলেন শ্রীশঙ্কুক। তিনি লোল্লটের মতবাদসমূহের সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রীশঙ্কুকের গ্রন্থটিও লুপ্ত। তিনি লোল্লটের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া ধরা হয়।

ভট্টনায়ক : হৃদয়দর্পণ

ভট্টনায়ক রসবাদী সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার। বলা হয় তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ চতুষ্টক এবং দশম শতাব্দীর প্রারম্ভের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ 'হৃদয়দর্পণ' দুর্ভাগ্যবশতঃ নিখোঁজ। ভট্টনায়ক লোল্লট এবং শ্রীশঙ্কুকের মতবাদসমূহ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে ভট্টনায়ক শব্দের অতিরিক্ত দুইটি শক্তির কথা স্বীকার করিয়াছেন; যথা, 'ভাবকত্ব', যাহার দ্বারা কাব্যার্থ শ্রোতার নিকট বোধগম্য হয় এবং 'ভোজকত্ব', যাহার দ্বারা শ্রোতা কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ হয়।

ধ্বনিবাদী সম্প্রদায় : আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক

ধ্বনিবাদের মতানুসারে 'ব্যঞ্জনা'ই কাব্যের অপরিহার্য সত্তা। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আনন্দবর্ধন তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে ধ্বনিবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন যে ধ্বনিবাদ বহু প্রাচীন। ইহার ক্ষীণ সূচনা বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে। আনন্দবর্ধনের মতে শব্দের কেবল শক্তি এবং লক্ষণা এই দুইটি শক্তিই নাই, ব্যঞ্জনাশক্তিও আছে। ব্যঞ্জনাশক্তির মাধ্যমেই বস্তু, অলংকার অথবা রস প্রকাশিত হয়।

অভিনবগুপ্ত : লোচন ও অভিনবভারতী

আনন্দবর্ধনের মতবাদসমূহ শাস্ত্রজ্ঞ টীকাকার অভিনবগুপ্তের রচনায় একটি প্রশস্ত এবং যথাযথ রূপ প্রাপ্ত হয়। অভিনবগুপ্ত খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষের দিকে আবির্ভূত হন। তিনি অলংকার শাস্ত্রের দুইটি টীকার প্রণেতা। এই দুইটি হইল আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোকে'র 'লোচন' এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর 'অভিনবভারতী'। দুইটি ভাষ্যকেই মৌলিক রচনা হিসাবে ধরা যাইতে পারে। অভিনবগুপ্ত মনে করেন যে সমস্ত ধ্বনিই রসধ্বনি, কারণ বস্তুধ্বনি কিংবা অলংকারধ্বনি শেষ পর্যন্ত রসধ্বনিতে পরিণত হয়।

খ. অলংকার ও নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক রচনাবলী

অভিধাবৃত্তিমাতৃকা : গ্রন্থকার মুকুলভট্ট। সাধারণভাবে তাঁহাকে খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষ এবং দশম শতাব্দীর প্রথম দিকের মধ্যে ধরা হয়। ইহা একটি ব্যাকরণ-অলংকারবিষয়ক গ্রন্থ।

কাব্যমীমাংসা : রচয়িতা রাজশেখর। খৃষ্টীয় দশম শতকের লোক। গ্রন্থটির আটটি অধ্যায় আছে, কবিগণের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পূর্ণ পুস্তক।

বক্রোক্তিজীবিত : রচনাকার কুন্তল বা কুন্তক। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত। একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধ্বনিবাদী সম্প্রদায়ের লোক। বক্রোক্তিই যে কাব্যের সারবস্তু এই মতবাদের সমর্থক। (বক্রোক্তিবাদী সম্প্রদায় পূর্বতন অলংকারবাদী সম্প্রদায়েরই একটি প্রশাখা)।

দশরূপক : গ্রন্থকার দশম শতকের ধনঞ্জয়। রস এবং তৎসম্পর্কিত বিষয় ব্যতীতও ইহাতে নাট্যশাস্ত্রের উপর একটি অধ্যায় আছে। ইহার টীকা প্রনয়ণ করিয়াছেন ধনিক তাঁহার 'অবলোক' গ্রন্থে। তিনি ধনঞ্জয়ের সমসাময়িক।

ঔচিত্যবিচার এবং কবিকণ্ঠাভরণ : গ্রন্থকার খৃষ্টীয় একাদশ শতকের ক্ষেমেন্দ্র। প্রথমটিতে রসানুভূতিতে ঔচিত্যের অত্যাবশ্যকতা এবং দ্বিতীয়টিতে কবি হইবার উপায় এবং অন্য কবির ভাববস্তু গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত।

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ এবং শৃংগারপ্রকাশ : খৃষ্টীয় একাদশ শতব্দীর প্রথমভাগে ভোজের রচনা। প্রথমটি অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে তথ্যাদিপূর্ণ একটি জ্ঞানকোষ। এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই সম্পূরক। ইহাতে নাট্যশাস্ত্র বিষয়ে একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত।

ব্যক্তিবিবেক : গ্রন্থকার মহিমভট্ট খৃষ্টীয় একাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদের লোক। তিনি ধ্বনিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায়ের সদস্য। গ্রন্থটিতে ধ্বনিকে অনুমানের অন্তর্গত করিবার সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা আছে।

কাব্যপ্রকাশ : গ্রন্থকার খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মম্মট, গ্রন্থকার অভিনবগুপ্ত এবং আনন্দবর্ধনের রচনাবলীর দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। রসই যে কাব্যের আত্মা গ্রন্থটিতে তাহাই আলোচিত। অনেক অল্পখ্যাত টীকাকার বাদেও রুচক ('অলংকারসর্বস্বে'র গ্রন্থকার রুয্যকের সহিত সনাক্ত) মাণিক্যচন্দ্র, শ্রীধর, চণ্ডীদাস, বিশ্বনাথ এবং গোবিন্দ ইহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

ভাবপ্রকাশন : রচয়িতা শারদাতনয় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষার্ধে আবির্ভূত হন। রস সম্পর্কে পরবর্তীযুগের লেখকগণের মধ্যে একজন। ভোজের গ্রন্থের দ্বারা তিনি প্রভাবিত। নাট্যশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত।

অলংকারসর্বস্ব : রচনাকার খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রুয্যক। উদ্ভটের চিন্তাধারা অনুযায়ী রচিত এই গ্রন্থে শব্দার্থের সুষমামণ্ডনকারী হিসাবে ধ্বনির গুরুত্ব আলোচিত। জয়রথ, বিদ্যাচক্রবর্তী প্রভৃতি ইহার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

কাব্যানুশাসন : দ্বাদশ শতকের হেমচন্দ্র বিরচিত গ্রন্থ। তিনি অভিনবগুপ্ত, মম্মট, কুন্তল প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের রচনাবলী হইতে ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছেন।

বাগ্‌ভটালংকার : গ্রন্থকার বাগ্‌ভট দ্বাদশ শতকের লোক। একটি শ্লোকনিবদ্ধ গ্রন্থ।

চন্দ্রালোক : গ্রন্থকার জয়দেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বের লোক নহেন। সুন্দর উদাহরণবিশিষ্ট অলংকারবিষয়ক একটি উপযোগী নির্দেশিকা।

রসমঞ্জরী এবং রসতরঙ্গিণী : রচনাকার ভানুদত্ত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পূর্বের নহেন। দুইটি গ্রন্থেই রস এবং তৎসম্পর্কীয় বিষয় আলোচিত।

নাট্যদর্পণ : দ্বাদশ শতকের রামচন্দ্র এবং গুণচন্দ্র বিরচিত। নাট্যশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থ। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র মতবাদের সহিত ইহার মতবাদের বহু পার্থক্য।

কাব্যানুশাসন : গ্রন্থকার ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাগ্‌ভট। তিনি হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়াছেন।

কবিতারহস্য এবং কাব্যকল্পলতা : ত্রয়োদশ শতকের দুই শ্বেতাম্বর জৈন অরিসিংহ এবং তাঁহার শিষ্য অমরচন্দ্র সম্পাদিত।

কবিকল্পলতা : গ্রন্থকার দেবেশ্বর খুব সম্ভবত খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের জৈন লেখক।

নাটকলক্ষণরত্নকোষ : খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সাগরনন্দী বিরচিত একটি নাট্যশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থে 'নাট্যশাস্ত্র'কে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করা হইয়াছে।

একাবলী : খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের বিদ্যাধর কর্তৃক উড়িষ্যার রাজা নরসিংহের উদ্যোগে রচিত। গ্রন্থকার ধ্বনিবাদী সম্প্রদায়ের। মল্লিনাথ 'তরলা'য় ইহার টীকা রচনা করিয়াছেন।

'প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ : চতুর্দশ শতাব্দীর বিদ্যানাথ বিরচিত। ওয়ারাঙ্গলের রাজা প্রতাপরুদ্রের উদ্যোগে রচিত। অলংকার এবং নাট্যশাস্ত্রবিষয়ে অসংখ্য তথ্যপূর্ণ একটি বিপুল গ্রন্থ।

সাহিত্যদর্পণ : রচনাকার চতুর্দশ শতাব্দীর বিশ্বনাথ। মম্মটের আদর্শানুযায়ী রচিত। রসই যে কাব্যে আত্মস্বরূপ তাহাই গ্রন্থে আলোচিত, যদিও ধ্বনির গুরুত্ব পূর্ণরূপে স্বীকৃত। ইহাতে মম্মটের মতবাদের সমালোচনা আছে। গ্রন্থটি আবার গোবিন্দ এবং জগন্নাথ কর্তৃক সমালোচিত।

উজ্জ্বলনীলমণি : রচনাকার রূপগোস্বামী খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তাঁহার মতে প্রেম ভক্তিরই একটি ভিন্ন নাম। জীবগোস্বামী যিনি একই শতকে তাঁহার পরবর্তীকালে আবির্ভূত হন, 'লোচনরোচনী' গ্রন্থে ইহার টীকা প্রণয়ণ করিয়াছেন।

অলংকারশেখর : গ্রন্থকার খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের কেশবমিশ্র। অলংকার-শাস্ত্রবিষয়ক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। কারিকাগুলি গ্রন্থকারের মতে শৌদ্ধোদনির রচনা।

চিত্রমীমাংসা এবং কুবলয়ানন্দ : গ্রন্থকার সপ্তদশ শতাব্দীর অপ্পয্যদীক্ষিত। তিনি সমালোচনামূলক অন্তর্দৃষ্টি এবং গুণাবধারণের মৌলিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রথম গ্রন্থটি জগন্নাথ কর্তৃক সমালোচিত এবং দ্বিতীয়টি জয়দেবের 'চন্দ্রালোকে'র আদর্শে বিরচিত।

রসগঙ্গাধর : গ্রন্থকার খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের জগন্নাথ, ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রের শেষ প্রতিভা। অত্যুন্নতমানের সমালোচনা ও রচনাশক্তির পরিচয় তিনি দিয়াছেন। ইহা বিশেষরূপে কাব্যশাস্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বিচারমূলক গ্রন্থ।

গ্রন্থপঞ্জী

De, S. K, : *Sanskrit Poetics*, Vols. I & II

Kane, P. V. : *Sāhityadarpaṇa* (Introduction)

Kéith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ছন্দঃশাস্ত্র

ক. ভূমিকা

ছন্দঃশাস্ত্র : একটি বেদাঙ্গ

ব্রাহ্মণসমূহে আমরা ছন্দঃবিষয়ক আলোচনা দেখি এবং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে সে যুগে ষড়বেদাঙ্গের একটি হিসাবে ছন্দঃশাস্ত্রের চর্চা অপরিহার্য বিষয় রূপে গণ্য করা হইত।

পিঙ্গল : তাঁহার সূত্র

ছন্দঃশাস্ত্রের পরিচিত গ্রন্থকারগণের মধ্যে পিঙ্গলই প্রাচীনতম। সূত্রাকারে রচিত তাঁহার গ্রন্থেই আমরা প্রথম বীজগণিতসুলভ সংকেতের ব্যবহার পাই। গ্রন্থটিতে বৈদিক এবং লৌকিক উভয় প্রকার ছন্দেরই আলোচনা আছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে 'নাট্যশাস্ত্রে'র অন্তর্গত ছন্দঃবিষয়ক অধ্যায় (অধ্যায় ১৪, ১৫) এবং অগ্নিপুরাণের ছন্দঃশাস্ত্রবিষয়ক অধ্যায় হইতে পিঙ্গলের গ্রন্থ প্রাচীনতর। প্রাকৃতছন্দঃবিষয়ক যে পুস্তক ('প্রাকৃত পৈঙ্গল') এই গ্রন্থকারের রচনা বলিয়া ধরা হয় তাহা নিঃসন্দেহে একটি পরবর্তীযুগের রচনা।

খ. ছন্দঃশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলী

শ্রুতবোধ : কালিদাস এবং কখনো কখনো বররুচির রচনা বলিয়া ধরা হয়। সংস্কৃত ছন্দের একটি নির্দেশিকা।

সুবৃত্ততিলক : খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত এই গ্রন্থে বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দঃ অন্তর্ভুক্ত।

ছন্দোঽনুশাসন : দ্বাদশ শতকের হেমচন্দ্র বিরচিত। ইহা একটি সংকলন মাত্র, মূল গ্রন্থ নহে।

বৃত্তরত্নাকর : কেদারভট্ট বিরচিত। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী ছিলেন। গ্রন্থটি বৃহদায়তন—ইহাতে একশত ছত্রিশটি ছন্দঃ আলোচিত হইয়াছে।

বৃত্তরত্নাকর : ষোড়শ শতাব্দীর নারায়ণ বিরচিত।

ছন্দোমঞ্জরী : গ্রন্থকার গঙ্গাদাস পরবর্তীযুগের হইলেও ইহা ছন্দঃশাস্ত্রের উপর একটি সমাদৃত গ্রন্থ।

গ্রন্থপঞ্জী

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

Macdonell, A. A. : *A History of Sanskrit Literature*

Weber, A. : *A History of Indian Literature*

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অভিধান

ক. ভূমিকা

যাস্ক : নিরুক্ত

অদ্যাপি বর্তমান অভিধান বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে যাস্কের 'নিরুক্ত'ই প্রাচীনতম। ইহা বৈদিক শব্দাবলীর একটি সংকলন। সংস্কৃত সাহিত্যের অভিধানসমূহ অনেক বিষয়েই 'নিরুক্ত' হইতে পৃথক। মৌল পার্থক্যের একটি বিষয় হইল যে সংস্কৃত অভিধানসমূহ বিশেষ্য এবং অব্যয়গুলি উল্লেখ করিয়াছে। পক্ষান্তরে নিঘণ্টু সমূহে বিশেষ্য এবং ক্রিয়া উভয়বিধ পদই অন্তর্ভুক্ত। প্রায় সমস্ত লৌকিক সংস্কৃত অভিধানই শ্লোকে নিবদ্ধ।

অমরসিংহ : অমরকোষ

'নামলিঙ্গানুশাসন' বা 'অমরকোষ' সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রাচীন অভিধান। গ্রন্থকার অমরসিংহ সম্ভবত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। অবশ্য তাঁহাকে বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম হিসাবে গণ্য করা হয়। এই গ্রন্থের অসংখ্য টীকাকারগণের মধ্যে ক্ষীরস্বামী, সর্বানন্দ, ভানুজি এবং মহেশ্বর সুপরিচিত।

খ. গৌণ অভিধানসমূহ

ত্রিকাণ্ডশেষ এবং হারাবলী : গ্রন্থকার পুরুষোত্তম—দুইটিই প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য শব্দের সংকলন।

অনেকার্থসমুচ্চয় : গ্রন্থকার শাশ্বত—অমরসিংহের সমসাময়িক।

অভিধানরত্নমালা : খৃষ্টীয় দশম শতকের হলায়ুধ বিরচিত।

বৈজয়ন্তী : খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর যাদব রচিত।

অভিধানচিন্তামণি এবং অনেকার্থসংগ্রহ : দ্বাদশ শতকেব হেমচন্দ্র প্রণীত। উভয় গ্রন্থই অসংখ্য শব্দ সমৃদ্ধ।

বিশ্বপ্রকাশ : দ্বাদশ শতাব্দীর মহেশ্বর বিরচিত।

অনেকার্থশব্দকোষ : গ্রন্থকার চতুর্দশ শতকের মেদিনীকার।

বাচস্পত্য : গ্রন্থকার উনবিংশ শতকের তারানাথ তর্কবাচস্পতি। অসাধারণ গুণান্বিত একটি জ্ঞানকোষ।

শব্দকল্পদ্রুম : রাজা রাধাকান্ত দেবেব পৃষ্ঠপোষকতায় উনবিংশ শতাব্দীর একদল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কর্তৃক সংকলিত জ্ঞানকোষ।

গ্রন্থপঞ্জী

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

Macdonell, A. A. : *A History of Sanskrit Literature*

Weber, A. : *A History of Indian Literature*

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নাগরিক ও ধর্মীয় আইন

ক. আইন-সংক্রান্ত রচনার উদ্ভব ও বিকাশ

প্রাচীন ধর্মসূত্রসমূহ

শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রসমূহ ছাড়াও পুরাকালে কতকগুলি ধর্মসূত্র ছিল যেগুলিকে নাগরিক ও ধর্মীয় আইনের প্রাথমিক রচনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই ধর্মসূত্রগুলির মধ্যে গৌতম, হারীত, বশিষ্ঠ, বোধায়ন, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী প্রমুখের ধর্মসূত্রের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই সূত্রগুলি ঠিক কখন রচিত হইয়াছিল তাহা সুনির্দিষ্টরূপে জানা যায় না বটে, তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে উহাদের কাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দী। আরও দুইটি ধর্মসূত্র—'বৈষ্ণবধর্মসূত্র' ও 'বৈখানসধর্মসূত্র'—লিখিত হইয়াছিল পরবর্তীকালে; প্রথমটির কাল বলা হয় খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী। পৈঠীনসি, শঙ্খলিখিত, উশন, কাশ্যপ, বৃহস্পতি প্রমুখের তথাকথিত ধর্মসূত্রগুলির প্রাচীনতা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ আছে।

মনুস্মৃতি: উহার রচনাকার

ব্রাহ্মণ্য আইন সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অসামান্য ও জনপ্রিয় গ্রন্থ হইল 'মানবধর্মশাস্ত্র' অথবা 'মনুস্মৃতি'। সাধারণত মনুই এই গ্রন্থের রচনাকার বলিয়া পরিচিত হইলেও বর্তমান পাঠটি ভৃগুর রচনা বলিয়া কথিত। আবার কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে 'মনুস্মৃতি'র বর্তমান ভাষ্যটি ভৃগুর এক শিষ্যের বিবৃত, এমন কি ভৃগুর নিজেরও রচনা নহে। ড. ব্যুহ্‌লার বলেন যে মানবধর্মসংহিতা বা মনুস্মৃতি হইল 'মানবসূত্রকরণ' নামে পরিচিত সূত্র রচনাসমূহের ধরনের এক মূল গ্রন্থের

নবরূপ ও পদ্যরূপ। 'মানবসূত্রকরণ' মৈত্রায়ণীয় ধারার একটি উপবিভাগ, এই ধারাটি 'কৃষ্ণ-যজুর্বেদ'-এর এক সম্পাদিত ভাষ্যের অনুগত। গ্রন্থটি তাহার উদ্ভব দাবি করে ব্রহ্মার নিকট হইতে, তাঁহারই নিকট হইতে মনু ও ভৃগু মারফৎ ইহা মানুষের কাছে পৌঁছায়; আবার নারদ 'স্মৃতি' মনু-রচিত ১০০,০০০ শ্লোকের এক স্মৃতির কথা বলিয়াছে। নারদ এই শ্লোকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া করেন ১২,০০০, মার্কণ্ডেয় ৮০০০, ও ভৃগুর পুত্র সুমতি ৪০০০। এই বিবরণী হইতে বোঝা যায় যে কতকগুলি মূল সূত্র পরপর পরিশোধিত ও সম্পাদিত হইয়াছিল। এই অভিমতের সমর্থনে স্মৃতিতে লক্ষণীয় কিছু কিছু অসংলগ্নতা ও বৃদ্ধ মনু ও বৃহন্-মনুর উল্লেখ দেখানো হয়।

রচনাকাল

বলা হয় যে 'মনুস্মৃতি'র বর্তমান পাঠে অপর জাতির উপর ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য সংক্রান্ত বহু বিষয় আছে। তাই অনুমান করা হয় যে গ্রন্থটি এমন সময় লিখিত হইয়াছিল যখন ব্রাহ্মণগণ ভারতের রাজা ছিলেন এবং অসীম ক্ষমতাশালী ছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায় যে শুঙ্গদের পতনের পর ভারতে ব্রাহ্মণ রাজাগণ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহা সুবিদিত যে খৃঃ প্রথম শতকে কান্বগণ প্রাচীন ভারতে ৪৫ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। বলা হয় যে 'মনুস্মৃতি'র বর্তমান পাঠটি কান্বদিগের শাসনকালে রচিত।

বিষয়সূচী ও ভাষ্যকার

'মনুস্মৃতি' প্রাঞ্জল সংস্কৃত শ্লোকে রচিত। ইহাতে বারটি অধ্যায়ে ২৬৮৪টি শ্লোক আছে। শ্লোকগুলি অনুষ্টুভ ছন্দে। ইহাতে হিন্দু সমাজের চার প্রকার জাতি ও চতুর্বর্ণের কর্তব্য, বিশেষভাবে রাজার কর্তব্য এবং নাগরিক ও অপরাধসংক্রান্ত আইন বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। মনুস্মৃতি সম্পর্কে অসংখ্য পণ্ডিত টীকাভাষ্য রচনা করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ, নারায়ণ, কুল্লুক, রাঘবানন্দ ও নন্দন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

খ. আইন সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা

নারদস্মৃতি : সম্ভবত পরবর্তীকালের রচনা, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গুণও আছে কিন্তু মনুর গ্রন্থের সহিত তুলনীয় নহে—সাধারণত 'মনুস্মৃতি'র আইন-সংক্রান্ত পরিশিষ্টরূপে পরিগণিত।

বৃহস্পতিস্মৃতি : মনুস্মৃতির পরিপূরক একটি গ্রন্থ—খৃঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকের।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি : মনুস্মৃতির শৈলীতে রচিত গুরুত্বপূর্ণ রচনা—বিষয়বস্তু সুশৃংখলভাবে ও সন্তোষজনকভাবে আলোচিত হইয়াছে, রচনা স্বাতন্ত্র্যের পরিচর্যাবিশিষ্ট—খৃঃ তৃতীয় শতকের পূর্বেকার নহে—একাদশ শতকের বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার 'মিতক্ষরা'তে এই গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন।

সংস্কারপদ্ধতি ও প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ : দক্ষিণ বঙ্গের রাজা হরিবর্মনের খ্যাতনামা মন্ত্রী ভবদেবভট্ট (খৃঃ একাদশ শতক) কর্তৃক লিখিত।

স্মৃতিকল্পতরু . কনৌজের গোবিন্দচন্দ্রের (খৃঃ দ্বাদশ শতক) মন্ত্রী লক্ষ্মীধর রচিত।

পরাশরস্মৃতি : যাজ্ঞবল্ক্য বিশেষজ্ঞরূপে যাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন এই গ্রন্থটির রচয়িতা সেই ব্যক্তি নহেন—খৃঃ চতুর্দশ শতকের মাধব রচিত 'পরাশরমাধব' ইহার ভাষ্য।

ব্রাহ্মণসর্বস্ব : খৃঃ দ্বাদশ শতকের হলায়ুধ রচিত—বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণসেনের উদ্যোগে রচিত।

দশকর্মপদ্ধতি : খৃঃ দ্বাদশ শতকের পশুপতি রচিত।

পিতৃদয়িতা : খৃঃ দ্বাদশ শতকের অনিরুদ্ধ বিরচিত।

চতুর্বর্গচিন্তামণি : খৃঃ দ্বাদশ শতকের হেমাদ্রি রচিত বৃহদায়তন এক গ্রন্থ।

ধর্মরত্ন : খৃঃ চতুর্দশ শতকের জীমূতবাহন রচিত—ইহাতে বিখ্যাত 'দায়ভাগ' নিয়ম আছে। ইহাই বঙ্গদেশ উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর নিয়ামক।

দীপকলিকা : খৃঃ চতুর্দশ শতকের শূলপাণি রচিত—'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র ভাষ্য।

মদনপারিজাত : খৃঃ চতুর্দশ শতকের বিশ্বেশ্বর প্রণীত—ধর্মীয় আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ।

বিবাদরত্নাকর, স্মৃতিরত্নাকর ও অন্যান্য 'রত্নাকর' সমূহ : খৃঃ ১৪ শতকের হরিসিংহের মন্ত্রী বিদ্যাপতির খুল্ল-পিতামহ চণ্ডেশ্বর প্রণীত—গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি আইন পুস্তক।

রঘুনন্দনস্মৃতি : খৃঃ ষোড়শ শতকের রঘুনন্দন প্রণীত ; গ্রন্থের সংখ্যা ২৮টি—প্রত্যেকটিই 'তত্ত্ব' অভিধাভূষিত, যথা—তিথিতত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব প্রভৃতি—বিশেষভাবে প্রামাণ্য, বিশেষত বঙ্গদেশে।

বিবাদচিন্তামণি, ব্যবহারচিন্তামণি ও অন্যান্য 'চিন্তামণি' : বাচস্পতি প্রণীত ; ইনি মিথিলার (খৃঃ পঞ্চদশ শতক) ভৈরবসিংহ (হরিনারায়ণ) এবং রামভদ্রের (রূপনারায়ণ) উদ্যোগে লিখিয়াছিলেন—গ্রন্থগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আইন পুস্তক।

বীরমিত্রোদয় : খৃঃ সপ্তদশ শতকের মিত্রমিশ্র প্রণীত বৃহদায়তন এক গ্রন্থ।

নির্ণয়সিন্ধু : খৃঃ সপ্তদশ শতকের কমলাকরভট্ট প্রণীত।

গ্রন্থপঞ্জী

Bühler, G. : SBE Vol. XXV

Kane, P. V. : *History of Dharmaśāstra*

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

Weber, A. : *The History of Indian Literature*

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রাজনীতি

ভূমিকা

কৌটিল্য : অর্থশাস্ত্র

ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি এক অসামান্য রচনা। কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত দাবি করেন, গ্রন্থটি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের কোন এক সময়ে রচিত ; যদিও লোকপরম্পরায় ইহার লেখকরূপে মনে করা হয় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক) মন্ত্রী চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্তকে। পণ্ডিতগণ চাণক্যকে একবাক্যে ভারতের ম্যাকিয়াভেলি রূপে স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য, কৌটিল্য স্বয়ং মৌর্যযুগেই গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন কিনা, কিংবা পরবর্তী কালে কৌটিল্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার অনুগামী অপর কোনও লেখক বা লেখকগোষ্ঠী ইহার রচনাকার কিনা তাহা বিতর্কমূলক বিষয়। 'অর্থশাস্ত্র'তে বৃহস্পতি, বাহুদন্তিপুত্র, বিশালাক্ষ ও উশন-এর উল্লেখ আছে প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞরূপে ; ইহার দ্বারা এই বিজ্ঞানের বহু পূর্বকালের অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়। গ্রন্থটি রাজাদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের ন্য এক ত্রুটিহীন আচরণবিধি। ইহা ১৫টি বড় বড় বিভাগ বা অধিকরণ এবং ১৮০টি উপবিভাগ বা প্রকরণে বিভক্ত। উপবিভাগগুলি আবার কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি পূর্বে বর্ণিত নীতির সারাংশ বর্ণনাকারী শ্লোক দিয়া গদ্যাংশ হইতে পৃথকরূপে চিহ্নিত। রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরবর্তী রচনাগুলির ভিত্তি 'অর্থশাস্ত্র'।

একথা সত্য নহে যে বৈদিক যুগের ভারতবাসী নিজেকে শুধু ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডেই ব্যাপৃত রাখিত এবং জীবন ও পার্থিব বিষয়কে উপেক্ষা করিত। হিরণ্যকেশীর 'গৃহ্যসূত্র' ও মহাভারতে মানব অস্তিত্বের

তিনটি চরম লক্ষ্যরূপে ধর্ম, অর্থ ও কামকে স্বীকার করা হইয়াছে। অর্থ সংক্রান্ত নীতি নীতিশিক্ষামূলক শ্লোকেই প্রথম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারতে জানিতে পারি যে, পরমস্রষ্টা ব্রহ্মা ১০০,০০০ বিভাগে এক অর্থশাস্ত্রের প্রণেতা ছিলেন, বিশালাক্ষ রূপে শিব ইহার সংখ্যা হ্রাস করেন ১০,০০০-এ, ইন্দ্র ইহাকে কমাইয়া আনেন ৫০০০-এ এবং বৃহস্পতি ও উশন ক্রমে ক্রমে তাহাকে যথাক্রমে ৩০০০ ও ১০০০ বিভাগে নামাইয়া আনেন। উক্ত মহাকাব্যেই কয়েকটি অংশ আছে যাহাতে রাজনৈতিক সংগঠন বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে এবং পণ্ডিতগণ ইহারই মধ্যে অর্থশাস্ত্রের বাস্তব ব্যবহারের সন্ধান লাভ করিয়াছেন।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভারতীয় রাজনৈতিক সাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে হৃত রত্ন কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র আবিষ্কার প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয় অধ্যয়নে এক বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করেন মহীশূরের ড. আর. শামশাস্ত্রী ১৯০৯ সালে। জনৈক পণ্ডিতের একটি মন্তব্য হইতেই ইহার মূল্য অনুমান করা যায়। উক্ত পণ্ডিত 'অর্থশাস্ত্রে'র বর্ণনা করিয়াছেন এই বলিয়া যে ইহা হইল 'প্রাচীন ভারতের এক গ্রন্থাগার।'

কৌটিল্য তাঁহার রাজনৈতিক তত্ত্ব ও আলোচনাকে এক রাজতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু সেই রাজতন্ত্র নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র নহে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সমস্ত প্রাচীন শিক্ষকগণেরই এই অভিমত ছিল যে রাজার সর্বোচ্চ কর্তব্য হইল তাঁহার নিজের প্রজাবর্গের সুখ ও হিতার্থে সাহায্য করা এবং তাঁহার নিজের রাজত্বে শান্তিপূর্ণভাবে আইন ও শৃংখলা রক্ষা করা যাহাতে তাঁহার প্রজাদের জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে। রাজার আরেকটি বড় কর্তব্য হইল বিদেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতিবেশী শাসকদের কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধের দ্বারা প্রত্যক্ষ শত্রুতা আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত থাকা। উপরোক্ত দুইটি কর্তব্য যথাক্রমে 'তন্ত্র' ও 'আবাপ' নামে খ্যাত এবং এ-সম্পর্কে কৌটিল্য বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অনুমান করা যায় যে

'অর্থশাস্ত্র'তে কৌটিল্য সম্ভবত রাষ্ট্রপরিচালনা-ব্যবস্থার নীতি ও নিয়ম-কানুন বিবৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এরূপ আইন-কানুন ও বিধি বিবৃত করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা নিজের অধীনে এক সাম্রাজ্য নির্মাণ করিতে উৎসুক উচ্চাকাঙ্খী রাজার ('বিজিগীষু') পক্ষে আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে।

খ. রাজনীতি সম্পর্কিত কয়েকটি গৌণ গ্রন্থ

নীতিসার : কামন্দক প্রণীত—কাব্যের লক্ষণ বিশিষ্ট শ্লোকে লিখিত—খৃঃ অষ্টম শতকের পরবর্তী নহে।

নীতিবাক্যামৃত : যশস্তিলকের লেখক সোমদেব প্রণীত—যুদ্ধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিশদ বর্ণনা সামান্যই করা হইয়াছে—লেখককে বরং বিরাট নৈতিক শিক্ষাদাতা বলিয়া মনে নয়।

লঘু অর্হন্নীতি : মহান জৈন লেখক হেমচন্দ্র (খৃঃ ১০৮৮—১১৭২) প্রণীত—ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে রচিত—প্রাকৃত ভাষায় লিখিত লেখকের বৃহত্তর এক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ।

যুক্তিকল্পতরু : ভোজের রচনা বলা হয়।

নীতিরত্নাকর : বিদ্যাপতির খুল্ল-পিতামহ চণ্ডেশ্বর রচিত—চণ্ডেশ্বর ছিলেন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ।

শুক্রনীতি : লেখক অজ্ঞাত—অনেক পরবর্তী কালের রচনা। বারুদের ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*
Macdonell, A. A. : *A History of Sanskrit Literature*
Weber, A. : *The History of Indian Literature*

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কামশাস্ত্র

ক. ভূমিকা

বাৎস্যায়ন : কামসূত্র

কামশাস্ত্র প্রাচীন ভারতে বিশেষ। ভাবে অধীত হইত। এই বিষয়ে অসামান্যতম রচনা হইল বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'। বাৎস্যায়ন খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের কোন এক সময়ের লোক ছিলেন। গ্রন্থটি সাতটি অংশে বিভক্ত; গদ্যে রচিত, তবে মধ্যে মধ্যে ইতঃস্তত ছন্দোবদ্ধ শ্লোক আছে। এই বিষয়ে প্রথম রচনা বলিয়া গ্রন্থটি দাবি করে না। গ্রন্থটি তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা ও রীতিনীতি সম্পর্কে তথ্যের আকর বিশেষ।

যশোধর : জয়মঙ্গলা

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের যশোধর 'জয়মঙ্গলা' নামে বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'র এক টীকা রচনা করেন। বাৎস্যায়ন কর্তৃক ব্যবহৃত বহু পরিভাষা ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া এই টীকাকার বিশেষ প্রশংসনীয়।

খ. কামশাস্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি গৌণ গ্রন্থ

পঞ্চসায়ক : জ্যোতিরীশ্বর প্রণীত—ক্ষেমেন্দ্রের পরবর্তী কালের।

রতিরহস্য : কোক্কোক প্রণীত—১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী।

রতিমঞ্জরী : জনৈক জয়দেব প্রণীত (কাল অজ্ঞাত)। 'গীতগোবিন্দে'র কবি ও ইনি একই ব্যক্তি এমন কথা কখনও কখনও বলা হয়।

অনঙ্গরঙ্গ : খৃঃ ষোড়শ শতকের কল্যাণমল্ল প্রণীত।

রতিশাস্ত্র : নাগার্জুন প্রণীত (কাল অজ্ঞাত)—প্রায়শই ভ্রান্তভাবে মহান বৌদ্ধ চিন্তানায়কের সহিত এক করিয়া দেখা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

বিংশ পরিচ্ছেদ

চিকিৎসাশাস্ত্র

ক. চিকিৎসা সংক্রান্ত রচনাদির ইতিহাস

ভূমিকা

বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়নে দেখা যায় যে শারীরবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বৈদিক ভারতবাসিগণের জানা ছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকেও বেদের অন্যতম সহায়ক বিদ্যারূপে গণ্য করা হইত। পুরাতন সাহিত্যে প্রাচীন ঋষিগণের উল্লেখ আছে যাঁহারা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিতেন। এই ঋষিগণের অন্যতম হইলেন আত্রেয়; তাঁহাকেই সাধারণত এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতারূপে গণ্য করা হয়, এবং বলা হয় চাণক্যও নাকি ঔষধি ও চিকিৎসা সম্পর্কে লিখিয়াছেন। বৌদ্ধ লোকপরম্পরা অনুযায়ী আত্রেয়র শিষ্য জীবক ছিলেন শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ।

চরক

চিকিৎসা সম্পর্কে অদ্যাপি বিদ্যমান প্রাচীনতম গ্রন্থ হইল 'চরকসংহিতা'। অধ্যাপক লেভির মতে চরক ছিলেন রাজা কনিষ্ক-র সমসাময়িক। অবশ্য একথা সুবিদিত যে চরকের বর্তমান গ্রন্থটি দৃঢ়বল নামক জনৈক কাশ্মীরী কর্তৃক পরিমার্জিত হইয়াছে। দৃঢ়বল খৃষ্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীর লোক ছিলেন।

সুশ্রুত ও তাঁহার ভাষ্যকারগণ

ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অপর এক মহান শিক্ষাগুরু হইলেন সুশ্রুত। ইঁহার নাম পাওয়া যায় বিখ্যাত বাওয়ার পাণ্ডুলিপিতে, এবং মহাভারতেও

বিশ্বামিত্রের পুত্র রূপে তাঁহার উল্লেখ আছে সেই সুদূর নবম ও দশম শতাব্দীতেও তাঁহার খ্যাতি ভারতকে অতিক্রম করিয়া সুদূর অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার ভাষ্যকারগণের মধ্যে জৈয্যট, গয়দাস ও ডল্লন ছাড়াও চক্রপাণিদত্ত-র (খৃঃ একাদশ শতাব্দী) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভেল

আরেকজন বিশেষজ্ঞ হইলেন ভেল। তাঁহাকে এমন এক 'সংহিতা'র রচয়িতা বলা হয়, যে সংহিতাটি কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে চরকের রচনাটিরও পূর্ববর্তী।

খ. পরবর্তী যুগের চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা : বাগ্‌ভট বিরচিত—ইনি সুশ্রুতের ঠিক পরই এক বিরাট বিশেষজ্ঞ—ই-ৎসিঙ যে চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারই সহিত ইঁহাকে এক করিয়া দেখা হয়।

রসরত্নাকর : নাগার্জুন রচিত—সম্ভবত খৃঃ সপ্তম কিংবা অষ্টম শতকের—পারদের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে একটি অংশ আছে।

নিদান : খৃঃ অষ্টম কিংবা নবম শতাব্দীর মাধবকর রচিত— রোগবিদ্যা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

চিকিৎসাসারসংগ্রহ : চক্রপাণিদত্ত প্রণীত—ভেষজবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ।

চিকিৎসাকলিকা : খৃঃ চতুর্দশ শতকের তীষত প্রণীত।

ভাবপ্রকাশ : খৃঃ ষোড়শ শতকের ভাবমিশ্র প্রণীত।

বৈদ্যজীবন : খৃঃ সপ্তদশ শতকের লোলিম্বরাজ রচিত।

গ্রন্থপঞ্জী

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

Macdonell, A. A. : *A History of Sanskrit Literature*

Weber, A. : *The History of Indian Literature*

একবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ও ফলিত জ্যোতিষ

ক. জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাস

জ্যোতির্বিদ্যা : প্রাচীন শাস্ত্র

বৈদিক যুগে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়মানুগভাবে অধীত হইত কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। অনেক পরে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় এক প্রাচীনতর কালের পাঁচটি 'সিদ্ধান্তে'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানিতে পারি। ইহা অবশ্য সত্য যে বৈদিক ভারতীয়গণ চান্দ্র গৃহ অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জের কথা জানিতেন। ড. ভেবার বলেন যে 'ঋগ্‌বেদে', 'শতপথ-ব্রাহ্মণে', 'তৈত্তিরীয়সংহিতায়' ও 'অথর্ববেদে' কয়েকটি নক্ষত্রপুঞ্জের নাম পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় যে গ্রহসমূহের আবিষ্কারের সহিত জ্যোতির্বিদ্যাও তাৎপর্যপূর্ণভাবে অগ্রগতি লাভ করে। 'তৈত্তিরীয়ারণ্যক', দুইটি মহাকাব্য ও মনুর আইনসংক্রান্ত গ্রন্থে গ্রহের উল্লেখ আছে। তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যায় প্রাচীন ভারতীয়গণ নিজেরাই গ্রহসমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, অথবা কোনও বিদেশী সূত্র হইতে এই জ্ঞান তাঁহাদের নিকট আসিয়াছিল। যাহাই হউক, ইহা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা 'গ্রীক প্রভাবাধীনে পুষ্ট হইয়াছিল।

খ· জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত রচনা

আর্যভট ও তাঁহার রচনা

'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'র আবিষ্কারের পূর্বে আর্যভটকেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে একমাত্র বিশেষজ্ঞরূপে গণ্য করা হইত। আর্যভট খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে তাঁহার গ্রন্থগুলি রচনা করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে তিনটি আমরা পাইয়াছি; সেগুলি হইল দশটি স্তবকে নিবদ্ধ 'আর্যভটীয়', 'দশগীতিকাসূত্র' এবং 'আর্যাষ্টশত'। শেষোক্তটিতে গণিতবিদ্যা সম্পর্কে একটি অংশ আছে।

আর্যভট : আর্যসিদ্ধান্ত

আর্যভট নামে আরেকজন লেখক ছিলেন যিনি 'আর্যসিদ্ধান্তে'র রচয়িতা। গ্রন্থটি দশম শতকে রচিত এবং ইনি অল্‌বেরুনীর পরিচিত ছিলেন। ইঁহার সহিত প্রথমোক্ত আর্যভটকে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে।

ব্রহ্মগুপ্ত ও তাঁহার রচনা

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম ব্রহ্মগুপ্ত ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' ও 'খণ্ডখাদ্যক' নামে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।

লল্ল : শিষ্যধীবৃদ্ধিতন্ত্র

লল্ল ব্রহ্মগুপ্তের পরবর্তীকালের। ইনি 'শিষ্যধীবৃদ্ধিতন্ত্র' নামে একটি গ্রন্থের রচয়িতা।

ভোজ ও শতানন্দ : তাঁহাদের রচনা

ভোজ ও শতানন্দ ছিলেন একাদশ শতকের লেখক। তাঁহাদের গ্রন্থ হইল যথাক্রমে 'রাজমৃগাঙ্ক' ও 'ভাস্বতী'।

ভাস্কর ও তাঁহার রচনা

১১৫০ খৃষ্টাব্দের ভাস্করাচার্য তাঁহার মহৎসৃষ্টি 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' রচনা করেন। ইহা চারিটি অংশে বিভক্ত। তাঁহার অপর একটি রচনা হইল 'করণকুতূহল'।

গ. গণিতশাস্ত্র সংক্রান্ত রচনা

আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর ও ভাস্কর

ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে অল্প কয়েকটি মাত্র নামই উল্লেখযোগ্য। আর্যভটই সর্বপ্রথম তাঁহার রচনায় গণিত বিদ্যা সম্পর্কে একটি অধ্যায়কে অন্তর্ভুক্ত করেন। ব্রহ্মগুপ্ত সাধারণ পাটিগণিতের নীতিসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় নবম শতকে মহাবীর ভারতীয় গণিতশাস্ত্র সম্পর্কে একটি প্রাথমিক অথচ বিশদ রচনা প্রণয়ন করেন। খৃষ্টীয় দশম শতকে তিনি তাঁহার 'ত্রিশতী' রচনা করেন, তাহাতে সমচতুষ্কোণিক সমীকরণ আলোচিত হয়। ভাস্করাচার্যই তাঁহার 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থের 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' নামক দুইটি অংশে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কিছু স্থায়ী অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।

ঘ. ফলিত জ্যোতিষ সম্পর্কে রচনা

প্রাচীন রচনা

ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ফলিত জ্যোতিষকেও বিজ্ঞানরূপে অধ্যয়ন করা হইয়াছে। বরাহমিহিরের রচনাবলী তাঁহার পূর্বতন বিশেষজ্ঞদের রচনাকে নিষ্প্রভ করিয়াছে। অবশ্য পূর্বসূরীদের রচনাগুলিও আমরা পাই নাই। কেবল 'বৃদ্ধগর্গসংহিতা'র কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ এখনও পাওয়া যায়। বরাহমিহির ফলিত জ্যোতিষকে 'তন্ত্র,' 'হোরা' ও 'সংহিতা' এই তিনটি শাখায় শ্রেণীবদ্ধ করেন। 'তন্ত্র' হইল জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত-শাস্ত্রগত ভিত্তি, কোষ্ঠি সম্পর্কিত বিভাগটির নাম 'হোরা' এবং যে অংশটিতে সাধারণ জ্যোতিষ বিদ্যা আলোচিত তাহার নাম 'সংহিতা'। বরাহমিহিরের অসাধারণ রচনা হইল 'বৃহৎসংহিতা'। ভট্টোৎপল ইহার টীকা রচনা করিয়াছিলেন। 'হোরা' বিভাগটি সম্পর্কে বরাহমিহির 'বৃহজ্জাতক' ও 'লঘুজাতক' নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বরাহমিহিরের রচনা ছাড়াও একটি 'যবনজাতকে'র নাম আমরা পাই। ইহা কাহার রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

পরবর্তী কালের রচনা

ফলিত জ্যোতিষ সম্পর্কে পরবর্তীকালের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বরাহমিহিরের পুত্র পৃথুযশঃ-এর 'হোরাষট্‌পঞ্চাশিকা,' ভট্টোৎপল প্রণীত 'হোরাশাস্ত্র,' অজ্ঞাত লেখকের 'বিদ্যামাধবীয়' (১৩৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে) ও 'বৃদ্ধবাশিষ্ঠসংহিতা,' হর্ষকীর্তি রচিত 'জ্যোতিষসারোদ্ধার,' অজ্ঞাত লেখকের 'জোতির্বিদ্যাভরণ' (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের পরবর্তী নহে), ও নীলকণ্ঠের

(খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) দুই অংশে রচিত 'তাজিক' ('সংজ্ঞাতন্ত্র' ও 'বর্ষতন্ত্র')।[১]

---

১. ফলিত জ্যোতিষ সংক্রান্ত রচনার সহিত শুভাশুভ লক্ষণ ও ভবিষ্যবাণী সম্পর্কিত রচনা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত; এই জাতীয় রচনার মধ্যে আছে বল্লালসেন ও জগদ্দেব রচিত 'অদ্ভুতসাগর' (খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দী) এবং 'সমুদ্রতিলক' (খৃঃ ১২শ শতাব্দী)। ভয়ভঞ্জনশর্মা রচিত 'রমলরহস্য' হইল ভূমিতে রেখা অঙ্কন করিয়া গণনা সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং বর্তমানে বাওয়ার পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত 'পাশককেবলী' নামে দুইটি রচনায় ঘনক্ষেত্রভিত্তিক গণনা সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

Keith, A. B. : *A Short History of Sanskrit Literature*

Macdonell, A. A. : *A History of Sanskrit Literature*

Weber, A. : *The History of Indian Literature*

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ শাস্ত্র

ধনুর্বিদ্যা

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই ভারতীয়গণ বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহা দুঃখজনক যে তৎসত্ত্বেও গৌণ নানা শাস্ত্র সম্পর্কিত সাহিত্যের অতি অল্প পরিচয়ই আমরা জানি। এইরূপেই ধনুর্বিদ্যা সম্পর্কে আজ কোনও রচনা বিদ্যমান নাই। ধনুর্বিদ্যা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ লেখকগণের মধ্যে বিক্রমাদিত্য, সদাশিব ও শার্ঙ্গদত্তের নাম আমরা জানি।

হস্তী ও অশ্ব সংক্রান্ত বিদ্যা

হস্তী ও অশ্ব সম্পর্কিত বিদ্যা দুইজন প্রাচীন ঋষি পালকাপ্য ও শালিহোত্রের নামের সহিত জড়িত। এ সম্পর্কে অল্প কয়েকটি রচনা পাওয়া যায়। অনিশ্চিত কালের 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' এবং নারায়ণের 'মাতঙ্গলীলা' হস্তী সংক্রান্ত বিদ্যার দুইটি পরিচিতি রচনা। গণ রচিত 'অশ্বায়ুর্বেদ', জয়দত্ত ও দীপঙ্করের 'অশ্ববৈদ্যক,' বর্ধমান রচিত 'যোগমঞ্জরী' ও নকুলের 'অশ্বচিকিৎসা' হইল অশ্ববিদ্যা সম্পর্কিত অদ্যাপি বিদ্যমান কয়েকটি রচনা।

স্থাপত্য

স্থাপত্য সংক্রান্ত সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় এই রচনাগুলিতে— 'বাস্তুবিদ্যা,' সাত অধ্যায়ে নিবদ্ধ 'মনুষ্যালয়চন্দ্রিকা,' চৌত্রিশ অধ্যায় বিশিষ্ট 'ময়মত,' তেইশ অধ্যায়ে নিবদ্ধ 'যুক্তিকল্পতরু,' ভোজ রচিত 'সমরাঙ্গণসূত্রধার', 'বিশ্বকর্মপ্রকাশ,' এবং 'বৃহৎসংহিতা,' 'মৎস্যপুরাণ,' 'অগ্নিপুরাণ', 'গরুড়পুরাণ,' 'বিষ্ণুধর্মোত্তর,' 'কাশ্যপসংহিতা,' শ্রীকুমারের 'শিল্পরত্ন' প্রভৃতি গ্রন্থের কিছু অংশে।

রত্ন বিদ্যা

'অগস্তিমত,' বুদ্ধভট্টের 'রত্নপরীক্ষা' এবং নারায়ণপণ্ডিতের 'নবরত্নপরীক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থে রত্ন বিদ্যা আলোচিত হইয়াছে।

চৌর্য বিদ্যা

চৌর্য বিদ্যা সম্পর্কিত রচনা 'ষন্মুখকল্পে'র উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রন্ধন বিদ্যা

'নলপাক' গ্রন্থটিরও উল্লেখ করা দরকার। ইহাতে রন্ধন কলা আলোচিত হইয়াছে।

সংগীত শাস্ত্র

সংগীত সম্পর্কে 'নাট্যশাস্ত্র' ছাড়াও বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি আছে। এই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে উল্লেখ করা যায় 'সংগীত-মকরন্দ,' সুদর্শনের 'সংগীতসুদর্শন,' শার্ঙ্গদেবের 'সংগীতরত্নাকর,' দামোদরের 'সংগীতদর্পণ' এবং সোমনাথের 'রাগবিবোধ' প্রভৃতি।

নৃত্য বিদ্যা

নৃত্য সম্পর্কিত সাহিত্য বিশদ নহে। এই বিষয়ে 'নাট্যশাস্ত্র' ছাড়া আমরা নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়দর্পণ,' 'শ্রীহস্তমুক্তাবলী'. 'নর্তননির্ণয়' ও আরো কয়েকটি গ্রন্থ পাই।

অঙ্কন বিদ্যা

অঙ্কন সম্পর্কে 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' গ্রন্থে (কাল অনিশ্চিত) একটি বিভাগ ও শ্রীকুমারের 'শিল্পরত্নে' একটি অধ্যায় আছে।

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

Weber, A. : *The History of Indian Literature*

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দর্শন

ক. প্রাচীন ধারা

১৫ ন্যায় : ভূমিকা

ন্যায় মতবাদ বৈশেষিক মতবাদের মতোই বিশ্লেষণধর্মী দর্শন। ন্যায়শাস্ত্রের বিরাট ইতিহাস কুড়িটি শতাব্দী জুড়িয়া বিস্তৃত। ভারতীয় ঐতিহ্যে এই মতবাদকে এক অনন্য মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা সর্বজনীন উচ্চ গৌরব ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

ন্যায় সম্পর্কিত রচনা : (ক) প্রাচীন পন্থী

ন্যায়ের দুইটি সুবিখ্যাত মতবাদ আছে—প্রাচীন ও নব্য। প্রাচীন পন্থার পুরাতনতম জ্ঞাত রচনা হইল গৌতমের 'ন্যায়সূত্র'; ইহা পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অনুমান করা হয় যে 'ন্যায়সূত্র'-সমূহ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের সুপ্রাচীন রচনা।[১] গৌতমের 'ন্যায়সূত্র' সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ টীকা হইল বাৎস্যা-

১. ড. এস. সি. বিদ্যাভূষণ মনে করেন যে গৌতম ইহার মাত্র পাঁচটি অধ্যায় লিখিয়াছিলেন এবং তিনি ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি আরও মনে করেন যে, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে মিথিলার অধিবাসী যে গৌতম 'ধর্মসূত্রে'র রচয়িতা ছিলেন ইনিই সেই ব্যক্তি। তাঁহার মতে গৌতমের আসল মতামত আছে 'চরকসংহিতা'তে ('বিমানস্থান')। কিন্তু 'চরকসংহিতা'ও যথেষ্ট সংশোধিত-পরিমার্জিত হইয়াছে, তাহার কালও অনিশ্চিত। অধ্যাপক ইয়াকোবি মনে করেন যে 'নাট্যসূত্র' ও 'নাট্যভাষ্য' প্রায় একই কালের রচনা, সম্ভবত তাহার ব্যবধান মাত্র একটি পুরুষ। তিনি এই দুইটির কাল নির্ণয় করিয়াছেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক ও পঞ্চম শতকের মধ্যে; খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে শূন্য মতবাদ বিকাশলাভ করিয়াছিল এবং পঞ্চম শতকে বিজ্ঞান মতবাদ সুবিন্যস্ত রূপলাভ করিয়া-

য়নের 'ন্যায়ভাষ্য'। অনুমান করা হয় যে ইহা ৪০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত। বাৎস্যায়নের মতামতের প্রচণ্ড সমালোচনা করেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ। তাঁহার সম্ভাব্য কাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের পর নহে। দিঙ্‌নাগের সমালোচনার বিরুদ্ধে বাৎস্যায়নের পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যেই উদ্যোতকর তাঁহার 'ন্যায়বার্ত্তিক' রচনা করেন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে। অপর একজন খ্যাতনামা বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তি দিঙ্‌নাগের পক্ষ গ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে 'ন্যায়বিন্দু' রচনা করেন। উদ্যোতকর ও ধর্মকীর্তি সম্ভবত সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মোত্তর-কর্তৃক খৃষ্টীয় নবম শতকে 'ন্যায়বিন্দু' সম্পর্কে এক টীকা প্রণীত হয়। খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রথমার্ধে বহুমুখী প্রতিভাধর ও বহুবিধ রচনার লেখক বাচস্পতি উদ্যোতকরের 'ন্যায়বার্ত্তিক' সম্বন্ধে তাঁহার 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা' রচনা করেন এবং 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' (খৃঃ ৮৪১) ও 'ন্যায়সূত্রোদ্ধার' লিখিয়া প্রাচীন চিন্তাধারায় যথেষ্ট উদ্দীপনা আনয়ন করেন। উদয়ন তাঁহার তীক্ষ্ণ যুক্তি ও বিশ্বাস উৎপাদনযোগ্য তথ্যের উপস্থাপনের জন্য খ্যাত। তিনি খৃষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগে (খৃঃ ৯৮৪) বাচস্পতির 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা' সম্পর্কে 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধি' নামক এক টীকা লেখেন। উদয়নের আরও চারিটি বিখ্যাত গ্রন্থ হইল 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি', 'আত্মতত্ত্ববিবেক', 'কিরণাবলী' ও 'ন্যায়পরিশিষ্ট'। প্রাচীন পন্থী ন্যায় মতবাদের অপর বিখ্যাত প্রবক্তা হইলেন জয়ন্ত। তিনি খৃষ্টীয় দশম শতকে 'ন্যায়মঞ্জরী' রচনা করেন। তিনি বাঙালী বংশজাত বলিয়া স্বীকার করা হয়। ভাসর্বজ্ঞ-র 'ন্যায়সার' ভারতীয় ন্যায়ের একটি সমীক্ষা। এই লেখক ছিলেন খৃষ্টীয় দশম শতকের কাশ্মীরী শৈব।

ছিল। অধ্যাপক সুয়ালিও অধ্যাপক ইয়াকোবিকে সমর্থন করেন এবং ৩০০ খৃষ্টাব্দকে ইহার রচনাকাল বলেন। অধ্যাপক গার্বের মতে তারিখটি হইল ১০০ খৃষ্টাব্দ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন যে রচনাটির বহু সংস্কার-সম্পাদনা হইয়াছে। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ ইহার কাল (অবশ্য তাহার বর্তমানরূপের কাল) নির্ণয় করিয়াছেন খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক।

ন্যায়শাস্ত্রের নূতন মতবাদের (নব্য ন্যায়) জনক হইলেন গঙ্গেশ। প্রধানত বঙ্গদেশেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ পাদে লিখিত তাঁহার 'তত্ত্বচিন্তামণি' এক মহৎ কীর্তি। গ্রন্থটিতে ন্যায় মতবাদে স্বীকৃত জ্ঞানের চারিটি উপায় সম্পর্কেই প্রধানত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র বর্ধমান (খৃঃ ১২২৫) উদয়ন ও বল্লভের গ্রন্থ সম্পর্কে টীকা রচনা করিয়া সেই পরম্পরাকে প্রবহমান রাখিয়াছিলেন। মিথিলার জয়দেব (কখনও কখনও পক্ষধর মিশ্র ও জয়দেবকে এক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হয়) খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে 'তত্ত্বচিন্তামণি' সম্পর্কে তাঁহার 'আলোক' গ্রন্থ রচনা করেন। বাসুদেব সার্বভৌম নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রচনা করেন 'তত্ত্বচিন্তামণিব্যাখ্যা'—ইহাই নবদ্বীপ (নদীয়া) ধারার প্রথম সুবৃহৎ রচনা। তাঁহার অন্তত তিনজন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেনঃ প্রখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মগুরু ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, মহান্ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও 'তন্ত্রসার' প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। রঘুনাথ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে 'দীধীতি' ও 'পদার্থখণ্ডন' নামক দুইটি অসামান্য গ্রন্থ রচনা করেন। জগদীশ (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগ) ও গদাধর (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতক) নব্য ধারার দুইজন খ্যাতিমান চিন্তানায়ক। দুইজনেই অন্যান্য বহু টীকা ব্যতীত যথাক্রমে 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' ও 'ব্যুৎপত্তিবাদ' গ্রন্থ দুইটি রচনা করেন। বিশ্বনাথের 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি' (খৃঃ ১৬৩৪) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

ন্যায়ের মূল ভাবধারা

প্রাচীন ধারার নৈয়ায়িকগণ ষোলটি পদার্থ স্বীকার করেন; আর বৈশেষিক মতবাদ দ্বারা বহুল প্রভাবিত নূতন ধারার নৈয়ায়িকগণ তাহার সংখ্যা হ্রাস করিয়া সাতটি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। উভয় ধারার নৈয়ায়িকগণই প্রমাণের চারিটি উপায় মানিয়া চলেন। সেগুলি হইলঃ 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান', 'উপমান' ও 'শব্দ'। তাঁহারা কোনও জ্ঞানের স্ব-প্রকাশ স্বীকার করেন না। বৈশেষিকের মতোই ন্যায় জগৎকে বাস্তিক,

অপরিবর্তনীয় ও কারণহীন পরমাণুর এক যৌগিক বস্তু বলিয়া গণ্য করে।' ন্যায় মতবাদে আত্মা হইল কতকগুলি গুণবিশিষ্ট এক 'বাস্তব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-সম্পন্ন সত্তা'। ঈশ্বর হইলেন পরমাত্মা বা সর্বব্যাপী আত্মা যিনি এক 'নিমিত্তকারণ'-রূপে বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা হিসাবে কাজ করেন, আর পরমাণুগুলি হইল 'উপাদানকারণ'। বিভিন্ন পদার্থের সত্যকার জ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞান) ফলে আবদ্ধ আত্মার 'মুক্তি' লাভ হয় এবং মুক্ত আত্মা সারগতভাবেই সচেতন।

২। বৈশেষিক : ভূমিকা

বৈশেষিক মতবাদকে ঔলূক্য দর্শনও বলা হয়। ন্যায় মতবাদের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ মিল আছে। অবশ্য অনুমান করা হয় যে এই মতবাদের যে প্রাচীনতম গ্রন্থটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে তাহা ন্যায় মতবাদের প্রাপ্ত রচনা হইতে প্রাচীনতর। এইভাবে, কণাদের (কণভক্ষ, কণভুক্ বা কাশ্যপ) 'বৈশেষিকসূত্র' ও প্রশস্তপাদের 'পদার্থধর্মসংগ্রহ'তে ন্যায় মতবাদের কোনরূপ লক্ষণ দেখা যায় না বটে, কিন্তু গৌতমের 'ন্যায়সূত্র' ও বাৎস্যায়নের 'ভাষ্য'তে বোঝা যায় যে উহা বৈশেষিক মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

বৈশেষিক মতবাদ সম্পর্কে রচনা

কণাদের 'বৈশেষিকসূত্রে'র কাল অজ্ঞাত কিন্তু উহাকে খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের পরবর্তীকালের রচনা বলিয়া গণ্য করা হয় এবং অনুমান করা হয় যে উহাতে মাঝে মাঝে সংযোজন হইয়াছিল। 'বৈশেষিকসূত্র' দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রশস্তপাদের রচনাকে সাধারণত 'বৈশোষকসূত্রের' ভাষ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু ইহাকে বৈশেষিক মতবাদের ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রূপেও বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রশস্তপাদকে সাধারণভাবে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের লোক বলা হয়। যদিও ড. কীথের মতে তিনি দিঙ্নাগের পরবর্তী কিন্তু উদ্দ্যোতকরের পূর্ববর্তী। ে স্তপাদের রচনা সম্পর্কে চারিটি সুখ্যাত ভাষ্য আছে। সেগুলি হইল : (১) ব্যোমশিবাচার্য ওরফে

ব্যোমশেখর বা শিবাদিত্য (কাল অজ্ঞাত, সম্ভবত খৃঃ নবম শতাব্দী) প্রণীত 'ব্যোমবতী', (২) শ্রীধর ;(খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষাংশ) প্রণীত 'ন্যায়কন্দলী', (৩) উদয়ন (খৃঃ দশম শতকের শেষভাগ) প্রণীত 'কিরণাবলী' ও 'লক্ষণাবলী', (৪) শ্রীবৎস বা বল্লভ (সম্ভবত খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে) প্রণীত 'ন্যায়লীলাবতী'। শঙ্করের 'উপস্কার' (খৃঃ পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ) কণাদের 'বৈশেষিকসূত্রে'র এক গুরুত্বপূর্ণ টীকা। লৌগাক্ষি ভাস্করের 'তর্ককৌমুদী' প্রশস্তপাদের গ্রন্থের ভিত্তিতে আরেকটি রচনা।

ন্যায় ও বৈশেষিক মতবাদের বিধি নিয়ম সংক্রান্ত রচনা

ভারতীয় দর্শনের ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় মতবাদেরই বিধি নিয়ম সংক্রান্ত রচনার মধ্যে যেগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে তাহা হইল ঃ শিবাদিত্যের 'সপ্তপদার্থী' (খৃঃ একাদশ শতাব্দী), বরদরাজের 'তার্কিকরক্ষা', কেশবমিশ্রের 'তর্কভাষা' (খৃঃ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী), অন্নমভট্ট-র 'তর্ক-সংগ্রহ' ও 'দীপিকা' (খৃঃ ষোড়শ অথবা সপ্তদশ শতাব্দী), জগদীশের 'তর্কামৃত' (খৃঃ ১৬৩৫) এবং বিশ্বনাথের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' বা 'কারিকাবলী' (খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দী) ও তাঁহারই রচিত টীকা 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী'। বৈশেষিক মতবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্তসার হইল জয়নারায়ণের (খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দী) 'বিবৃতি'।

বৈশেষিক মতবাদের মূল চিন্তাধারা

বৈশেষিক মতবাদ মোটামুটিভাবে ন্যায় মতবাদের সহিত মিলিয়া যায়। ইহাতে ছয়টি পদার্থ স্বীকৃত। পরবর্তীকালে তাহার সহিত সপ্তম পদার্থটিকে যুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞানলাভের দুইটি মাত্র উপায় স্বীকৃত—'প্রত্যক্ষ' ও 'অনুমান।' 'শব্দ'কে ইহাতে প্রমাণের এক স্বতন্ত্র উপায় হিসাবে স্বীকার করা হয় না, তাহা অনুমানেরই অন্তর্ভুক্ত। দর্শনের ভাষায় যাহাকে অসৎকার্যবাদ (অস্তিত্বহীন কার্যের সৃষ্টির মতবাদ) ও আরম্ভবাদ (সূচনা সংক্রান্ত মতবাদ যাহার দ্বারা বিশ্ব শাশ্বত পরমাণু হইতে সদ্যোৎপাদিত এক

কার্যরূপে পরিগণিত হয়) বলা হয়, বৈশেষিক ও ন্যায় মতবাদ উভয়েই তাহার প্রবক্তা। বৈশেষিক চিন্তাধারায় মুক্ত অবস্থাতে আত্মার কোনরূপ 'জ্ঞান' থাকে না, আর ন্যায় মতবাদে মুক্ত আত্মা সচেতন।

৩। সাংখ্য: ভূমিকা

সাংখ্য মতবাদকে সকলেই ভারতীয় দর্শনের বিদ্যমান মতবাদসমূহের প্রাচীনতম বলিয়া মনে করেন। উপনিষদে, মহাভারতে, মনুর ধর্মশাস্ত্রে এবং চরকের চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত রচনায় ও অন্যত্র সাংখ্য মতবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ভারতীয় পরম্পরায় এই মতবাদের রচয়িতার গৌরব দান করা হইয়াছে ভগবান বিষ্ণুর অবতার কপিলমুনিকে। কপিলের উত্তরাধিকারীগণ হইলেন আসুরি, পঞ্চশিখ, গার্গ্য ও উলূক। অধ্যাপক গার্বে পঞ্চশিখকে মহান্ মীমাংসাবিদ্ শবরস্বামীর (১০০ হইতে ৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়ের) সমসাময়িক বলিয়াছেন। চৈনিক পরম্পরায় 'ষষ্ঠীতন্ত্রে'র লেখক বলা হয় পঞ্চশিখকে, আবার অন্যান্যদের মতে এই গৌরবের অধিকারী হন বার্ষগণ্য।

সাংখ্য সম্পর্কিত রচনা

সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'সাংখ্যকারিকা'। ইহা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে ঈশ্বরকৃষ্ণ কর্তৃক লিখিত বলিয়া মনে করা হয়।[১] 'কারিকা' সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ টীকা হইল গৌড়পাদ[২]-কৃত টীকা। আরেকটি টীকার নাম 'মাঠর-বৃত্তি'। ইহাকে কেহ কেহ গৌড়পাদের ভাষ্যের উৎস বলিয়া

১. একটি চীনা পরম্পরায় বার্ষগণ্যের একটি লেখার রচনাকার বলা হয় বিন্ধ্যবাসীকে। অধ্যাপক তাকাকুসু বিন্ধ্যবাসী ও ঈশ্বরকৃষ্ণকে একই লোক বলিয়া মনে করেন। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরকৃষ্ণের 'কারিকা'র ভিত্তি প্রাচীনতর। গুণরত্ন অবশ্য বিন্ধ্যবাসী ও ঈশ্বরকৃষ্ণকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। বসুবন্ধুর কাল এখন নির্ণয় হইয়াছে- খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক। ঈশ্বরগুপ্ত বসুবন্ধুর পূর্ববর্তী ছিলেন। চীনা ভাষায় 'কারিকা'র অনুবাদ করেন পরমার্থ (খৃঃ ষষ্ঠ শতক)।

২. তিনি ও 'মাণ্ডূক্যকারিকা'র লেখক একই ব্যক্তি কি না তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কেহ কেহ তাঁহাকে খৃঃ অষ্টম শতকের লোক বলেন।

মনে করেন, আবার কেহ কেহ পরবর্তীকালের রচনা বলিয়া মত প্রকাশ করেন। 'সাংখ্যকারিকা' সম্পর্কে আরও একটি টীকা হইল 'যুক্তিদীপিকা', ভ্রমক্রমে বাচস্পতিকে ইহার রচনাকার বলা হয়। বাচস্পতির 'সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী' (উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) এই মতবাদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ। আর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ হইল 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র'; ইহাতে ছয়টি পরিচ্ছেদ আছে। জনৈক কপিলকে ইহার রচনাকার বলা হয়। কিন্তু এই কপিলকে এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ঋষির সহিত এক করিয়া দেখা যায় না, কারণ গ্রন্থটি বহু পরবর্তী রচনা। উহার রচনাকাল খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী বা তাহার পর, কারণ মাধবের (খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী) 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে উহার উল্লেখ নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে রচিত অনিরুদ্ধের 'সাংখ্যসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থটি 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র' সম্পর্কে টীকামূলক এক গুরুত্বপূর্ণ রচনা। কিন্তু এই মতবাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইল 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র' সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ষুর (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক) টীকা, 'সাংখ্য-প্রবচনভাষ্য'। সাংখ্যদর্শন সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ষু 'সাংখ্যসার' নামে অপর একটি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন।

সাংখ্যদর্শনের মূল কথা

সাংখ্যদর্শন সারগতভাবে দ্বৈতবাদী; তাহাতে পুরুষ (আত্মা) ও প্রকৃতিকে (বস্তু) বলা হইয়াছে দুইটি পারমার্থিকী সত্তা। এই মতবাদের মূল বক্তব্য এই যে 'কারণ'ই হইল সত্তা, 'কার্য' তাহার মধ্যে এক সূক্ষ্ম রূপ লইয়া নিহিত থাকে। এইভাবে এই দর্শন 'সৎকার্যবাদে'র এক মতবাদ প্রচার করে। জগৎকে বলা হয় প্রকৃতিরই বিবর্তন, প্রকৃতিই তাহার বৈষয়িক কারণ। প্রকৃতিকে বর্ণনা করা হইয়াছে 'সত্ত্ব, 'রজঃ' ও 'তমঃ' এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা রূপে। পুরুষকে সংজ্ঞায়িত করা হইয়াছে চৈতন্যাত্মক বলিয়া, তাহা প্রকৃতি হইতে পৃথক। পুরুষের সংখ্যা বহু। এক পরম আত্মা (ঈশ্বর) অথবা ভগবানের অস্তিত্ব নাই—একথা বিশদভাবে বলা হইয়াছে। সাংখ্য মতবাদ জ্ঞানার্জনের তিনটি উপায়কে স্বীকার করে—'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'শব্দ'।

যোগ ও সাংখ্য মতবাদকে একটি সমগ্র মতবাদের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সাংখ্য মতবাদ 'তত্ত্বে'র পরিচায়ক, যোগ 'সাধনা'র। উপনিষদ্‌সমূহে, মহাভারতে, জৈন ও বৌদ্ধ রচনাদিতে যোগ সাধনার উল্লেখ আছে।

যোগ সম্পর্কিত রচনা

পতঞ্জলির[১] 'যোগসূত্র' যোগ মতবাদ সম্পর্কে অদ্যাপি বিদ্যমান প্রাচীনতম রচনা। 'যোগসূত্র' চার অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি এই নামে পরিচিত : 'সমাধি', 'সাধনা', 'বিভূতি' ও 'কৈবল্য'। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে ব্যাস-দেবই আনুমাণিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 'যোগসূত্র' সম্পর্কে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন, এবং পরম্পরাগতভাবে মনে করা হয় যে তিনি ও মহাভারতের রচয়িতা একই ব্যক্তি। 'ব্যাসভাষ্য' সম্পর্কে বাচস্পতি 'তত্ত্ববৈশারদী' নামে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও বিদগ্ধ ব্যাখ্যা রচনা করেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগেশভট্ট 'ছায়া' নামে 'ব্যাসভাষ্যে'র আরেকটি ব্যাখ্যা লেখেন। যোগ মতবাদ সম্পর্কে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা হইল ভোজের (খৃঃ একাদশ শতক) 'রাজমার্তণ্ড', বিজ্ঞানভিক্ষুর (খৃঃ ষোড়শ শতক) 'যোগবার্ত্তিক' ও 'যোগসারসংগ্রহ'। বিজ্ঞানভিক্ষু বাচস্পতির সমালোচনা করিয়াছেন এবং যোগ মতবাদকে উপনিষদের দর্শনের কাছাকাছি আনিয়াছেন।

১. পরম্পরাগতভাবে এই কথা মনে করা হয় যে 'যোগসূত্রে'র রচয়িতা পতঞ্জলি ও ঐ নামেরই বিরাট বৈয়াকরণ, যিনি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে 'মহাভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন, উভয়ে একই ব্যক্তি। কিন্তু এই অভিমতা প্রমাণের সুনির্দিষ্ট কোনও সাক্ষ্য নাই এবং আধুনিক কোনও কোনও পণ্ডিত এই মতের ঘোরতর বিরোধী। 'রাজমার্তণ্ডে'র প্রারম্ভিক শ্লোকগুলিতে ভোজ এই মর্মে একটি ইঙ্গিত দেন যে পতঞ্জলি ('মহাভাষ্য' প্রণেতা), পতঞ্জলি ('যোগসূত্র' প্রণেতা), ও চরক ('চরকসংহিতা' প্রণেতা) একই ব্যক্তি।

রাজযোগ ও হঠযোগ

যোগ মতবাদে আলোচনা করা হইয়াছে কিরূপে মনের একাগ্রতার নিয়মনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটিহীনতা অর্জন করিতে পারি। দৈহিক তথা আধ্যাত্মিক—যোগ মানবপ্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করিবার উপায় শিক্ষা দেয়। যোগ মতবাদ সেই নীতিসমূহকে পরিপূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে যে নীতি অনুযায়ী 'দেহ, সক্রিয় ইচ্ছা ও বোধসম্পন্ন মনকে সুসমঞ্জসরূপে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা যায়'। যোগের ভাষায় ইহার নাম রাজযোগ। যোগের আবার একটি দৈহিক দিকও আছে (হঠযোগ), তাহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে দেহকে বিভিন্ন উপায়ে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই হঠযোগের প্রতি অতিরিক্ত প্রশ্রয় প্রকৃত ত্রুটিহীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়।

যোগ ও সাংখ্য : তুলনা

সাংখ্য মতবাদ হইতে যোগ অন্তত একটি বিষয়ে বস্তুগতভাবে পৃথক। সেই বিষয়টি হইল : সাংখ্য মতবাদ ঈশ্বর সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে কিছু বলে না, কিন্তু যোগ মতবাদ ঈশ্বরকে প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত একটি তৃতীয় পদার্থ রূপেও গণ্য করে এবং মনে করে যে ঈশ্বরে ভক্তিও মুক্তির (কৈবল্য) অন্যতম উপায়।

৫। পূর্বমীমাংসা

পূর্বমীমাংসা, কর্মমীমাংসা বা মীমাংসা মতবাদ প্রধানত বৈদিক অনুশাসনসমূহের ও কতকগুলি প্রয়োগের টীকা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে। এই কারণে তাহার এক নিজস্ব অনন্য গুরুত্ব আছে।

পূর্বমীমাংসা সম্পর্কিত রচনা

পূর্বমীমাংসা সম্পর্কে প্রাচীনতম গ্রন্থ হইল জৈমিনির 'পূর্বমীমাংসাসূত্র'। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে জৈমিনি সম্ভবত খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী অবশ্য জৈমিনি হইলেন মহাভারত প্রণেতা ব্যাসের শিষ্য। কেহ কেহ মনে করেন যে 'মীমাংসাসূত্র' 'ন্যায়সূত্র' ও 'যোগসূত্র' উভয় অপেক্ষাই পরবর্তীকালের রচনা। 'মীমাংসাসূত্র'

সম্পর্কে শবর তাঁহার টীকা লেখেন সম্ভবত খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে। অধ্যাপক ইয়াকোবি মনে করেন যে শবর কর্তৃক উদ্ধৃত 'বৃত্তি' ২০০ ও ৫০১ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালের রচনা। ড. কীথ ইহার রচনাকাল বলেন ৪০০ খৃষ্টাব্দকে। শবরের পূর্বসূরীগণ ছিলেন উপবর্ষ, বোধায়ন, ভ্রাতৃমিত্র, ভবদাস ও হরি। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা ভবদাস ও 'শবরভাষ্যে' উল্লিখিত বৃত্তিকারকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। 'মীমাংসাসূত্র' ও 'ভাষ্য' উভয়ই তিনটি ভিন্ন চিন্তাধারায় পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই তিনটি ধারা প্রভাকর, কুমারিল ও মুরারি নামের সহিত জড়িত। মুরারির ধারাটির পরিচয় কেবলমাত্র তাহার নামেই।

প্রভাকব

প্রভাকর 'গৌড়মীমাংসক' ও 'গুরু' নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি শবরের 'ভাষ্য' সম্পর্কে সম্ভবত ৬০০ খৃষ্টাব্দে 'বৃহতী' নামে এক টীকা রচনা করেন। কাহারও মতে প্রভাকর ছিলেন কুমারিলের পূর্ববর্তী; কিন্তু লোকপরম্পরায় তিনি কুমারিলের ছাত্র বলিয়া কথিত। শালিকনাথের 'ঋজুবিমলা' হইল 'বৃহতী'র একটি টীকা। ইহা প্রায় খৃঃ নবম শতকে লিখিত। উক্ত লেখকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'প্রকরণপঞ্চিকা'। ইহা প্রভাকর মতবাদের একটি উত্তম ও প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা। শালিকনাথ ধর্মকীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন। এই ধা র অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইল ভবনাথের 'ন্যায়বিবেক' (আনুমাণিক খৃঃ ১০৫০—১১৫০)। বাচস্পতি তাঁহার 'ন্যায়কণিকা' গ্রন্থে প্রভাকরবাদীদের দু'টি উপধারা অর্থাৎ প্রাচীন ও নব্য ধারার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন।

ভাট্ট সম্প্রদায়

ভারতীয় দর্শনে কুমারিল একটি বিখ্যাত নাম। প্রাচীন ধারার ব্রাহ্মণ্য মতবাদের সপক্ষে তাঁহার প্রদীপ্ত প্রচারের জন্য তিনি খ্যাত। তিনিই বৌদ্ধ মতবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আজ যে-ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য সম্পর্কে আমরা গর্ববোধ করি, কুমারিল তৎকালে

সেই মনোভাব গ্রহণ না করিলে তাহার অনেকখানিই আজ লুপ্ত হইয়া যাইত। 'শ্লোকবার্ত্তিক', 'তন্ত্রবার্ত্তিক' ও 'টুপ্‌টীকা' কুমারিলের তিনটি মহৎ সৃষ্টি। প্রথমটি ছন্দোবদ্ধ পদে রচিত। ইহা 'মীমাংসাসূত্রে'র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অংশের টীকা। দ্বিতীয়টি গদ্যে লিখিত, মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ পদও আছে। ইহাতে উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয় গ্রন্থটি অবশিষ্ট অংশের টীকা। কুমারিল শঙ্করের পূর্ববর্তী, সাধারণত তাঁহাকে ৭৫০ খৃষ্টাব্দের লোক বলা হয়; যদিও নূতন কিছু তথ্য হইতে দেখা যায় তিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক ছিলেন। 'শ্লোকবার্ত্তিক' সম্পর্কে উম্বেক অথবা ভবভূতি (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। সুচরিতমিশ্র (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে) তাঁহার 'কাশিকা' গ্রন্থে, এবং পার্থসারথিমিশ্র (প্রচলিত মত অনুযায়ী খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী; অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের মতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার 'ন্যায়রত্নাকর' গ্রন্থে 'শ্লোকবার্ত্তিক' সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। 'তন্ত্রবার্ত্তিক' সম্পর্কে ভবদেবভট্ট (খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী) তাঁহার 'তৌতাতিতমততিলক' গ্রন্থে এবং সোমেশ্বরভট্ট ১২০০ খৃষ্টাব্দ তাঁহার 'ন্যায়সুধা' গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। 'টুপ্‌টীকা' সম্পর্কে বেঙ্কটদীক্ষিত তাঁহার টীকা রচনা করেন 'বার্ত্তিকাভরণ' নামে। কুমারিলের পরই একটি বড় নাম হইল মণ্ডন (খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতক); বলা হয়, কুমারিল মণ্ডনের গুরু এবং শ্বশুর। মণ্ডন বাচস্পতির পূর্ববর্তী লোক। পরম্পরায় তাঁহাকে সুরেশ্বর ও বিশ্বরূপের সহিত এক করিয়াই দেখা হয়। তিনি 'বিধিবিবেক', 'ভাবনাবিবেক', 'বিভ্রমবিবেক' ও 'মীমাংসানুক্রমণী' রচনা করেন।[১] প্রথম গ্রন্থটি সম্পর্কে বাচস্পতি তাঁহার 'ন্যায়কণিকা'তে আলোচনা করিয়াছেন।

মীমাংসা সম্পর্কে স্বতন্ত্র রচনা

মীমাংসা মতবাদ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থগুলির মধ্যে এইগুলির উল্লেখ করা যায়ঃ পার্থসারথিমিশ্রের 'শাস্ত্রদীপিকা', মাধবের (খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী)

---

১. মণ্ডনের 'স্ফোটসিদ্ধি' এক গুরুত্বপূর্ণ রচনা। ইহাতে স্ফোট-সংক্রান্ত বৈয়াকরণিক নীতি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

“জৈমিনীয়ন্যায়মালা’, অপ্পয্যদীক্ষিতের ‘উপক্রমপরাক্রম’ ও ‘বিধিরসায়ন’, আপোদেবের (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী) ‘মীমাংসান্যায়প্রকাশ’, লৌগাক্ষি-ভাস্করের (খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দী) ‘অর্থসংগ্রহ’, খণ্ডদেবের (খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দী) ‘ভাট্টদীপিকা’, ‘মীমাংসাকৌস্তুভ’, ও ‘ভাট্টরহস্য’, গাগাভট্টের (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী) ‘ভাট্টচিন্তামণি’, নারায়ণভট্টের (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী) ‘মানমেয়োদয়’ এবং কৃষ্ণযজ্বনের (খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী) ‘মীমাংসা-পরিভাষা’। ‘যুক্তিস্নেহ প্রপূরণী’র রচয়িতা রামকৃষ্ণভট্ট, ‘ময়ূখমালিকা’র লেখক সোমনাথ, এবং দীনকরভট্ট ও কমলাকরভট্টও ভাট্ট মতবাদের লেখক।

মীমাংসার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধ্যানধারণা

পূর্বমীমাংসা মতবাদে জ্ঞানের স্ব-বৈধতাকে স্বীকার করা হয়। জৈমিনি জ্ঞানলাভের শুধু তিনটি উপায়কেই স্বীকার করেন—‘প্রত্যক্ষ’, ‘অনুমান’ ও ‘শব্দ’। ইহার সহিত প্রভাকর আরও দুইটি উপায় যোগ করিয়াছিলেন—‘উপমান’ ও ‘অর্থাপত্তি’। কুমারিল জ্ঞানলাভের উপায় রূপে ‘অনুপলব্ধি’-কেও স্বীকার করেন। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে পূর্বমীমাংসায় ঈশ্বরকে কোনরূপ তাৎপর্যপূর্ণ পদমর্যাদা দেওয়া হয় নাই ; যদিও ‘বেদান্তসূত্র’তে জৈমিনিকে আস্তিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বলিয়া দেখানো হইয়াছে।১

৬। বেদান্ত : ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনের সকল প্রধান ধারার মতবাদের মধ্যে উত্তরমীমাংসা, ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্ত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। এই মতবাদের প্রাচীনতম গুরু ছিলেন আশ্মরথ্য, বাদরি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, ঔড়ুলোমি ও আত্রেয়। ‘বেদান্তসূত্র’তে জৈমিনির সহিত ইঁহাদেরও নামোল্লেখ আছে।

বাদরায়ণের ‘বেদান্তসূত্র’ কিংবা ‘ব্রহ্মসূত্র’ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই সময়টিকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু

১. *Introduction to the Pūrbamīmāṁsā*, **Dr. Pashupatinath Shastri, pp. 132-8**

অন্যরা খৃষ্টপূর্ব ৪০০ হইতে ২০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইহার কাল নির্ণয় করিতে চান।[১]

বেদান্তসূত্র

'বেদান্তসূত্র'সমূহ চারিটি অধ্যায় বিশিষ্ট। প্রথমটিতে পারমার্থিকী সত্তা রূপে ব্রহ্মের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে আছে প্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক মতবাদের আপত্তি সম্পর্কে আলোচনা। তৃতীয়টিতে ব্রহ্মবিদ্যা অর্জনের উপায় অধ্যয়নের কথা বলা হইয়াছে, চতুর্থটিতে আলোচিত হইয়াছে ব্রহ্মবিদ্যার ফলাফল। বেদান্তসূত্রগুলি উপনিষদের শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই রূপে বাদরায়ণ বেদের প্রতি তাঁহার বিরাট ও স্থায়ী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাদরায়ণের বেদান্ত এক ব্রহ্মই অলৌকিক সত্তা—এই কথা বলিয়া একেশ্বরবাদের আদর্শের সপক্ষে প্রচার করে, সাংখ্যাতে যাহা করা হয় নাই। সাংখ্য মতবাদে পুরুষ ও প্রকৃতিকে দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা রূপে কল্পনা করা হয়; বাদরায়ণ সরাসরি এই মতবাদকে খণ্ডন করেন। যে মায়া ব্রহ্মকে দৃষ্টির অগোচরে রাখে এবং তাঁহাকে বহু রূপে প্রতিফলিত করে, সেই মোহসৃষ্টিকারী সত্তা রূপে মায়ার ধারণাটি বিশ্বের দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান। জগতের অস্তিত্ব ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ ব্রহ্মার রূপ আমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। সাংখ্যাতে যেখানে বলা হয় যে জগৎ হইল প্রকৃতিরই 'পরিণাম', বেদান্ত সেখানে বলে যে জগং হইল ব্রহ্মেরই এক বহিঃপ্রকাশ ('বিবর্ত')।

১. ভাবতীয প্রাচীন পবম্পরায় এই লেখককে মহাভাবতকাব ব্যাসেব সহিত এক কবিয়া দেখা হয। শঙ্কবাচার্য অবশ্য কোথাও সুস্পষ্টভাবে বলেন নাই যে ব্যাস (অথবা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, যিনি বিষ্ণুর নির্দেশে বৈদিক ঋষি অপান্তবতমঃ-এব অবতাবরূপে জন্মগ্রহণ কবিযাছিলেন) 'ব্রহ্মসূত্রে'র রচযিতা। তিনি ব্যতিক্রমহীনভাবেই লেখকেব নাম কবিযাছেন বাদরাযণ বলিয়া, কখনও ব্যাস নামটি বলেন নাই এবং স্পষ্টভাবে একথাও বলেন নাই যে উভযেই এক ও অভিন্ন। কিন্তু বাচস্পতি, আনন্দগিবি, রামানুজ, মাধব, বল্লভ ও বলদেবের মতে বাদবাযণ ও ব্যাস একই ব্যক্তি।

বেদান্তের প্রাচীন শিক্ষকগণ

বেদান্তর প্রাচীন শিক্ষকগণের মধ্যে গৌড়পাদের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'কারিক'সমূহে একেশ্বরবাদী বেদান্তের নিয়মানুগ বিচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অপরএকজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক হইলেন ভর্তৃহরি (সম্ভবত খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের)। বলা হয়, ইনি ব্রহ্মসূত্রের এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। শঙ্কর আরেকজন লেখকের ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি হইলেন ভ্রাতৃপ্রপঞ্চ। তাঁহার মতে ব্রহ্ম একাধারে অদ্বৈত এবং দ্বৈত। ইহা ছাড়াও শঙ্কর বৃত্তিকার নামক একজনের কথা বলিয়াছেন। ইঁহার পরিচয় এখনও অজ্ঞাত।[১]

শঙ্কর : তাঁহার কাল ও রচনা

একেশ্বরবাদী বেদান্তের সকল চিন্তানায়কের মধ্যে মহত্তম হইলেন শঙ্কর। অধ্যাপক ম্যাক্স ম্যুলর ও অন্যান্য আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে তিনিই ৭৮৮—৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অমর গ্রন্থ 'শারীরকভাষ্য' রচনা করেন। প্রাচীন মত অনুযায়ী অবশ্য সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধকেই (৬৮৬—৭২০ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার কালরূপে নির্দিষ্ট করা হয়। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য হইল দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচনাশৈলী ও শব্দচয়ন তাঁহার রচনাগুলিকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। শঙ্কর প্রধান দশটি উপনিষদের টীকা রচনা করিয়াছেন এবং বিশেষত, 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ্' সম্পর্কে তাঁহার টীকা বহু বিশিষ্ট চিন্তাবিদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শঙ্করের ব্যাখ্যার ফলে তিনি এরূপ অসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছেন যে বেদান্ত কথাটি বলিলে ব্যতিক্রমহীনভাবে আমরা যেন সে-সম্পর্কে তাঁহার মতামতকেই বুঝিয়া লই।

১. ইনি পাণিনির গুরু, বর্ষের ভ্রাতা উপবর্ষ, কিংবা বোধায়ন কিনা, অথবা দুই ঋষিই একই ব্যক্তি কিনা, কিংবা বৃত্তিকার নামে তৃতীয় কোনও লেখক ছিলেন কিনা, তাহা সুনির্দিষ্টভাব নির্ধারণ করা যায় না।

বিবরণ সম্প্রদায়

'শারীরকভাষ্য' সম্পর্কে টীকা রচনা করা হইয়াছে বিবরণ সম্প্রদায় ও ভামতী সম্প্রদায় নামক দুইটি চিন্তাধারার দিক হইতে। প্রথমোক্ত ধারার মতবাদের মূল উৎস দেখা যায় পদ্মপাদের 'পঞ্চপদিকা' গ্রন্থে। কথিত আছে যে পদ্মপাদ 'ব্রহ্মসূত্র-শারীরকভাষ্যে'র প্রথম পঞ্চম পাদের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মাত্র প্রথম চারিটি সূত্রের টীকা এখন পাওয়া যায়। পদ্মপাদের কাল হইল খৃঃ সপ্তম শতকের শেষ ও অষ্টম শতকের আরম্ভের মাঝামাঝি সময়ে; কারণ তাঁহাকে দেখানো হইয়াছে শঙ্করের শ্রেষ্ঠতম শিষ্যরূপে। 'বিবরণ' 'পঞ্চপাদিকা'র ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ। ইহার রচনাকার প্রকাশাত্মন (সম্ভবত খৃঃ নবম শতকের; অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের মতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ)। প্রকাশাত্মনের মতে ব্রহ্ম হইলেন একাধারে মায়ার 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'। 'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ' নামে 'বিবরণে'র এক সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়াছিলেন বিদ্যারণ্য—ইঁহাকে সাধারণত মাধবের (খৃঃ চতুর্দশ শতক) সহিত এক বলিয়া গণ্য করা হয়।

ভামতী মতবাদ

বাচস্পতির 'ভামতী', অমলানন্দের (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) 'কল্পতরু' ও 'শাস্ত্রদর্পণ' এবং অপ্পয্যদীক্ষিতের (খৃষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী) 'পরিমল'-এ ভামতী মতামত উত্তমরূপেই স্থান লাভ করিয়াছে।

একেশ্বরবাদী বেদান্ত সম্পর্কিত রচনা

শঙ্কর কর্তৃক ভাষ্যকৃত একেশ্বরবাদী বেদান্ত সম্পর্কিত সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সুরেশ্বর (পরম্পরাগতভাবে ইনি ও মণ্ডন একই ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করা হয়। মণ্ডন পরে শঙ্করের শিষ্য হইয়াছিলেন) তাঁহার 'তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্যবর্তিকা', 'বৃহদারণ্যকভাষ্যবর্ত্তিকা' ও 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' রচনা করেন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে।[১] মণ্ডনের

১. কেহ কেহ তাঁহাকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোকও বলেন।

'ব্রহ্মসিদ্ধি' এক অসামান্য গ্রন্থ। ইহাতে তিনি বহু মৌলিক চিন্তার অবতারণা করিয়াছেন। সর্বজ্ঞাত্মমুনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে 'সংক্ষেপশারীরক' রচনা করেন। অবিমুক্তাত্মনের (অথবা বিমুক্তাত্মনের) 'ইষ্টসিদ্ধি' এই মতবাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১১৯০ খৃষ্টাব্দে তীক্ষ্ণ যুক্তি ও অদ্বৈতবাদী তর্কের জন্য বিখ্যাত শ্রীহর্ষ তাঁহার 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' রচনা করেন। ইহা এক অসামান্য দক্ষতাপূর্ণ অবদান। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে চিৎসুখ একই পথ অনুসরণ করিয়া রচনা করেন 'প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা' বা 'চিৎসুখী'। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে বিদ্যারণ্য তাঁহার ছন্দোবদ্ধ জনপ্রিয় গ্রন্থ 'পঞ্চদশী' এবং যথেষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন গ্রন্থ 'জীবন্মুক্তিবিবেক' রচনা করেন। বিদ্যারণ্য এবং তাঁহার গুরু ভারতীতীর্থ যুগ্মভাবে 'বৈয়াসিকন্যায়মালা' রচনা করেন। সদানন্দের 'বেদান্তসার' একেশ্বরবাদী বেদান্তের একটি উত্তম নির্দেশিকা-গ্রন্থ। ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। একেশ্বরবাদী বেদান্ত সম্পর্কে আরেকটি জ্ঞানতাত্ত্বিক নির্দেশিকা-গ্রন্থ হইল 'বেদান্তপরিভাষা'। ইহা ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র কর্তৃক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত। তাঁহার পুত্র রামকৃষ্ণ (খৃষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী) 'শিখামণি' নামে উহার ভাষ্য রচনা করেন। শঙ্করের 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্য' সম্পর্কে অপর দুইটি ভাষ্য হইল আনন্দগিরির 'ন্যায়নির্ণয়' (খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী) ও গোবিন্দানন্দের 'রত্নপ্রভা' (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী)। প্রকাশানন্দের 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী' (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী) এবং অপ্পয্যদীক্ষিতের 'ন্যায়রক্ষামণি' ও 'সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ' একেশ্বরবাদী মতবাদের আরও কয়েকটি মূল্যবান নির্দেশিকা-গ্রন্থ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর জনৈক বাঙালী, মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ব্যাসতীর্থ বা ব্যাসরাজের (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) 'ন্যায়ামৃত'তে উপস্থাপিত প্রতিপক্ষীয় মধ্ব মতবাদের জটিল ও দুর্বোধ্য সমালোচনা আছে। ব্রহ্মানন্দের 'গৌড়ব্রহ্মানন্দী' বা 'লঘুচন্দ্রিকা' হইল রামাচার্যের (ওরফে রামতীর্থ বা ব্যাসরাম) 'তরঙ্গিণী'তে (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ) উত্থাপিত সমালোচনার বিরুদ্ধে 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র পক্ষ সমর্থনে লিখিত গ্রন্থ।

বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র'কে বিভিন্ন মতের বহু মহৎ চিন্তাবিদ্ বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই লিখিয়াছেন শঙ্করের পর। এরূপ এক চিন্তানায়ক ছিলেন ভাস্কর। তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে কিংবা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোনও এক সময়ে তাঁহার 'ভাষ্য' রচনা করেন। ভাস্কর ছিলেন ভেদাভেদবাদের প্রবক্তা।

রামানুজ

'ব্রহ্মসূত্রে'র আরেকজন মহান ভাষ্যকার হইলেন রামানুজ। তাঁহাকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বলা হয়। তাঁহার দর্শন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বরই হইলেন একমাত্র সত্তা, কিন্তু তিনি সচেতন আত্মা ও অচেতন বস্তুজগতের এক সম্মিলিত রূপ। রামানুজের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস ছিল আল্বার বা দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব সাধুগণের তামিল গাথাসমূহ। আল্বারগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন নাথমণি ও যামুনাচার্য (খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী)। রামানুজের ভাষ্যের নাম 'শ্রীভাষ্য'। সুদর্শনের (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) 'শ্রুতপ্রকাশিকা' 'শ্রীভাষ্যে'র এক সুপরিচিত টীকা। বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিক (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) সম্ভবত রামানুজের মহত্তম উত্তরসূরী ছিলেন। তিনি 'শতদূষণী', 'তত্ত্বটীকা' ('শ্রীভাষ্য' সম্পর্কে একটি টীকাভাষ্য) ও 'সেশ্বর-মীমাংসা'র লেখক।

নিম্বার্ক

'ব্রহ্মসূত্রে'র অপর একজন ভাষ্যকার হইলেন নিম্বার্ক। তাঁহার ভাষ্যের নাম 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ'। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা। এই মতবাদ সামান্য কয়েকটি ব্যাখ্যাগত পার্থক্য ব্যতীত ভাস্করের মতামতের নিকটবর্তী। নিম্বার্ক খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য 'বেদান্তকৌস্তুভ' নামে একটি ভাষ্য রচনা

করিয়াছিলেন। এই মতবাদের অনুগামী কেশবকাশ্মীরী) খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী) 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামে গীতার একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

৪. মধ্ব

'ব্রহ্মসূত্র' সম্পর্কে আরেকজন ভাষ্যকার হইলেন মধ্ব। ইঁহার জন্ম ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে। ভাষ্য রচনা ছাড়াও তিনি 'অনুব্যাখ্যান' নামক আরেকটি গ্রন্থে তাঁহার কৃত ব্যাখ্যার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি শুদ্ধ দ্বৈতবাদের প্রচারক।

অপর একজন ভাষ্যকার হইলেন বল্লভ। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক ছিলেন। তাঁহার কৃত ভাষ্যের নাম 'অনুভাষ্য'। তিনি যে তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন তাহা হইল শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। তিনি জগৎকে দেখেন একটি সত্তা রূপে, সূক্ষ্মতম অবয়বে উহাই ব্রহ্ম।

৫. গৌড়ীয়

সর্ব শেষে উল্লেখ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মতবাদ। তাঁহারা 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র প্রবক্তা। ইঁহাদের কথা সর্বশেষে উল্লেখ করা হইলেও, ইঁহারা কোনো অংশেই সামান্য নহেন। নিজেদের মধ্ব মতবাদের একটি শাখা বলিয়া অভিহিত করিলেও, দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া নিম্বার্কের মতবাদের সহিত ইঁহাদের অনেকখানি মিল আছে এবং কখনও বা তাঁহারা শঙ্করকেও অনুসরণ করেন। এই মতবাদের উদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শিক্ষা হইতে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বঙ্গদেশে খ্যাতিমান ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তি ও শিষ্য রূপগোস্বামী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাধর পণ্ডিত। তিনি নাটক, অলংকারশাস্ত্র ও দর্শন সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার লিখিত ভাগবতের দশম অধ্যায়ের ভাষ্য 'বৈষ্ণবতোষিণী' গ্রন্থটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য জীবগোস্বামীও বিরাট পণ্ডিত ও প্রচুর গ্রন্থের লেখক। তাঁহার ছয়টি 'সন্দর্ভ' ('ক্রমসন্দর্ভ,' 'তত্ত্বসন্দর্ভ,' 'ভক্তিসন্দর্ভ'

প্রভৃতি) এবং 'সর্বসংবাদিনী' গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক অসামান্য গ্রন্থ। বলদেব বিদ্যাভূষণ (খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী) গৌড়ীয় বৈষ্ণব দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী 'ব্রহ্মসূত্রে'র ভাষ্য 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করেন। তাঁহার 'প্রমেয়রত্না-বলীও' একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ।

খ. প্রচলিত মতবিরোধী মতবাদ

(ক) বৌদ্ধ দর্শন : ভূমিকা

বৌদ্ধগণ গৌতম বুদ্ধের অনুগামী। বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকের কোন এক সময়ে জনসাধারণের ভাষায় তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। পালিভাষায় লিখিত 'তিপিটক' বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন গ্রন্থ। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত : (১) বিনয়পিটক, (২) সুত্তপিটক ও (৩) অভিধম্মপিটক। ধর্মীয় অনুশাসন-সংক্রান্ত রচনা ছাড়াও বৌদ্ধ-সাহিত্য অন্য ধরনের রচনাতেও সমৃদ্ধ এবং উহাও পালি ভাষায় লিখিত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বৌদ্ধ সাহিত্য ইহা অপেক্ষাও ব্যাপক পরিধি-সম্পন্ন এবং ইহার মধ্যে সংস্কৃত রচনার একটি দীর্ঘ তালিকাও আছে। এ-সম্পর্কে পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।[১]

বৌদ্ধ দর্শনের চারিটি সম্প্রদায়

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ব্যাপকভাবে চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার। জৈনধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে না। বৌদ্ধগণ জ্ঞানের দুইটি মাত্র উপায়কে স্বীকার করেন : 'প্রত্যক্ষ' ও 'অনুমাণ'। উপরে বর্ণিত চারিটি মতবাদের মধ্যে তীব্র বিরোধ থাকিলেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে মনোভাবের ক্ষেত্রে তাহারা একমত। চৈনিক পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ বলেন—যাঁহারা বোধিসত্ত্বগণের পূজা করেন এবং মহাযানসূত্র অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা মহাযানপন্থী ; আর যাঁহারা এই সমস্ত ক্রিয়া করেন না, তাঁহারা হীনযানপন্থী। মহাযানপন্থীরা দুইটি শাখায় বিভক্ত—(১) মাধ্যমিক ও (২) যোগাচার। হীনযানপন্থীদেরও

১. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৫৮—৭৪

দুইটি বিভাগ—(১) বৈভাষিক ও (২) সৌত্রান্তিক। উভয়কেই সর্বাস্তিবাদী নামে অভিহিত করা হয়।

১. বৈভাষিক

বৈভাষিকগণ 'সূত্রে'র প্রাধান্য অস্বীকার করেন এবং 'অভিধম্ম'র ভাষ্য 'বিভাষে'র সহিত নিজেদের যুক্ত করেন। তাঁহাদের প্রধান গ্রন্থ হইল কাত্যায়নীপুত্রের 'জ্ঞানপ্রস্থান' (বুদ্ধের নির্বাণ লাভের প্রায় তিনশত বৎসর পরে রচিত)। বসুমিত্রের নেতৃত্বে পাঁচশত অর্হৎ কর্তৃক 'মহাবিভাষ' নামক ভাষ্য সংকলিত হইয়াছিল সম্ভবত কনিষ্কের মহাসঙ্গীতির পর। 'উদানবগ্‌গ', 'ধম্মপদ', 'একোত্তরাগমে'র খণ্ডাংশ, অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' এবং আর্যশূরের 'জাতকমালা' এই মতবাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা হয়। ভদন্ত (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক), ধর্মত্রাতা ও ঘোষক এই মতের অপর কয়েকজন প্রবক্তা।

২. সৌত্রান্তিক

হিউয়েন সাঙের (য়ুআন চোয়াঙ) মতে নাগার্জুনের সমসাময়িক কুমারলাত (বা কুমারলব্ধ) ছিলেন সৌত্রান্তিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। 'সূত্রে'র উপর তাঁহাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত, এই কারণেই তাঁহাদের নাম সৌত্রান্তিক। সুস্পষ্টরূপে বলিতে গেলে, তাঁহারা বৈভাষিকগণের মতো 'সুত্তপিটক'কে (ইহাতে ভগবান বুদ্ধের উপদেশবাণী আছে) অস্বীকার না করিয়া, তাহাকেই মানেন এবং অপর দুইটি পিটককে বাতিল করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মতবাদের কোনো রচনাই আজ পাওয়া যায় না। যুক্তিবিজ্ঞানী ধর্মোত্তর ও বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোষে'র ভাষ্য রচয়িতা যশোমিত্র এই মতবাদের অনুগামী বলিয়া কথিত আছে।

৩. মাধ্যমিক

মাধ্যমিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নাগার্জুন। মহাযানসূত্রের সর্বশেষ রচনা 'শতসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' তাঁহারই রচনা বলা হয়। প্রসঙ্গত

উল্লেখ করা যাইতে পারে, 'প্রজ্ঞাপারমিতা' ঘোষণা করে যে 'শূন্যতা' সম্পর্কে জ্ঞানই সর্বোচ্চ জ্ঞান। মাধ্যমিক মতবাদের সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা হইল নাগার্জুনের 'মাধ্যমিককারিকা' বা 'মাধ্যমিকসূত্র'। দ্বিতীয় গ্রন্থটি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে নিবদ্ধ এবং ইহাতে মোট চারিশত শ্লোক আছে। নাগার্জুন তাঁহার নিজের গ্রন্থেরই একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'অকুতোভয়'। দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থটি আমরা সংস্কৃত ভাষায় পাই নাই। নাগার্জুন-লিখিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'যুক্তিষষ্টিকা', 'শূন্যতাসপ্ততি', 'প্রতীত্যসমুৎপাদহৃদয়', 'মহাযানবিংশক' ও 'বিগ্রহব্যাবর্তনী'। নাগার্জুনকে সাধারণত খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক (দলাই লামার সংগ্রহশালায় রক্ষিত পরম্পরা অনুযায়ী) ও খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালের লোক বলা হয়। যাহাই হউক তিনি ৪০১ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালের নহেন। সেই সময়ে কুমারজীব চীনা ভাষায় তাঁহার জীবনী অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'বোধিচর্যাবতার' ও 'শিক্ষাসমুচ্চয়'-রচয়িতা শান্তিদেবকে (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী) কখনও মাধ্যমিক, কখনও যোগাচার মতবাদের প্রবক্তা বলা হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীতে চন্দ্রকীর্তি কতৃক লিখিত 'প্রসন্নপদা' নামক ভাষ্যটি মাধ্যমিক সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেব লেখেন 'চতুশ্‌শতক'। ইহাও মাধ্যমিক মতবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। চন্দ্রকীর্তি ইহার ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। আর্যদেবের অন্যান্য গ্রন্থগুলি হইল— 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ', 'হস্তবালপ্রকরণ' এবং 'লঙ্কাবতারে'র কয়েকটি অংশের ভাষ্যমূলক অপর দুইটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

৪. যোগাচার

যোগাচার মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অসঙ্গের গুরু মৈত্রেয়নাথ। অসঙ্গ তাঁহার মতবাদের জটিল বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে করা হয়। অসঙ্গ অন্তত খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের লোক ছিলেন, যদিও কেহ কেহ খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীকে তাঁহার কাল বলিতে চাহেন। যোগাচার সম্প্রদায়ের মতে চেতনা বা 'বিজ্ঞানে'র ঊর্ধ্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই। 'অভিসময়ালংকারকারিকা' এবং সম্ভবত 'মহাযানসূত্রালংকার' (অধ্যাপক লেভি

উহাকে অসঙ্গের রচনা বলিয়াছেন) এবং 'অভিধর্মের' ভঙ্গীতে লিখিত গদ্য রচনা 'যোগাচারভূমিশাস্ত্র' মৈত্রেয়নাথের রচনা।[১] অশ্বঘোষ যোগাচার মতবাদের অনুগামী ছিলেন। তিনি অন্যান্য বহু গ্রন্থের মধ্যে 'মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' লেখেন। ইহা পূর্ববর্তী এক পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।[২] বৌদ্ধসাহিত্যে বসুবন্ধু অসঙ্গ নামটি একটি মহান নাম। তাঁহাকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলা হয়, যদিও কেহ কেহ বলেন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর। ছয়শত শ্লোকে নিবদ্ধ তাঁহার গ্রন্থ 'অভিধর্মকোষ' বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রে এক স্থায়ী অবদান। গ্রন্থটি মূল সংস্কৃত ভাষায় আমাদের নিকট আসে নাই। এই গ্রন্থে লেখক প্রধানত বৈশেষিকদের অভিমত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার 'পরমার্থসপ্ততি' গ্রন্থে সাংখ্যতত্ত্ব সমালোচিত হইয়াছে। যশোমিত্র 'অভিধর্মকোষব্যাখ্যা' নামে 'অভিধর্মকোষে'র এক ভাষ্য রচনা করেন। চীনা ভাষায় ইহার প্রাচীনতম অনুবাদ হয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহা হইতে আমরা বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকদের মতামত জানিতে পারি। বসুবন্ধু 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' নামে এক বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; উহার মধ্যে আছে দুইটি রচনা—'বিংশতিকা' ও 'ত্রিংশিকা'। ইহাতে চেতনা বা 'বিজ্ঞানে'র বাস্তবতার মতবাদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অপর কয়েকটি গ্রন্থ, যেমন 'পঞ্চস্কন্ধপ্রকরণ', 'ব্যাখ্যাযুক্তি', 'কর্মসিদ্ধিপ্রকরণ' এবং 'মহাযানসূত্রালংকার' ও 'প্রতীত্যসমুৎপাদসূত্র' সম্পর্কে দুইটি ভাষ্য, 'মধ্যান্তবিভাগ' এবং 'অপরিমিতায়ুঃসূত্রোপদেশ'ও বসুবন্ধুর রচনা বলা হয়। বসুবন্ধুর মতবাদের অনুগামীদের মধ্যে ইঁহাদের নাম অবশ্য উল্লেখ্য: স্থিরমতি, দিঙ্‌নাগ, ধর্মপাল ও শীলভদ্র। স্থিরমতি বসুবন্ধুর 'ত্রিংশিকা-বিজ্ঞপ্তি'র একটি ভাষ্য রচনা করেন এবং ধর্মপাল রচনা করেন 'বিংশতিকা-বিজ্ঞপ্তি'র ভাষ্য। দিঙ্‌নাগ ছিলেন আর্য অসঙ্গের ভ্রাতা বসুবন্ধুর শিষ্য। দিঙ্‌নাগের

১. অসঙ্গের নাম তাঁহার গুরু মৈত্রেয়নাথ অপেক্ষা অধিকতর বিখ্যাত হইয়াছে। শেষোক্তের রচনাকে পূর্ববর্তী ব্যক্তির রচনা বলা হয় কেন ইহা হইতেই তাহার ব্যাখ্যা মেলে। তিব্বতীগণ ও হিউয়েন সাঙের মতে 'যোগাচারভূমিশাস্ত্র'কে অসঙ্গের রচনা বলা হইয়াছে।

২. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৬৮।

কাল সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নাই। কেহ তাঁহাকে বলেন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক ; অন্যেরা বলেন ৫২০ ও ৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী। তাঁহারা তাঁহাকে কনৌজের রাজা শ্রীহর্ষের গুরু গুণপ্রভ-র সমসাময়িক বলিয়া মনে করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ভাষ্যকার মল্লিনাথ কালিদাসের 'মেঘদূতে' এই দিঙ্‌নাগের উল্লেখ পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। দিঙ্‌নাগের 'প্রমাণসমুচ্চয়', 'প্রমাণশাস্ত্রপ্রবেশ' ও অন্যান্য রচনা তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত আছে এবং জাপানে উহা অত্যন্ত জনপ্রিয়। দিঙ্‌নাগের যে একটিমাত্র সংস্কৃত রচনা বর্তমানেও পাওয়া যায় সেটি হইল 'ন্যায়প্রবেশ'। ধর্মকীর্তি (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দী) 'ন্যায়বিন্দু' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন এবং ধর্মোত্তর (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী) তাঁহার 'ন্যায়বিন্দুটীকা'তে তাহার ভাষ্য রচনা করেন। শীলভদ্র (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী) ছিলেন নালন্দার বৌদ্ধবিহারের প্রধান এবং য়ুআন চোয়াঙ (হিউয়েন সাঙ) তাঁহারই নিকট হইতে বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে স্বীয় জ্ঞান অর্জন করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শান্তরক্ষিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামে এক বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তিনি প্রতিপক্ষীয় মতবাদের বহু দার্শনিকের মতামতের সমালোচনা করেন। কমলশীল তাঁহার 'পঞ্জিকা'তে এই গ্রন্থের ভাষ্য লেখেন।১

(খ) জৈনদর্শন : দুইটি মতবাদ

জৈনরা জিনের অনুগামী। জিন কথাটি সর্বশেষ অবতার বর্ধমানের উদ্দেশে প্রদত্ত উপাধি। বর্ধমান বলিয়াছিলেন যে তিনি ছিলেন পূর্ববর্তী তেইশ জন জ্ঞানীর প্রত্যেকের মতবাদের ব্যাখ্যাতা। জৈনগণ দুইটি মতবাদে বিভক্ত : (১) শ্বেতাম্বর ও (২) দিগম্বর। আমরা জানিতে পারি যে এই বিভাগটি ঘটে সুদূর খৃষ্টীয় প্রথম শতকেই। শ্বেতাম্বর জৈনদের ধর্মানুশাসন সংক্রান্ত ও দার্শনিক গ্রন্থাদি আছে কিন্তু দিগম্বর জৈনদের ধর্মানুশাসনগত কোনও গ্রন্থ নাই। শ্বেতাম্বর গোষ্ঠীর ধর্মানুশাসনগত সাহিত্যে আছে চুরাশিটি খণ্ড, তাহার ভিতর একচল্লিশটি হইল সূত্র। উভয় সম্প্রদায়ই বেদের প্রাধান্য

১ বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে পরবর্তীকালের এক.. রচনা হইল অদ্বয়বজ্রের গ্রন্থটি। তাঁহাকে খৃষ্টীয় একাদশ শতকের শেষ বা দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভের লোক বলা হয়।

অস্বীকার করে এবং সেইহেতু প্রাচীন পন্থী হিন্দু দার্শনিকগণ কর্তৃক উহা প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী দর্শন নামে অভিহিত।

১. দিগম্বর

প্রাচীনতম যে-দিগম্বর লেখককে শ্বেতাম্বর গোষ্ঠীও পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, তিনি হইলেন কুন্দকুন্দ। তাঁহাব সব কয়টি গ্রন্থই প্রাকৃতে লিখিত। সংস্কৃত ভাষায় প্রথম দিগম্বর লেখক হিসাবে যাঁহার নাম জানা যায় তিনি হইলেন উমাস্বামী; ইনি উমাস্বাতি (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী) নামেও পরিচিত। ইঁহার 'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র'কে (দশ পরিচ্ছেদে নিবদ্ধ) উভয় সম্প্রদায়ই প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করেন। সিদ্ধসেন দিবাকরও একজন সুবিখ্যাত দিগম্বর দার্শনিক। তিনি সম্ভবত খৃষ্টিয় পঞ্চম শতকে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। 'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' সম্পর্কে তাঁহার ভাষ্য, এবং 'ন্যায়াবতার' ও 'সম্মতি-তর্কসূত্র' নামক অপর দুইটি গ্রন্থও গুরুত্বপূর্ণ রচনা। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমন্তভদ্র নামক জনৈক দিগম্বর 'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' সম্পর্কে একটি ভাষ্য রচনা করেন। তাহাতে 'আপ্তমীমাংসা' শীর্ষক একটি ভূমিকা আছে এবং সেই ভূমিকার সহিত কুমারিল ও বাচস্পতি উভয়েই পরিচিত ছিলেন। সমন্তভদ্রের অন্যান্য গ্রন্থের নাম 'যুক্ত্যনুশাসন' ও 'রত্নকাবণ্ড-শ্রাবকাচার'। খুব সম্ভবত এই শতাব্দীতেই অকলঙ্কও জীবিত ছিলেন। 'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' ও 'আপ্তমীমাংসা' সম্পর্কে তাঁহার দুইটি ভাষ্য যথাক্রমে 'তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিকা' ও 'অষ্টশতী'র নাম উল্লেখযোগ্য। কুমারিল তাঁহার মতের প্রচণ্ড বিরোধিতা করিয়াছেন। বিদ্যানন্দ 'অষ্টসাহস্রী', 'তত্ত্বার্থ-বার্ত্তিকা', 'আপ্তপরীক্ষা', 'পাত্রপরীক্ষা', 'প্রমাণপরীক্ষা' ও 'প্রমাণনির্ণয়' গ্রন্থগুলি রচনা করিয়া অকলঙ্ককে কুমারিলের সমালোচনা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। মাণিক্যনন্দী রচনা করেন 'পরীক্ষামুখসূত্র'। উহা অকলঙ্কের 'ন্যায়বিনিশ্চয়ে'র ভিত্তিতে রচিত। কুন্দকুন্দের শিষ্য বলিয়া কথিত প্রভাচন্দ্র তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন—'প্রমেয়কমলমার্তণ্ড' ও 'ন্যায়কুমুদচন্দ্রোদয়'। সাধারণত মনে করা হয় যে প্রভাচন্দ্র অকলঙ্কের শিষ্য। কিন্তু 'প্রমেয়কমলমার্তণ্ডে'র উপসংহারে বলা হইয়াছে যে গ্রন্থটি রচিত

হয় ধারার ভোজের শাসনকালে। আরেকজন দিগম্বর জৈন শুভচন্দ্র ছন্দোবদ্ধ পদে তাঁহার দার্শনিক্ গ্রন্থ 'জ্ঞানার্ণব' রচনা করেন খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে।

২. শ্বেতাম্বর

প্রাচীনতম শ্বেতাম্বর জৈন দার্শনিক হইলেন হরিভদ্র। তিনি দিঙ্‌নাগের 'ন্যায়প্রবেশে'র একটি ভাষ্য, 'যোগদৃষ্টিসমুচ্চয়', 'যোগবিন্দু' ও 'ধর্মবিন্দু' ছাড়াও 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' ও 'লোকতত্ত্বনির্ণয়' নামক দুইটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। খৃষ্টীয় নবম শতককে তাঁহার কাল বলিয়া মনে করা হয়। খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষভাগে অমৃতচন্দ্র কয়েকটি ভাষ্য ছাড়াও 'তত্ত্বার্থসার' ও 'পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়' রচনা করেন। হেমচন্দ্র হইলেন এক বিরাট জৈন দার্শনিক। তাঁহার 'প্রমাণমীমাংসা' জৈন দর্শন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মল্লিষেণ হেমচন্দ্রের 'অন্যযোগব্যবচ্ছেদিকা'র একটি ভাষ্য লেখেন 'স্যাদ্বাদমঞ্জরী' নামে। আশাধরও একই শতাব্দীর লোক। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে 'ধর্মামৃতে'র নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেই একই শতাব্দীর অপর একজন লেখক দেবেন্দ্রসূরী রচনা করেন 'সিদ্ধপঞ্চাশিকা', 'বন্দারুবৃত্তি' ও 'উপমিতিভবপ্রপঞ্চ-কথা-সারোদ্ধার'। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সকলকীর্তি দ্বাদশ পরিচ্ছেদে এক সুবিশাল গ্রন্থ লেখেন; তাহার নাম 'তত্ত্বার্থসারদীপক'। শ্রুতসাগর সেই একই শতাব্দীর লোক। তিনি লেখেন 'জিনেন্দ্রযজ্ঞবি॰ ও 'তত্ত্বার্থদীপিকা'। সপ্তদশ শতাব্দীতে যশোবিজয় খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি রচনা করেন 'জ্ঞানবিন্দুপ্রকরণ' ও 'জ্ঞানসার'।

(গ) বস্তুবাদ : চার্বাক : ভূমিকা

ভারতীয় বস্তুবাদীগণের মতবাদের সারবস্তু প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক রূপক নাটকে যথাযথভাবে ও অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে—"লোকায়তই একমাত্র শাস্ত্র। এই মতবাদে প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র প্রমাণ। ভূত সংখ্যায় চারিটি—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু। অর্থ ও কাম হইল

পুরুষার্থ। ভূতসমূহই চেতনাপ্রাপ্ত হয়। পরলোক নাই। মৃত্যুই হইল অপবর্গ (পরিণাম)।"[১] 'লোকায়ত' শব্দটি (ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ভোগের জগতের দিকে চালিত) বস্তুবাদের সংস্কৃত। ইহা হইল শাস্ত্রটির নাম। বস্তুবাদীগণকে লোকায়তিক অথবা এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুযায়ী চার্বাক বলা হয়।

চার্বাক দর্শন সম্পর্কে উল্লেখ

চার্বাকের কাহিনী মহাভারতে আছে। চার্বাকের মতবাদের উল্লেখ আছে মহাভারতের শল্যপর্ব ও শান্তিপর্বে, বিষ্ণুপুরাণে ও 'মনুস্মৃতি'তে। এই মতবাদকে সেখানে দেখানো হইয়াছে সর্বাত্মক ধ্বংসকামী ও প্রচলিত ধর্মমত-বিরোধীদের মতবাদরূপে। কখনও কখনও চার্বাককে বৃহস্পতির সহিত এক করিয়া দেখা হয়। অসুরদিগের ধ্বংসসাধনের জন্য বৃহস্পতি নাস্তিক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। বস্তুবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলা হয় বৃহস্পতির 'সূত্র'কে। উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মাধবের 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে'র প্রথম পরিচ্ছেদে এই মতবাদের এক সংক্ষিপ্তসার আছে। অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের তর্কমূলক গ্রন্থাদিতেও বর্তমানে দুর্লভ সূত্রাদির উদ্ধৃতি পাওয়া সম্ভব হয়।

প্রাচীন গুরুগণ

ধর্মমতবিরোধী প্রাচীন গুরুগণের মধ্যে সন্দেহবাদী সঞ্জয়, বস্তুবাদী অজিত কেশকম্বলী, উদাসীনতাবাদী পুরাণ কাশ্যপ, নিয়তিবাদী মস্করী গোসাল, ভৌতবাদী ককুদ় কাত্যায়নের নাম উল্লেখযোগ্য।

বস্তুবাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়

বস্তুবাদীরা আবার বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন—যাঁহারা দেহকে আত্মন্ বা অহং-এর সহিত একাকার করিয়া দেখিতেন, যাঁহারা অহংকে বাহ্যিক

১. দ্বিতীয় অঙ্ক।

ইন্দ্রিয়ের সহিত একাকার করিতেন, যাঁহারা অন্তঃকরণকেই তাঁহাদের অহং বলিয়া গণ্য করিতেন ইত্যাদি। মাধব কর্তৃক উদ্ধৃত বহুল প্রচারিত কয়েকটি শ্লোকে বস্তুবাদীগণ সম্পর্কে এক জনপ্রিয় অভিমত পাওয়া যায়। যথা :

'অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্ ।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা ॥'...
'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥'...ইত্যাদি

গ. দর্শন বিষয়ক বিবিধ রচনা

শ্রীকণ্ঠভাষ্য: শ্রীকণ্ঠ ওরফে নীলকণ্ঠ (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দী) প্রণীত 'ব্রহ্মসূত্র'র ভাষ্য—বিশিষ্ট শিবাদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত—অনেকটা রামানুজ কর্তৃক গৃহীত পথে—অপ্পয্য দীক্ষিত তাঁহার 'শিবার্কমণিদীপিকা'য় এই গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন (বলা হয় যে অপ্পয্য প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে অদ্বৈত-বেদান্তবাদীতে পরিণত হন)।

শ্রীকরভাষ্য: শ্রীপতি পণ্ডিতকৃত 'ব্রহ্মসূত্রে'র ভাষ্য—দ্বৈতাদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গীর রচনা।

গীতার ভাষ্য 'সুবোধিনী', এবং ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের ভাষ্য: শ্রীধরস্বামী রচিত (খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী)—ইঁহাকে শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদের এক প্রবক্তা বলিয়া দাবি করা হয়, তিনি তাঁহার ভাগবতের ভাষ্যে শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন। [বল্লভাচার্য (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী) এই মতবাদের একজন পরবর্তী প্রবক্তা। তিনি আবার চিৎসুখেরও উল্লেখ করিয়াছেন; তাই এমনও হইতে পারে যে তিনি অদ্বৈত মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভক্তিবাদের প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল। ভক্তি ও জ্ঞানবাদের মধ্যে এইরূপ আপোষ মধুসূদন সরস্বতীর 'ভক্তিরসায়নে'ও দেখা যায়। মধুসূদন ছিলেন অদ্বৈত দর্শনের দৃঢ় সমর্থক।]

সর্বদর্শনসংগ্রহ: মাধবাচার্য প্রণীত। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা, বৈদিক সাহিত্যের প্রখ্যাত ভাষ্যকার সায়ণ ছিলেন বিজয়নগরের রাজা হরিহর ও বীর বুক্কর (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী) রাজসভার লোক। তিনি পরে সন্ন্যাসী হন এবং শৃঙ্গেরী মঠে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। গ্রন্থটি ভারতীয় দর্শনের এক মূল্যবান কোষগ্রন্থ, উহাতে ভারতীয় দর্শনের প্রাচীন ও প্রচলিত মতবিরোধী সতেরটি বিভিন্ন মতবাদের পরিচয় আছে।

সর্বসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ: শঙ্করাচার্যের রচনা বলা হইলেও, মনে হয় অপেক্ষাকৃত

আধুনিক কাহারও রচনা, যিনি সম্ভবত শঙ্কর মঠের অন্যতম পরবর্তী মঠাধ্যক্ষ ছিলেন—'সর্বদর্শনসংগ্রহ' ধরনের রচনা, যদিও সহজ শ্লোকে রচিত।

বিজ্ঞানামৃতভাষ্য : বিজ্ঞানভিক্ষু (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) রচিত। তিনি 'ব্রহ্মসূত্রে'র এই ভাষ্যটি রচনা করিয়া একদিকে সাংখ্য ও যোগ মতবাদ ও অপরদিকে বৈদান্তিক (ঔপনিষদিক) মতবাদের মধ্যে এক আপোস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শক্তিভাষ্য : খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর পঞ্চানন তর্করত্ন প্রণীত—'ব্রহ্মসূত্রে'র ভাষ্যের ধরনে একটি বুদ্ধিদীপ্ত রচনা। অবশ্য ইহা গোঁড়া শাক্তাগম দৃষ্টিভঙ্গীকে যথাযথ অনুসরণ করে না।

গ্রন্থপঞ্জী

Das Gupta, S. N. : *History of Indian Philosophy*, Vols. I, II & III

Keith, A. B. : *A History of Sanskrit Literature*

Radhakrishnan, S. : *Indian Philosophy*, Vols. I & II

Winternitz, M. : *A History of Indian Literature*, Vol. II

নির্ঘণ্ট